ভারতবর্ষ দেশ ও দেশবাসী

দেশ ও মাটি

ডঃ এস, পি, রায়চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া

বইটির প্রণেতা ডঃ এস, পি, রায়চৌধুরী বর্তমানে ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে প্রবীণ বিশেষজ্ঞ (ভূমি-সম্পদ) এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী। মাটি, ভূমির ব্যবহার ও মাটির উর্বরতা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং তিনি ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু বিজ্ঞান সমিতি ও মৃত্তিকা সংক্রান্ত সংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দেশের বিভিন্ন প্রকারের মাটি, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার, মাটির নিকৃষ্টতর হওয়ার কারণ ও তার প্রতিরোধের উপায় এবং ভূমি ও মাটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে যাতে সাধারণ পাঠকগণ জ্ঞান লাভ করতে পারেন, বিশেষভাবে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই ডঃ রায়চৌধুরী যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক ভাষা ব্যবহার না করে এই বইখানি রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

(প্রচ্ছদপট—ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ, নতুন দিল্লীর সৌজন্যে)

দেশ ও মাটি

অবৈতনিক সম্পাদকমণ্ডলী

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ বি, ভি, কেশকার　　　　প্রফেসার এম, এস, থ্যাকার

কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যা

ডঃ এইচ, সান্তাপাউ,
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, বোটানিকাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।
ডঃ এম, এস, রান্ধাওয়া, উপাচার্য, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লুধিয়ানা।
ডঃ বি, পি, পাল,
ডিরেক্টর জেনারেল, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং এডিশনাল সেক্রেটারী, ভারতীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়, নতুন দিল্লী।

সংস্কৃতি

শ্রী এ, ঘোষ,
ভারতের প্রত্নতত্ত্বের ডিরেক্টর জেনারেল, নতুন দিল্লী।
শ্রী উমাশঙ্কর যোশী,
উপাচার্য, গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, আমেদাবাদ।

ভূগোল

ডঃ এস, পি, চ্যাটার্জ্জী,
ডিরেক্টর, জাতীয় মানচিত্র সংস্থা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, কলিকাতা।
ডঃ জর্জ কুরিয়ান,
ভূতপূর্ব ভূগোলের প্রফেসার, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ।

ভূতত্ত্ব

ডঃ এম, এস, কৃষ্ণান, ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, জাতীয় ভূগোল গবেষণা মন্দির, হায়দ্রাবাদ।

আবহাওয়া তত্ত্ব

শ্রী এস, বাসু,
আবহাওয়া মন্দিরগুলির অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেল এবং ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ, নতুন দিল্লী।
শ্রী পি, আর, কৃষ্ণ রাও,
অবসরপ্রাপ্ত আবহাওয়া মন্দিরগুলির ডিরেক্টর জেনারেল, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী।

সমাজবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান

প্রফেসার নির্মল কুমার বোস,
মহাধ্যক্ষ, তপশিলী জাতী ও তপশিলী উপজাতি, নতুন দিল্লী।
প্রফেসার ভি, কে, এন, মেনন,
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্ পাব্লিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, নতুন দিল্লী।
ডঃ এস, এম, কাত্রে,
ডিরেক্টর, দাক্ষিণাত্য স্নাতকোত্তর কলেজ ও গবেষণা মন্দির, পুণা।

প্রাণীতত্ত্ব

ডঃ এম, এল রুনওয়াল,
উপাচার্য, যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপুর।
ডঃ সালিম আলি,
ভাইস চেয়ারম্যান, বম্বে ন্যাচারাল হিষ্টিরি সোসাইটি, বম্বে।
প্রফেসার বি, আর, শেষাচার,
প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের প্রধান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী।

ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী

দেশ ও মাটি

ডঃ এস, পি, রায়চৌধুরী

অনুবাদক

এন, সি, দেবনাথ

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া,
নিউ দিল্লী

LAND AND SOIL

(Bengali)

PUBLISHED BY THE SECRETARY, NATIONAL BOOK TRUST, INDIA, NEW DELHI-16
AND PRINTED AT NABA MUDRAN PRIVATE LIMITED, 170A, ACHARYA
PRAFULLA CHANDRA ROAD, CALCUTTA-4.

মুখবন্ধ

এই বইটি প্রকাশিত হওয়ায় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকল্পিত "ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী" রচনাবলীর আরও একটি সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

এই রচনাবলীর সূচনা আমার ও স্বর্গতঃ প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মধ্যে একটি আলোচনার ফলপ্রসূত। আমি প্রথম যখন আমার পরিকল্পনার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করি, তখন তিনি যে শুধু আন্তরিকতার সহিত এটা অনুমোদন করেন তাই নয়, এটাকে যাতে আরও পরিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তার জন্য নানারকম গঠনমূলক প্রস্তাব দেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের উপর রচিত এইরূপ পুস্তকাবলী দ্বারা দেশের প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর যে জ্ঞানসম্ভার তৈরী হবে, শিক্ষা ও জ্ঞানের জাতীয় প্রগতিতে তার গঠনমূলক অবদান সুনিশ্চিত।

এই রচনাবলীতে দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, উদ্ভিদ, প্রাণী, কৃষি, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ভাষা, ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরই লেখা হবে বলে প্রস্তাব আছে। এর মধ্য উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রচিত পুস্তকের একটি বিরাট গ্রন্থাগার সৃষ্টি করা। বইগুলিকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের স্বীকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা লেখানোর সযত্ন চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে বইগুলি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকগণের কাছে সহজবোধ্য হয়। এতে বিশেষজ্ঞ নন এরূপ যে কোন সাধারণ পাঠক এবং অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় যাঁরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁদের পক্ষে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা খুব সহজ হবে।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা এই প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের দেশের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও সাহায্য পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই রচনাবলী তৈরীর পরিকল্পনা সম্ভব হত না। আমাদের অনারারি (honorary)

সম্পাদক-মণ্ডলীর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয়। সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার্থে এই রচনাবলীর পুস্তকগুলি তৈরীর ব্যাপারে তাঁদের সাহায্যের জন্য তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই প্রকল্পের আরেকটি উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষের যতগুলি ভাষায় সম্ভব বইগুলিকে পাঠকগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বইগুলি তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন ভাষায় তাদের অনুবাদের কাজ আরম্ভ হবে। প্রকৃতপক্ষে, কতকগুলি খণ্ডের মূল বইটিই হয়ত কোনও ভারতীয় ভাষায় লেখা হতে পারে।

এই ব্যাপারে আমরা ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি। তাঁদের অধীন কর্ম্মরত বিজ্ঞানীদের এই রচনাবলীর জন্য লিখতে অনুমতি দিয়ে এবং আরও নানাভাবে তাঁরা এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন। এই সুযোগে তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি। তাঁদের সাহায্য ছাড়া জাতীয় প্রয়োজনীয়তার এই দুরূহ কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হত না। সহকারী প্রধান সম্পাদক হওয়াতে স্বীকৃতি জানানোর জন্য আমি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য প্রফেসার এম, এস, থ্যাকারের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতা কৃতকার্য্যতার সহিত এই রচনাবলীর পরিকল্পনা তৈরীতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বি, ভি, কেশকার

সূচীপত্র

চিত্র তালিকা

চিত্র-তালিকা

চিত্র-তালিকা

মানচিত্র

স্বীকৃতি

কতকগুলি আলোকচিত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সৌজন্যে পাওয়া :

ডঃ এইচ, এস, রান্ধাওয়া, ডিরেক্টর জেনারেল, নিবিড় কৃষি অঞ্চল, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়।

শ্রী এইচ, ওয়াই, সারদা প্রসাদ, ভূতপূর্ব প্রধান সম্পাদক, যোজনা।

শ্রী কে, এম, বেইদ, ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, দেরাহুন।

ডঃ বি, বি, রায়, বেসিক রিসার্চ স্টাডিস্ বিভাগের প্রধান, সেণ্ট্রাল এরিড্ জোন রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, যোধপুর।

ডঃ এস, পট্টনায়ক, জয়েণ্ট ডিরেক্টর অফ্ এগ্রিকালচার, (মৃত্তিকা সংরক্ষণ), উড়িষ্যা।

ডঃ জি, এল, ম্যালকম, ইরিগেশন ফার্ম এ্যাডভাইসার, ইউ, এস, এ, আই, ডি, খোদ পরিকল্পনা, পুণা।

শ্রী গুরচরণ সিং, ফটোগ্রাফার, আই, সি, এ, আর, নতুন দিল্লী।

ডঃ এন, পটনায়ক, ভূতপূর্ব সিনিয়র সয়েল কন্‌জারভেসন্ অফিসার, সয়েল কন্‌জারভেসন্ রিসার্চ, ডেমন্‌ষ্ট্রেশন ও ট্রেনিং সেণ্টার, দেরাহুন।

ডঃ কে, জি, তেজওয়ানী, সয়েল কন্‌জারভেসন্ অফিসার, সয়েল কন্‌জারভেসন্ রিসার্চ, ডেমন্‌ষ্ট্রেশন ও ট্রেনিং সেণ্টার, দেরাহুন।

ডঃ সচ্চিদানন্দ, ডিরেক্টর, বিহার ট্রাইবাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, রাঁচি।

ডঃ এইচ, এল, উপ্পল, প্রাক্তন ডিরেক্টর, ল্যাণ্ড রিক্ল্যাম্যাসন্, ইরিগেশন্ ও পাওয়ার রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, পাঞ্জাব, অমৃতসর।

শ্রী আর, এস, মূর্তি, সয়েল কোরিলেটর, অল্ ইণ্ডিয়া সয়েল এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড ইউস্ সার্ভে, বাঙ্গালোর সেণ্টার।

শ্রী আর, ভি, সিং, কন্‌জারভেশন্ অফ ফরেষ্টস্, লগিং সার্কল, হিমাচল প্রদেশ, সিমলা।

প্রাপ্ত সহযোগিতার জন্য লেখক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

প্রথম অধ্যায়

আমাদের ভূখণ্ড ও তার প্রাকৃতিক ধারা

ভূমি ও জাতির ক্রমবিকাশ

ভূ-প্রকৃতি, মাটি, গাছপালা এবং ফসলের বৈচিত্র্যে ভরা এক উপমহাদেশ এই ভারতবর্ষ। সোভিয়েত রাশিয়া বাদে ইউরোপের প্রায় দুই তৃতীয়াংশের মত আয়তন বিশিষ্ট এই দেশের বিস্তৃতি উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে শুরু করে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। এখানকার জলবায়ু ও জনগণ-মন সব কিছুর মধ্যে রয়েছে অঢেল বৈচিত্র। একদিকে যেমন হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শিখর-গুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে তেমনি কেরালার বিস্তীর্ণ উপকূল জুড়ে নারকেল বৃক্ষের শ্যামসমারোহ। ইহা ভারতের ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যেরই নিদর্শন। অবশ্য ভারতবর্ষের জলবায়ুর বৈচিত্র্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রকাশ হল এর ঋতুগুলির মধ্যে। নভেম্বর হতে শুরু করে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে থাকে শীতের আবহাওয়া। শীতের পর বসন্ত কালের স্থায়ীত্ব খুবই কম, এবং তার পরই আসে গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ঝলসানো মাঠঘাঠগুলি জুন-জুলাই মাসের মৌসুমী বারিপাতে ধীরে ধীরে পরিণত হয় বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তরে। অবশ্য সমুদ্র উপকূল ও দক্ষিণ ভারতে ঋতুগুলির মধ্যে এই বৈষম্য খুবই কম।

ভূমিকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে। ভূমি কৃষকের উপজীবিকা, সহরবাসীর গৃহনির্ম্মাণের স্থান, আবার শিশুর কাছে এটা তার খেলার মাঠ। কিন্তু প্রকৃত মানবতত্ত্বজ্ঞের কাছে ভূমি হল মাটি, এবং ইহা এমনই একটি বস্তু যার প্রভাব মনুষ্য ও পশুপক্ষী থেকে শুরু করে সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের উপর বিদ্যমান। লৌহ, তাম্র, কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, যা কিছু কারীগরিক উন্নয়ন ও সমগ্র মনুষ্য জাতির উন্নতির সহায়ক ; তারও

একমাত্র উৎস এই ভূমি। স্থূলভাবে চিন্তা করতে গেলে নদী, নালা, হ্রদ প্রভৃতিও এই ভূমিরই অন্তর্গত। এই জলাশয়গুলি থেকে আমরা পাই শস্য উৎপাদনের জন্য সেচের জল ও মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ী প্রভৃতি মনুষ্যোপযোগী খাদ্যবস্তু। এই জলপথই আমাদের খাদ্যশস্য ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণের সহায়ক। ঘরবাড়ী, মন্দির, নৌকা, জাহাজ ও মানুষের দরকারী যাবতীয় আসবাবপত্র তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ আমরা যে অরণ্যগুলি থেকে সংগ্রহ করে থাকি, তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ুর। ধান, গম, ফুলফলাদি নানাবিধ ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন প্রয়োজন মাটির, আবার আমাদের দুধ ও মাংসের সংস্থানকারী গবাদি পশুর জন্য তৃণক্ষেত্রগুলিও গড়ে উঠেছে এই মাটিতে।

বস্তুত, মানুষের আয়ত্বাধীন প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে ভূমির মূল্য সর্বাধিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন ভূমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির ব্যবহারের রূপও পাল্টাচ্ছে। কারণ নূতন নূতন শিল্প ও নিত্য নূতন নগর-নগরী গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উপযোগী ভূমির পরিমাণ ক্রমশই কমে আসছে।

ইদানীং প্রচুর পরিমাণ জল সংরক্ষণের জন্য যে বহুমুখী বাঁধগুলি তৈরী হচ্ছে, তার ফলে উর্বর জমির এক বৃহদাংশ জলমগ্ন থেকে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্যও ভূমির উপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ভূমিক্ষয়ের দ্বারা প্রতি বৎসর জমির উপরি-ভাগের উর্বর মাটি অপসারিত হওয়ায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতাও ক্রমশ কমে আসছে। দেখা গেছে যে আমাদের দেশে ৮১ মিলিয়ন হেক্টর (২০০ মিলিয়ন একর) জমির জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। অতএব, ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিকার্য্য বা কাষ্ঠের জন্য অরণ্য, যে উদ্দেশ্যেই ভূমিকে ব্যবহার করা হোক না কেন লক্ষ্য

রাখতে হবে যে, মাটির উর্বরতা শক্তি যেন বজায় থাকে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ সাতটি ভাগে ও কুড়িটি উপভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ নম্বর মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

১। উত্তর পার্বত্য অঞ্চল—ইহা চারটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—

(১) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল—ইহা উত্তর-কাশ্মীর হিমালয়, দক্ষিণ-কাশ্মীর হিমালয়, পাঞ্জাব-হিমালয় ও কুমায়ুন-হিমালয় অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

(২) মধ্য হিমালয় অঞ্চল—এই অঞ্চল ভারতের বাহিরে নেপালে অবস্থিত।

(৩) পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল—ভুটান, সিকিম, পশ্চিমে দার্জ্জিলিং জেলা ও পূর্বে আসাম ও নেফা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

(৪) উত্তর-পূর্ব পর্বতমালা—তিনটি ক্ষুদ্রতর অংশ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত যথা—

(ক) কাছাড় সমতল, মিজো, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মনিপুর নিয়ে গঠিত পূর্বাচল।

(খ) উপদ্বীপীয় মালভূমির পূর্বদিকের বর্দ্ধিতাংশ নিয়ে গঠিত মেঘালয় মালভূমি।

(গ) আসাম উপত্যকা।

২। বৃহৎ সমতলভূমি—ইহা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ঃ

(৫) উত্তর সমতলভূমি—পাঞ্জাবের সমতলভূমি, গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকা, রোহিলখণ্ড ও আবাধ সমতলভূমি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

(৬) পশ্চিম-সমতলভূমি—ইহা মরুস্থলী ও রাজস্থান বাগার নিয়ে গঠিত।

(৭) পূর্ব-সমতলভূমি—উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের সমতলভূমি এবং বাংলার নীচু সমতল ভূমি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

৩। মধ্যভারতের উচ্চভূমি—ইহা দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—

(৮) উত্তর-মধ্য উচ্চভূমি—ইহা আরাবল্লী পর্বতমালা, পূর্ব-রাজস্থানের উচ্চভূমি, মধ্যভারত পাথার ও বুন্দেলখণ্ডের উচ্চভূমি নিয়ে গঠিত।

(৯) দক্ষিণ-মধ্য উচ্চভূমি—মালয় মালভূমি, বিন্ধ্যের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চল, বিন্ধ্যপর্বতমালা ও নর্মদা উপত্যকা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

৪। উপদ্বীপীয় মালভূমি—ইহা পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—

(১০) উত্তর দাক্ষিণাত্য—ইহা সাতপুরা পর্বতমালা ও মহারাষ্ট্র মালভূমি নিয়ে গঠিত।

(১১) পূর্বমালভূমি, বাখেলখণ্ড মালভূমি, ছোটনাগপুর মালভূমি, গড়জাত পার্বত্যভূমি, মহানদীর নীচু সমতলভূমি ও দণ্ডকারণ্য।

(১২) দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য—তেলেঙ্গানা মালভূমি ও কর্ণাটক মালভূমি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

(১৩) পূর্ব-পার্বত্য অঞ্চল—উত্তরে গোদাবরী ও মহানদীর অন্তরবর্ত্তী পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশের কুড্ডাপ্যা ও কুর্ণাল জেলার নীচু পার্বত্যভূমি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। বস্তুত, ইহা উপকূলীয় পর্বতমালা ও পূর্বঘাট পর্বতমালা নামে পরিচিত।

(১৪) পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল (পশ্চিম ঘাটের সাহেগাদ্রী)—ইহা দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান নদীগুলির উৎপত্তিস্থল।

৫। পূর্ব-উপকূল—ইহা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—

(১৫) পূর্ব-উপকূলীয় সমতলভূমি—উড়িষ্যার মহানদীর

বদ্বীপ, অন্ধ্রের কৃষ্ণা ও গোদাবরীর বদ্বীপ এবং তামিলনাদের বদ্বীপ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

(১৬) মহাদেশীয় পূর্ব চড়ভূমি—ইহা তুষার যুগের পরে সমুদ্রতলের উত্থানের নিদর্শন।

৬। পশ্চিম উপকূল—ইহা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—

(১৭) পশ্চিম উপকূলীয় সমতলভূমি—কুচবদ্বীপ, কাথিয়াবার বদ্বীপ, গুজরাট সমতলভূমি, কঙ্কাণ উপকূল, কর্ণাট উপকূল ও কেরালার সমতলভূমি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

(১৮) মহাদেশীয় পশ্চিম চড়ভূমি—ইহা সমুদ্রোত্থিত দুটি উচ্চভূমি নিয়ে গঠিত।

৭। দ্বীপপুঞ্জ—ইহা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—

(১৯) বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই অঞ্চল সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্বতের উত্থিত অংশ।

(২০) আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ—লাক্ষাদ্বীপ, আমিন দ্বীপ ও মিনিকয় এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এর সমস্তটাই প্রবালদ্বারা গঠিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূসম্পদ ও তার মূল্যায়ণ

মাটির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন মাটির অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত ফসলের চাষ করা এবং মাটির কোনরূপ ক্ষয় ক্ষতি সাধন না করেও উৎপাদনের উপযুক্ত মান বজায় রাখা। এর জন্য মাটির শ্রেণীবিন্যাস করা প্রয়োজন।

সভ্যতার আদিকালে কৃষিই যখন ছিল মানুষের একমাত্র কার্য্যকর বৃত্তি, তখন থেকেই সাধারণভাবে উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মাটির শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা চলে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে (খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ৬০০ খৃষ্টাব্দ) মাটিকে উর্বর ও অনুর্বর বা উষর এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হত। উর্বর মাটিকে আবার বিভিন্ন ফসলের উপযোগিতা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হত, যেমন যব, তিল, উরিন্যি (ধান) ইত্যাদি। অনুর্বর মাটিকে ভাগ করা হত, উষর ও মরু, এই দুই ভাগে। এইভাবে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে মাটির শ্রেণীবিভাগের জন্য প্রয়াস চলতে থাকে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জমির উপর কর নির্দ্ধারণের সময়ই ভারতবর্ষে মাটির শ্রেণীবিন্যাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভূমির শ্রেণীবিন্যাসের এই পদ্ধতিতে মাটির কতকগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও বাহ্য প্রকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যেমন—মাটির দানা ও রং, জমির ঢাল ও জলের ব্যবস্থা ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শস্যের ফলনকেই আসল মাপকাঠি বলে ধরা হত। এইভাবে সংগৃহীত, জমির বিভিন্ন বিবরণ ও উৎপন্ন শস্যের বিক্রয়ের সুবিধা ইত্যাদির ভিত্তিতে, জমির মোটামুটি একটি ন্যায্যমূল্য নির্দ্ধারণ করা হত।

যে জমি শুধু বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল তাকে বলা হয়

"বারানী" ; কূয়োর জলে যদি সেচ কার্য্য চলে, তবে তাকে বলে "চহি" ; খালের জলে যে জমিতে সেচ চলে তাকে বলে "নাহারী" ; আবার যে জমি নদীর চোঁয়ানো জলদ্বারা সিক্ত থাকে তাকে বলা হয় "শৈলাবী"।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রেণী বিভাগ করে কৃষিভূমির উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের প্রচেষ্টা হয়। জমির উপরের পনর সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত মাটির নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, চূণ প্রভৃতি উদ্ভিদের পুষ্টিপদার্থগুলির পরিমাণের ভিত্তিতেই এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার জমির উপরের মাটির দানার বিন্যাসকে ভিত্তি করেও ভূমির শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। এ্যাগ্রোনমিতে এই ধরণের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, কারণ জমির উপরিভাগের মাটিই প্রধানতঃ উদ্ভিদের পুষ্টিবস্তুগুলির যোগান দেয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এবং পরেও ভূমি-সমীক্ষাকার্য্যে (Soil Survey) এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। এই ধরণের পর্য্যবেক্ষণের জন্য কোনও সুনির্দ্দিষ্ট মান ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি না থাকায় এর ব্যবহারিক মূল্য ছিল খুবই সীমিত।

সেচ কার্য্যের জন্য মাটির সমীক্ষা (survey) দুরকম ভাবে করা হয়—সেচের পূর্বে বা সেচের পরে। সেচপূর্ব সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল (১) জল হলেই যে সমস্ত জমি চাষের উপযুক্ত তার এলাকা নির্ণয় করা, (২) সংশোধনযোগ্য নষ্ট জমি সনাক্ত করা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা, (৩) ভূগর্ভস্থ জলতলের উত্থান ও ভূমি জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা এবং (৪) জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাদি নিরূপণ করা। সেচ-পরবর্তী সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল সাধারণতঃ তিনটি : (১) সেচের ফলে যেখানে জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে বা হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে তার এলাকা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া, (২) অপকৃষ্ট জমির সংশোধন ও উর্বরতা হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে এরকম জমি রক্ষার জন্য উপায় উদ্ভাবন করা, এবং (৩)

এগুলির জন্য যে ধরণের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রয়োজন তা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া। কাদা, পলি, দ্রবণীয় লবণ ও মাটির ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব নির্দ্ধারণের জন্য মাটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের জন্য ৯০ সেন্টিমিটার গভীর পর্য্যন্ত মাটি নেওযা হয়। সেচপূর্ব মাটি-সমীক্ষা প্রকল্পগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—
(১) ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা ; (২) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ; (৩) নাগার্জ্জুন সাগর পরিকল্পনা ; (৪) রাজস্থান খাল পরিকল্পনা ; (৫) হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা ; (৬) মহানদী বদ্বীপ সেচ পরিকল্পনা ও (৭) চম্বল পরিকল্পনা।

এছাড়া স্বাধীনতা লাভের পর আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য নিয়ে ভূমি সমীক্ষার কাজ হাতে নেওযা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হল :—

(১) যাতে জলাধারগুলিতে খুব বেশী পলি না পড়ে এবং বাঁধগুলির স্থাযীত্ব বৃদ্ধি পায়, তার জন্য নদী উপত্যকা প্রকল্পগুলির অববাহিকা অঞ্চলে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২) পতিত জমিগুলিতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা, যেমন—কৃষি উপযোগী ভূমি ও কৃষি-অনুপযোগী ভূমি। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিগুলিকে অন্যান্য কাজে, যেমন—বন বা পশুচারণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ।

(৩) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অর্থাৎ যে সমস্ত পরিবার দেশ বিভাগের ফলে বা সেচ পরিকল্পনার জলাধারে বাড়ীঘর নিমজ্জিত হওয়ায় উদ্বাস্তু হয়েছে তাদেরকে বসত বাটী ও কৃষির জন্য জমি দিয়ে পুনর্বাসন করা।

(৪) জলস্রোত হেতু খাদ ও নালার সৃষ্টি রোধ করা, বড় বড় রাস্তা তৈরী করা, ইত্যাদি।

বিশদ মৃত্তিকা সমীক্ষার জন্য (detailed soil survey) মৌজার

১ঃ ৩৯৬০ বা ১ঃ ৭৯৮০ স্কেলের মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ কর্ম্মীদের সুবিধার্থে বিস্তারিত বিবরণসহ পরে এই মানচিত্রকে ১ঃ ৩১৬৮০ বা ১ঃ ১৫৮৪০ স্কেলে সঙ্কুচিত করে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

এই ভূমি সমীক্ষায় মাটির বৈশিষ্ট্য, গভীরতা, জমির ঢাল ও তার ব্যবহার বা তার উপরের গাছপালা, মাটি ক্ষয়ের পরিমাণ ও তার প্রবণতা এবং জমির ব্যবহারের সাথে জড়িত অন্যান্য মূল উপাদান-গুলির ভিত্তিতে মানচিত্রের উপযোগী মাটির বিভিন্ন ইউনিটের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা হয়। প্রোফাইল (Profile) ও মাটির দানার অবস্থা অনুযায়ী মাটির প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে মাটিতে জল চুঁইয়ে যাওয়া, বা গড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা ও ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ। মৃত্তিকা সংরক্ষণ পরিকল্পনা তৈরীতে এগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। মাটির গভীরতা কম হলে গাছের শিকড়ের অনুপ্রবেশ ক্ষমতা, মাটিতে জল চুঁয়ানো ও মাটির জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি কমে যায়; ফলে, জমির উপর দিয়ে জল গড়িযে যাওয়ার জন্য ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জমির উপর দিয়ে জল গড়িয়ে যাওয়া ও মৃত্তিকা অপসারণ বিশেষভ.বে নির্ভর করে জমির ঢালের পরিমাণ ও তার দৈর্ঘ্যের উপর। তাছাড়া মাটির জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতাও পরোক্ষভাবে নির্দ্ধারিত হয় এইগুলির দ্বারা। জমির উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে ভূমিক্ষযের পরিমাণের উপর এবং এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, জমিকে কি ভাবে ব্যবহার করা উচিৎ এবং কি কি প্রযোজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। মাটির প্রত্যেকটি ইউনিটকে মানচিত্রে $\frac{SST - dn}{Sx \quad - ey}$ সূচক দ্বারা দেখানো হয়। এখানে SST বলতে বুঝায় মাটির রকম; dn, মাটির গভীরতা; Sx ঢালের পরিমাণ এবং ey হল ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ। বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে তৈরী মাটির এই ইউনিটগুলিকে ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়নের উপযুক্ত আদর্শ ইউনিট বলে গণ্য

করা হয়। মাটির এই মানচিত্র নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—বিশেষ করে, সেচের জমিতে কিভাবে জল দিতে হবে তা নির্দ্ধারণে, বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য উন্নততর প্রকল্প প্রণয়নে এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা তৈরীতে এর ব্যবহার প্রচুর। মাটির রেকনেইসেন্স সমীক্ষার জন্য যেখানে শুধু মাটির কতকগুলি সাধারণ তথ্যাদির প্রয়োজন, সেখানে ১ ঃ ৬৩৩৬০ স্কেলের মানচিত্রের ব্যবহারই যথেষ্ট। রেকনেইসেন্স সমীক্ষায় নিয়মিতভাবে তিন থেকে ছয় কিলোমিটার অন্তর মাটির "প্রোফাইল" পর্য্যবেক্ষণ করা হয় এবং ০.৮ থেকে ১.৬ কিলোমিটার অন্তর উপর থেকে পনের সেন্টিমিটার নীচে পর্যন্ত মাটির নমুনা বিশ্লেষণ করে অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বিশদ সমীক্ষাতে পর্যবেক্ষণের জন্য মাটির "প্রোফাইল" ও বিশ্লেষণের জন্য মাটি সংগ্রহের গর্ত্তগুলির দূরত্ব আরও অনেক কম।

ভূমির ব্যবহার

মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদ্বারা জমিতে মাটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে ভূমির কার্য্যকরী ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করা হয়। এর জন্য তিনি জমির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মাটির গভীরতা, দানা, প্রাপ্তব্য জলধারণ ক্ষমতা, জৈব পদার্থের পরিমাণ, মাটিতে জল অনুপ্রবেশ এবং ভূমির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত মাটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। ব্যবহারীক শ্রেণীবিন্যাসে ভূমিকে মোট আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে চারটি কৃষিকার্য্যের উপযোগী ও চারটি অনুপযোগী। ভূমির এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে মানচিত্রে বিভিন্ন রং, সংখ্যা ও অক্ষর দ্বারা দেখানো হয়ে থাকে এবং ভূমি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি কৃষকদের জন্য সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা হয়। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কৃষিতে গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্ভব।

অত্যন্ত নিবীড় চাষ
নিবীড় চাষ
মাঝারি রকমের চাষ
সীমিত চাষ
নিবীড় পশুচারণ
মাঝারি রকমের পশুচারণ
সীমিত পশুচারণ
অরণ্য
বন্যজন্তু, অবসর বিনোদন ইত্যাদি
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
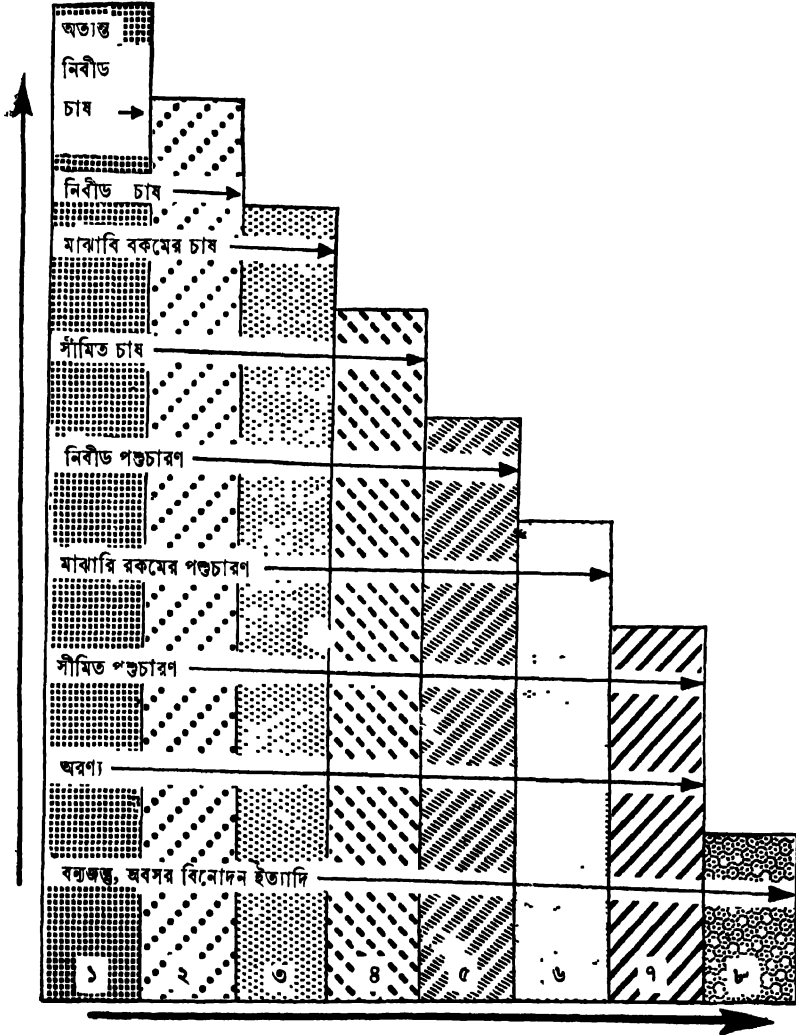
১নং চিত্র।

কৃষি উপযোগী ভূমি

প্রথম শ্রেণীর জমিতে বিশেষ ধরণের কোনও ব্যবস্থাদি অবলম্বন না করেও নিঃসঙ্কোচে চাষ বাস করা চলে। এই জমিগুলি প্রায় সমতল (ঢাল এক শতাংশেরও কম) মাটি বেশ গভীর ও উর্বর এবং এতে অতি অল্পায়াসেই চাষ করা যায়। জল বা বায়ুদ্বারা ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ খুবই কম। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বেশ সুন্দর এবং জমি ভুট্টা প্রভৃতি ফসল ফলানোর মত নিবীড় চাষের উপযোগী। ক্রমাগত ভাল ফসল পেতে হলে জমিতে রাসায়নিক সার ও সবুজ সারের প্রয়োগ এবং পর্য্যায়ক্রমে চাষের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিও বেশ ভাল। অতি সহজ কতকগুলি বিশেষ ধরণের ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে বেশ ভালভাবেই এতে চাষ করা যায়। এর কতকগুলি অসুবিধা হলো : জমির সামান্য ঢাল, মাঝামাঝি রকমের ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা, মাটির মধ্যম গভীরতা, মোটামুটি কিছু জল জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ও জমির মাঝামাঝি রকমের সিক্ততা। অবশ্য, এগুলি সহজেই সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে। এর প্রত্যেকটি অসুবিধার জন্যই আলাদাভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেমন —কণ্টুর বাঁধ, স্ট্রিপ ক্রপিং, কণ্টুর চাষ, পর্য্যায়ক্রমে চাষে ঘাস ও শুঁটি (লিগিউম) জাতীয় শস্যের উৎপাদন, জল নিকাশের ব্যবস্থা, খড়ের মালচিং, সবুজ সার, রাসায়নিক সার ও জৈব সারের ব্যবহার।

তৃতীয় শ্রেণীর জমিও মোটামুটি ভাল। পর্য্যায়ক্রমে চাষ করে এতে নিয়মিতভাবে ফসল ফলানো সম্ভব। অবশ্য, এর জন্য বিশেষ কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই জমিগুলির বৈশিষ্ট্য হল, (১) মাঝামাঝি রকমের খাড়াই ঢাল, (২) বেশী রকমের ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা, (৩) মাঝামাঝি রকমের প্লাবন, (৪) নীচের মাটিতে জলের মন্থর গতি, (৫) অত্যধিক সিক্ততা, (৬) স্বল্প গভীরতা, (৭) কাদা বা অন্য কোনও শক্ত স্তরের অবস্থান, (৮) স্বল্প জলধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট বেলে বা কাঁকুরে মাটি ও (৯) নীচু মানের স্বাভাবিক

উর্বরতা। দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা এই শ্রেণীর ভূমির ব্যবহারিক যোগ্যতা অনেকটা বেশী সীমিত। তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলি মাঝামাঝি ঢালু জমিতে মাটিক্ষয় রোধ করার জন্য পর্য্যায়ক্রমে চাষে সমতল জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শুঁটি ও ঘাস জাতীয় শস্য, ষ্ট্রিপ ক্রপিং ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। আবার মোটামুটি সমতল ও সিক্ত এবং মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ ক্ষমতা খুব কম, এরকম জমিতে ভাল জল নিকাশের ব্যবস্থা করা এবং মাটির অনেকটা নীচে পর্য্যন্ত শিকড় ছড়াতে পারে এই ধরনের শুঁটি (লিগিউম) জাতীয় ফসল উৎপাদন করা প্রয়োজন। যে সমস্ত জমিতে জল নিষ্কাশন বিঘ্নিত হচ্ছে, সেখানে জৈব সার প্রয়োগ করে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ-ক্ষমতা বাড়ানো যায়। কোনও কোনও সেচযুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে স্থায়ী জলতল অনেকটা উপরে থাকায় এবং মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ-ক্ষমতা খুব কম হওয়ায় লবণ জমার আশঙ্কা থাকে। যে সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে বায়ুদ্বারা মাটিক্ষয় হয়ে থাকে, সেখানে চাষের জন্য কতক-গুলি নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যেমন—কন্টুর চাষ, স্ট্রিপ ক্রপিং, খড়ের মালচিং ও টে্রসিং।

চতুর্থ শ্রেণী জমির বন্ধুরত্ব ও প্রতিকল অবস্থাগুলি তৃতীয় শ্রেণী জমি অপেক্ষা আরও অনেক বেশী। অতএব এই জমিগুলির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। জমির ঢাল, ভূমিক্ষয়, অনুপযুক্ত মাটি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এই শ্রেণীর জমিতে চাষবাসের সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত। চতুর্থ শ্রেণীর কতকগুলি জমি শুধুমাত্র কতকগুলি বিশেষ রকমের ফসলের পক্ষেই উপযোগী। মাঝারি আর্দ্র অঞ্চলে চতুর্থ-শ্রেণী জমির বৈশিষ্ট্য হল, মাটির স্বল্প বা মধ্যম গভীরতা, জমির মধ্যম বা খুব খাড়াই ঢাল, নীচুমানের উর্বরতা, অত্যন্ত বেলে অথবা লোনামাটি। মাঝারি শুষ্ক অঞ্চলের কোথাও কোথাও চতুর্থ শ্রেণীর জমিকেই সব থেকে ভাল বলে গণ্য করা হয়। এই জমি বায়ুদ্বারা ভূমিক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

অতএব এখানে চাষবাস করার সময় জল সংরক্ষণ ও ভূমিক্ষয় রোধের জন্য শস্য উৎপাদনে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। অতি খরা থেকে জমিকে রক্ষার জন্য এবং উন্নততর মাটির গঠন ও উর্বরতা বজায় রাখার জন্য স্থায়ী গাছপালা লাগানোর প্রয়োজন হতে পারে।

কৃষি অনুপযোগী ভূমি

পঞ্চম শ্রেণীর জমি যদিও কৃষির অনুপযোগী, কিন্তু তৃণক্ষেত্র ও অরণ্যভূমি হিসেবে অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়। চাষবাসের অসুবিধার এক বা একাধিক কারণ থাকতে পারে, যেমন—ভিজে মাটি, কাঁকুরে জমি বা আরও নানারকমের অসুবিধা। জমিগুলি মোটামুটি সমতল, এবং জল বা বায়ুদ্বারা ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ খুবই কম। অনেক জলা-জায়গাতেই এরকম জমি দেখতে পাওয়া যায় এবং সেখানে জল নিষ্কাশন খুব সহজে সম্ভব নয়। জমির ঢাল প্রায় ২০ শতাংশের মত হলে এই শ্রেণীর জমিতে মাটির গভীরতা সাধারণতঃ খুব কম হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর জমিগুলিকে তৃণক্ষেত্র বা অরণ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করায় ছোটখাট কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন—জমি অতিরিক্ত ঢালু ও ক্ষয়িষ্ণু, মাটি স্বল্প গভীর ও অতিরিক্ত ভিজে বা অতিরিক্ত শুকনো। কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এগুলিকে তৃণক্ষেত্র বা অরণ্যের উপযোগী করে তোলা যায়। জলধারার গতি পরিবর্ত্তন করে, কণ্টুর বাঁধ বা আল তৈরী ইত্যাদি অন্যান্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে বড় বড় নালা বা খাদ সৃষ্টির পথ রোধ করতে হবে।

সপ্তম শ্রেণীর জমি অত্যন্ত খাড়াই ও ক্ষয়িষ্ণু। মাটি অত্যন্ত পাথুরে, রুক্ষ ও স্বল্প গভীর। জমি হয় জলা, না হয় অতিরিক্ত শুকনো। তাই এরকম জমি, বিশেষ করে আর্দ্র অঞ্চলে, তৃণক্ষেত্রের জন্য ব্যবহার না করে কাঠ সংগ্রহের জন্য অরণ্য ভূমি হিসেবে ব্যবহার

করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য এতেও কাঠ সংগ্রহের সময় যথেষ্ট সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ।

অষ্টম শ্রেণীর জমিগুলিকে নিকৃষ্টতম জমি বলে গণ্য করা হয়। জলাভূমি, মরুভূমি, গভীর খাদযুক্ত ভূমি, পার্বত্য অঞ্চল ও অত্যন্ত খাড়াই, রুক্ষ, পাথুরে ও অনুর্বর ভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এইগুলি বন্য জন্তুর সংরক্ষণ, অবসর বিনোদন ও নদনদীর উৎপত্তিস্থল রক্ষণ কার্য্যেরই একমাত্র উপযোগী।

ভূমি ও আমাদের অর্থনৈতিক প্রসার

ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর ভাগ লোকই কৃষিজীবি। অতএব কৃষির উন্নতি বিধানই দেশের অগ্রগতির অন্যতম উপায়। জমি থেকে সম্পদ আহরণ করতে হলে অধিক ফলনের জন্য কৃষি ভূমির উন্নতি বিধানের পয্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। এটা আমাদের ভূমি বণ্টন নীতি ও কারিগরি জ্ঞানের প্রসার এই দুয়েরই উপর সমান নির্ভরশীল। ব্রিটিশ রাজত্বের সময় কৃষক বা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য সরকার কতকগুলি প্রতিনিধি বা জমিদার নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদিগকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হত, এবং তারা একটি নির্দ্দিষ্ট হারে সরকারকে কর দিত। একে বলা হত জমিদারী প্রথা। রাইয়তি প্রথায় সরকার সরাসরি-ভাবে রাইয়ত বা কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। এই প্রথায় সমস্ত জমিরই মালিক ছিলেন সরকার, এবং যারা এই জমি চাষ করত, সরকার তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন।

জমির পত্তনি ব্যবস্থা চলার সময় বহু কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং এরা হয় প্রজা, না হয় ভাগচাষী বা খেত মজুর হিসাবে কাজ করত। সরকারের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝেই খাজনার হার বৃদ্ধি করত, যদিও নিজেরা সরকারকে সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হারেই কর দিত। কোন কোনও প্রজাকে জমির মোট উৎপন্ন শস্য মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাজনা হিসেবে দিতে হত। অথচ এই প্রতিনিধি বা জমিদাররা জমির উন্নয়নের জন্য এর এক পয়সাও খরচ করত

না। এই ভাবে জমিদারী প্রথায় জমিদাররা ধনী থেকে আরও ধনী হল, অথচ কৃষক প্রজারা সেই দরিদ্রই রয়ে গেল। তাছাড়া প্রজাদের প্রজাসত্ব রক্ষারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে জমি-দাররা যে কোনও সময় তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারত। অতএব এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই যে, এ অবস্থায় প্রজাদের জমির প্রতি কোন আকর্ষণই থাকত না। জমিতে শস্যের ফলন কমে যাওয়ার এটা একটা মস্ত বড় কারণ। তাছাড়া ভূমিহীন ক্ষেত মজুররা খুব বেশী হলে বৎসরে ছমাস কাজ পেত এবং বন্যা বা খরার মত প্রাকৃতিক দৈব দুর্ব্বিপাকের সময় হয়ত কোন কাজই পেত না।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতার পর দেশ জুড়ে ভূমি বণ্টন সংশোধন আইন গ্রহণ করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হল, যে জমি চাষ করবে সেই তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে, যাতে জমির উন্নয়ন ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্যও সে বেশ কিছুটা করতে পারে। কর আদায়ের জন্য যে প্রতিনিধি ছিল তাদেরকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং চাষীদের সাথে লেন দেনের ব্যবস্থা সরকার সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। বহু পতিত জমি, বন ও পশুচারণ ক্ষেত্র প্রাদেশিক সরকার বা পঞ্চায়েতের আয়ত্বাধীনে আনা হয়েছে। অনেক রাজ্যেই নিয়ম করা হয়েছে যে, জোতদাররা কেবল পরিমিত পরিমান জমি রাখতে পারবে; সেটাও পারবে যদি সে নিজের তত্বাবধানে ঐ জমি চাষ করে। বেশ কতকগুলি রাজ্যে করের উচ্চ হারকে কমিয়ে উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ বা এমনকি তারও কমে নামিয়ে আনা হয়েছে। আইন দ্বারা প্রজাদের প্রজা-সত্ব রক্ষারও পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যেই এখন প্রজারা ইচ্ছা করলে উপযুক্ত দাম দিয়ে নিজেই জমির মালিক হতে পারেন। জমির মূল্য ঠিক করে দেন সরকার নিজে। অবশ্য এর জন্য জোতদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ভূমিহীন মজুরদের জমিতে বসানোর উদ্দেশ্যে অনেক রাজ্যেই একক ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ যতটা পরিমাণ জমি রাখতে পারবে তার সীমা বেঁধে দেওয়া

হয়েছে। এতে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

আমাদের দেশে সাধারণত প্রত্যেক চাষীরাই চাষভূক্ত জমির পরিমাণ খুব অল্প এবং তাও আবার ইতস্তত ছড়ানো। এটাই হল আমাদের কৃষির উন্নতির একটা বড় প্রতিবন্ধক। কোন কোনও রাজ্যে চাষীদের এই ইতস্তত ছড়ানো জমিগুলিকে মিলিয়ে সুসংহত, বড় বড় কৃষিক্ষেত্র তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া অনেক জায়গায়ই স্বল্প আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ছোট ছোট ও মধ্যবিত্ত কৃষকরা সার, বীজ ইত্যাদি কেনার জন্য ঋণ-পাওয়ার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

ভূমিকে আমরা যে যে ভাবে ব্যবহার করে থাকি

১৯৬০-৬১ সালে দেশে ভূমির বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার ১ নম্বর পরিশিষ্টে দেখানো হল (সাময়িক)।

আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ও সমস্যাবলী।

নিম্নলিখিত তালিকায় (১নং তালিকা) অবিভক্ত ভারত ও সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রের জন সংখ্যা বদ্ধির পরিমাণ দেখানো হল :

১ নম্বর তালিকা

বৎসর	অবিভক্ত ভারত		সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র	
	কোটি হিসেবে লোক সংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধিব হার	কোটি হিসেবে লোক সংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৮৯১	২৭.৯৪	—	২৩.৫৯	—
১৯০১	২৮.৩৮	+ ১.০	২৩.৬৩	− ০.০৪
১৯১১	৩০.৩০	+ ৬.১	২৫.২১	+ ৫.৭০
১৯২১	৩০.৫৬	+ ০.৯	২৫.১৪	− ০.৩১
১৯৩১	৩৩.৮১	+ ১০.৬	২৭.৯০	+ ১১.০০
১৯৪১	৩৮.৯২	+ ১৫.১	৩১.৮৭	+ ১৪.২০
১৯৫১	—	—	৩৬.১১	+ ১৩.৩০
১৯৬১	—	—	৪৩.৯২*	+ ২১.৫০

(* জম্বু, কাশ্মীর গোয়া, দমন ও দিউ অন্তর্ভূক্ত)

২নং চিত্র

ভূমির ব্যবহার

১৯৫৮—৫৯
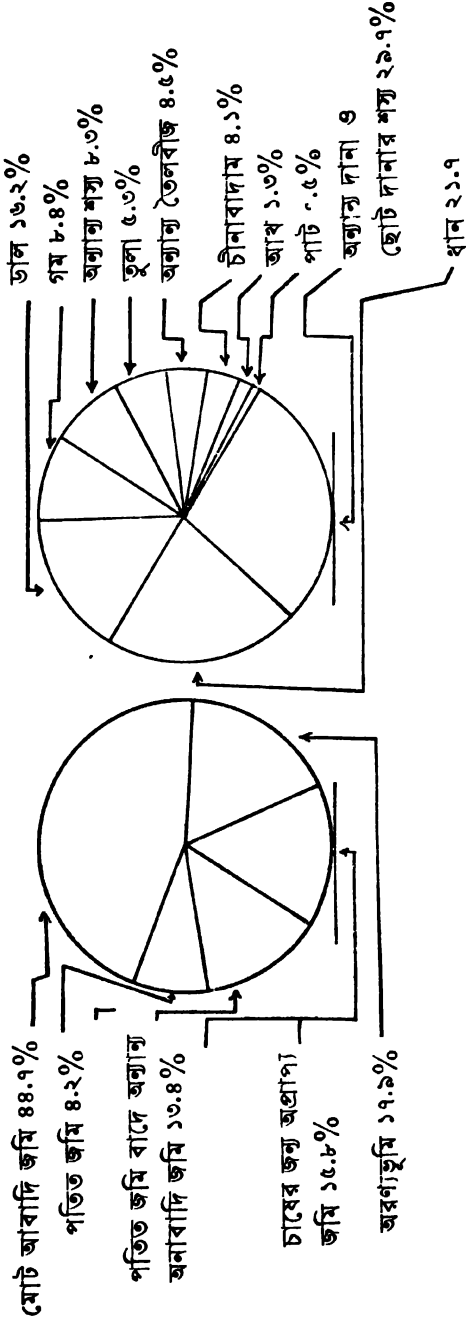
১ প্রাপ্তিসূত্র—ইনডিয়ান এগ্রিকালচার ইন ব্রিফ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৬১. ডাইরেকটরেট অফ ইকনমিকস এ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিকস, মিনিস্ট্রি অফ ড এ্যাণ্ড অগ্রিকালচার।

২ ১৯৫৬-৫৭ অঙ্ক।
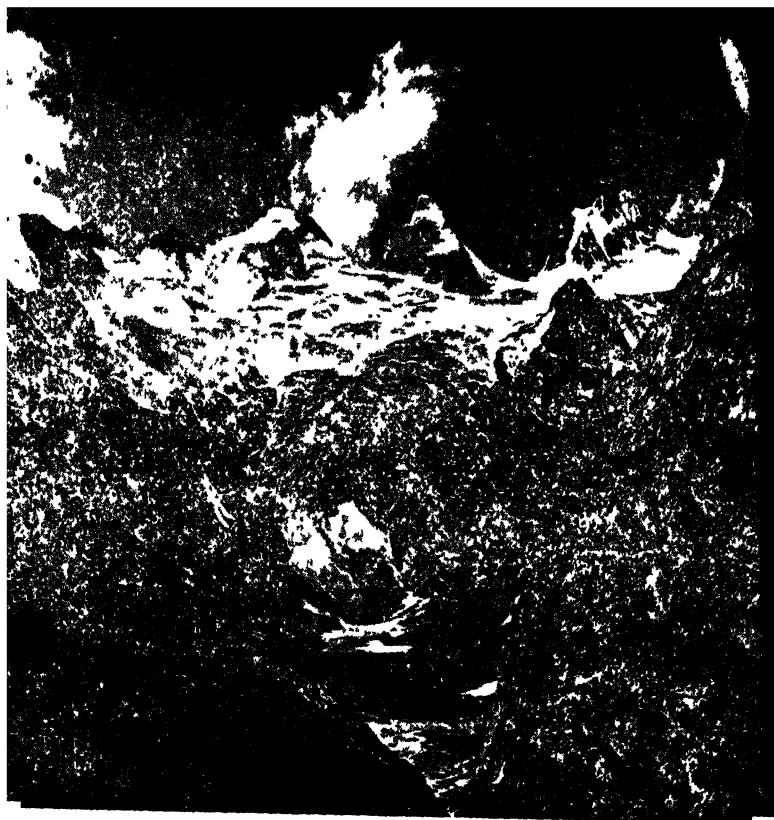
প্লেট ১—কাশ্মীরে অমবনাথ গুহায় যাওযার পথে "শেসাং পর্ব্বত",
উচ্চতা ১৬,০০০ ফুট (১নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ২—কেবালা বাজ্যে কুট্টানাদেব একটি গ্রাম

(১নং পর্যায় দেখুন)
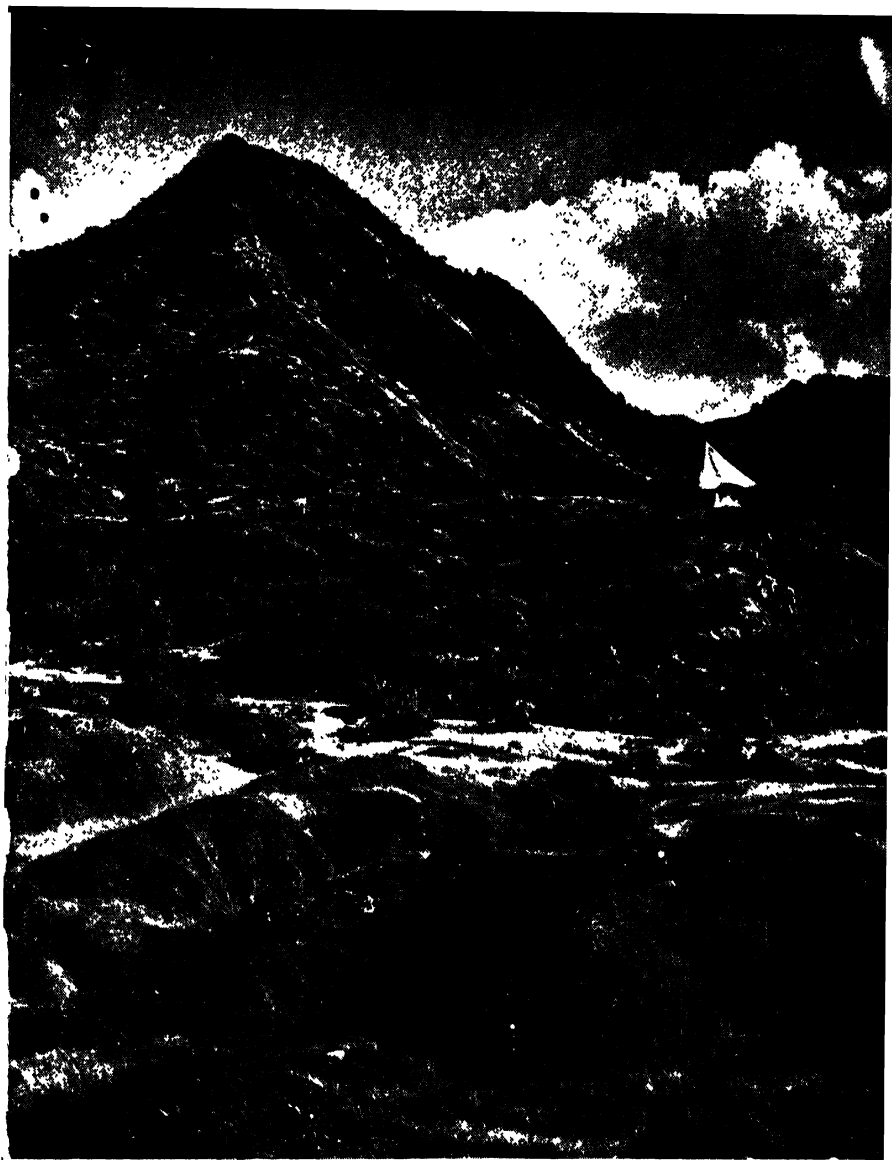
প্লেট ৩– বৃষ্টির জলে ধুয়ে তামা নিয়ে নেওয়ার পর অবশিষ্টাংশের পুরানো স্তূপ—ক্ষেত্রি, রাজস্থান (১নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
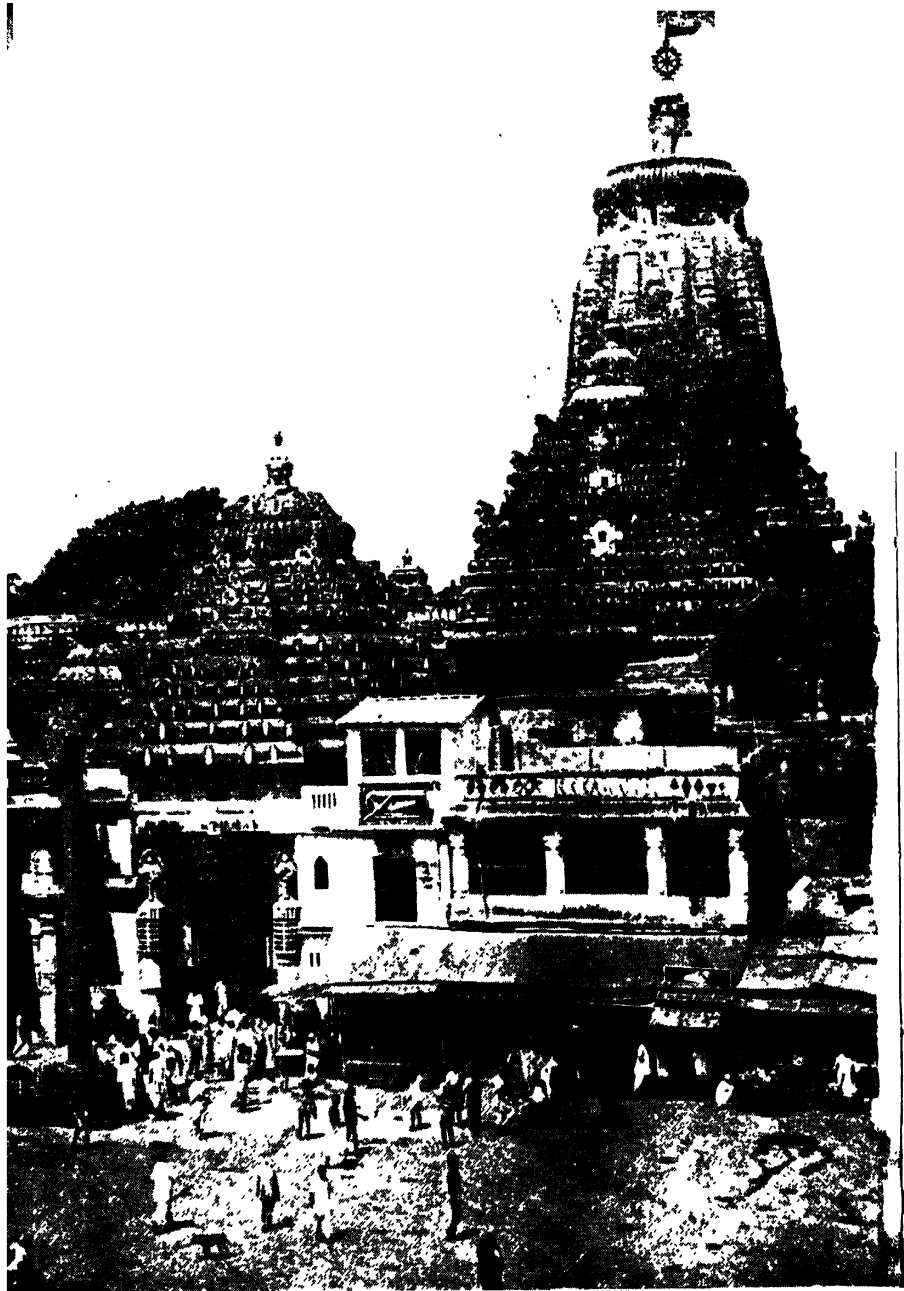
প্লেট ৪—পুরীতে জগন্নাথের মন্দির

(২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই বৃদ্ধির হার হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু আশঙ্কার কারণ হয় মোট লোক সংখ্যার দিকে তাকালে—বিশেষ করে যেখানে মোট উৎপন্ন শস্যের বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই কম এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় একই থেকে যাচ্ছে। এক দশক থেকে আরেক দশকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য থেকেই বুঝা যায়, বিজ্ঞান সম্মতভাবে জন্ম ও মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে দেশ কতটা পিছিয়ে আছে।

২ নম্বর তালিকা

রাজ্য	
অন্ধ্র প্রদেশ	
আসাম	৫
বিহার	৪.২
হিমাচল প্রদেশ	২·৮
গুজরাট	২·২
জম্মু ও কাশ্মীর	৪·৭
কেরালা	৭·৭
মধ্যপ্রদেশ	১·৮
মাদ্রাজ	৫
মহারাষ্ট্র	২·২
মহীশুর	১·২
উড়িষ্যা	৩
পাঞ্জাব	২
রাজস্থান	১·৫
উত্তর প্রদেশ	৩·৫
পশ্চিম বঙ্গ	৫·৭
সমগ্র ভারতবর্ষ	৩

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটিকে ভালভাবে বুঝতে হলে দেখতে হবে আবাদি জমির হেক্টর প্রতি লোক সংখ্যা, মাটির উর্বরতা, কৃষি-

কার্য্যের রীতি নীতি ও পদ্ধতি এবং জমিকে ব্যবহারের জন্য ও বিশেষ করে কৃষিকার্যে ব্যবহারের জন্য কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ।

সাধারণত পাঁচ জনের একটি সংসার চালানোর জন্য কম পক্ষে দুই হেক্টর বা পাঁচ একর আবাদি জমির প্রয়োজন, অথবা বলা যেতে পারে আবাদি জমির হেক্টর প্রতি লোকসংখ্যার পরিমান হওয়া উচিৎ ২.৫। ২নং তালিকা থেকে বুঝা যাবে যে আমাদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আবাদি জমির হেক্টর প্রতি লোক সংখ্যার তারতম্য কত বেশী।

২নং তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশুর, পাঞ্জাব ও রাজস্থান ছাড়া অন্য প্রায় সমস্ত রাজ্য গুলিতেই আবাদি জমির হেক্টর প্রতি লোক সংখ্যার পরিমাণ সর্ব ভারতীয় সংখ্যা থেকে বেশী। একমাত্র উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশে হেক্টর প্রতি লোক সংখ্যা সর্ব্বভারতীয় সংখ্যার সমান।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূত্বক—মাটি

ভূত্বক বলতে বুঝায় আমাদের গ্রহটির বাইরের বর্তুলাকার আবরণগুলিকে। এ্যাটমোসফিয়ার, হাইড্রোসফিয়ার ও লিথোসফিয়ার নিয়ে এই বর্তুলাকার আবরণগুলি তৈরী। আমাদের গ্রহের অন্তর্ভাগটিকে বলা হয় ব্যারিসফিয়ার। আপেক্ষিক গুরুত্ব খুব বেশী এমন কতকগুলি জিনিষ দিয়ে এই অংশ গঠিত। ভূ-পদার্থবিদরা এবিষয়ে একমত যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত ও কঠিন ধাতব পদার্থে তৈরী এই ব্যারিসফিয়ার হালকা থেকে ক্রমশ আরও হালকা জিনিষ দিয়ে তৈরী কতকগুলি ঐককেন্দ্রিক আস্তরন দ্বারা আবৃত।

লিথোসফিয়ারের সংযুতি (composition) সর্বত্র একরকম নয়—তাপমাত্রা, চাপ প্রভৃতির অবস্থাভেদে এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়ে থাকে। এর ভিত্তিতে লিথোসফিয়ারকে তিনটি স্তর বা বেল্টে ভাগ করা হয়। দশ থেকে বার মাইল নীচে, পাঁচ হাজারেরও বেশী বায়ুচাপ এবং এক হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আকর্ষক স্তর অবস্থিত। এর উপরেই হল রূপান্তরিত স্তর। এখানে চাপের পরিমাণ বায়ুচাপের কয়েক হাজার গুণ এবং এই চাপ শুধু এক দিক থেকে পড়ে; তাপমাত্রা জলের সঙ্কট তাপমাত্রার (৩৭৪° সেন্টিগ্রেড) অনেকটা উপরে ও নীচে ওঠা নামা করে। রূপান্তরিত স্তরের উপরে ক্ষয়িষ্ণু (weathering) স্তর। এখানকার তাপমাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার সমান এবং চাপের পরিমাণ বায়ুর চাপ ও সমুদ্রের তলদেশের চাপ, এর মধ্যে যে কোনও রকম হতে পারে। লিথোসফিয়ারের তিনভাগের দুভাগেরও বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে হাইড্রোসফিয়ার। হাইড্রোসফিয়ারের সর্বাধিক গভীরতা প্রায় ৭ মাইল এবং গড়ে এই গভীরতা দু'মাইলের একটু উপরে।

আবহাওয়া মণ্ডল (উচ্চতা =১৬০ কি মি.)
আকর্মক স্তর
রূপান্তরিত স্তর
লিথোসফিয়ার ও
হাইড্রোসফিয়ার
(গভীরতা = ১২০ কি.মি.)
ব্যারিসফিয়ার
১২০ কি.মি.

৩নং চিত্র : ভূত্বক
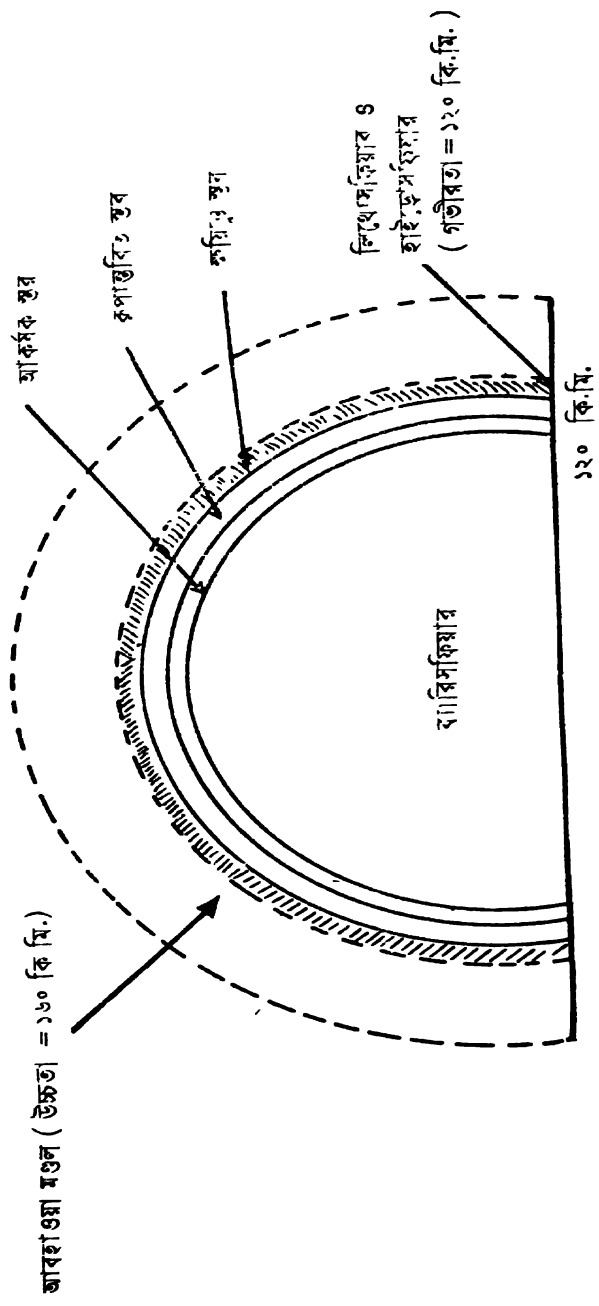
লিথোসফিয়ার ও হাইড্রোসফিয়ারের উপরেই হল বায়ুমণ্ডল বা আবহাওয়া মণ্ডল।

লিথোসফিয়ারের উপাদানগুলির গড় শতকরা অনুপাত ৩ নম্বর তালিকায় দেখানো হল।

৩ নম্বর তালিকা

লিথোসফিয়ারের উপাদানগুলির শতকরা অনুপাত
(ক্লার্কের মতানুসারে)

অক্সিজেন	৪৭.৩৩	টাইটেনিয়াম	০.৪৬
সিলিকন	২৭.৭৪	কারবন	০.১০
এ্যালুমিনিয়াম	৭.৮৫	ক্লোরিন	০.০৬
আয়রণ (লৌহ)	৪.৫০	ফসফরাস	০.১২
ক্যালসিয়াম	৩.৪৭	সালফার	১.১২
ম্যাগনেসিয়াম	২.২৪	বেরিয়াম	০.০৮
সোডিয়াম	২.৪৬	ম্যাঙ্গানিজ	০.০৮
পটাসিয়াম	২.৪৬	স্ট্রনসিয়াম	০.০২
হাইড্রোজেন	০.২২	ফ্লোরিন	০.১০
অন্যান্য মৌলিক পদার্থ	০.৫০		

তালিকার অঙ্কগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ধাতব মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে এ্যালুমিনিযাম, আয়রণ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের প্রাচুর্য্য সব থেকে বেশী। অধাতব পদার্থগুলির মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকনই প্রধান এবং লিথোসফিয়ারের শতকরা ৭৫ ভাগই হল অক্সিজেন ও সিলিকন।

লিথোসফিয়ারের উপরের অংশটি হল ক্ষয়িষ্ণু বা ওয়েদারিং স্তর। বিশ্লিষ্ট আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলার দ্বারা গঠিত এই অংশকেই বলা হয় মাটি। ভূমির গড় ও সর্বাধিক উচ্চতা যথাক্রমে ৮২৬ ও ৮৮৮৮ মিটার। সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা হল ৩৬৮০১ মিটার। "যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ভূত্বক ৫ × ১০^{৯} বছর ধরে নিয়মিত ভাবে বেড়ে চলেছে তাহলে দেখা যাবে, এর গভীরতা বছরে

১×১০^{-৩} সেন্টিমিটার করে বেড়েছে; আর যদি ৫×১০^{৬} বছর ধরে বেড়ে থাকে তাহলে এই বৃদ্ধির পরিমাণ হবে বছরে ১ সেন্টিমিটার। আবার যদি এই ক্রিয়া ৫×১০^{১} বছরে সম্পূর্ণ হত তাহলে এই বৃদ্ধির হার হত বছরে ১০ মিটার করে।"[২]

ভূ-পৃষ্ঠে জলভাগের অবস্থান বণ্টন ২ নম্বর পরিশিষ্টে দেখানো হল।

কিভাবে মাটির সৃষ্টি হল

গোটা স্থলভাগ জুড়েই প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে মাটির অবস্থিতি। কোনও কোনও জায়গায় মাটি বেশ গভীর, যেমন সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে; আবার কোথাও বা অগভীর, যেমন পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু জায়গা ও পাহাড়ের চূড়ায়। মাটি লাল, কালো ইত্যাদি নানা রঙের হতে পারে—যেমন বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের মাটি লাল; মালয় মালভূমির মাটি কালো। মাটির টেক্সচার বা দানার বিন্যাসও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে—রাজপুতনা মরুভূমির জয়সালমার ও বিকানীরের মাটি বেলে, আবার উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলায় নদীর অববাহিকা অঞ্চলের ধান জমির মাটি এঁটেল। সব মাটিই খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, জল ও বায়ু দ্বারা গঠিত এবং প্রধান প্রধান উপাদানগুলি মোটামুটি একই। মাটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা এই তিনটিই আছে।

বিভিন্ন জাতের শিলাগুলি (আগ্নেয়, পাললিক, রূপান্তরিত) রোদ, বৃষ্টি ও বাতাসের প্রভাবে নানাবিধ ভৌতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হয়ে যে সূক্ষ্মতর শিলাজাত পদার্থে পরিণত হয় তাকে বলা হয় মূল উপকরণ (parent meterial) এবং প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় "ওয়েদারিং"। ওয়েদারিংএর সময় এই আলগা

১। পার্থিব পদার্থগুলির মধ্যে ৯৩ শতাংশ লিথোসফিয়ারের অন্তর্ভুক্ত।

২। **M. Florkin, Aspects of the Origin of Life, 1960, Perganon Press, P. 21. International Series of Monographs on Pure and Applied Biology, Volume 6.**

শিলাজাত পদার্থগুলিতে কিছুদিন ধরে নানাবিধ উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মাতে থাকে এবং শুরু হয় মাটির সৃষ্টি। যখন বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছপালাগুলি জন্মায় তখন তাদের পাতাগুলি মাটিতে ঝরে পড়ে এবং মরে যাওয়ার পর গাছের সবটাই আবার মাটিতে যুক্ত হয়।

৪নং চিত্র : ভূত্বকের মৌলিক পদার্থগুলির উপাদান
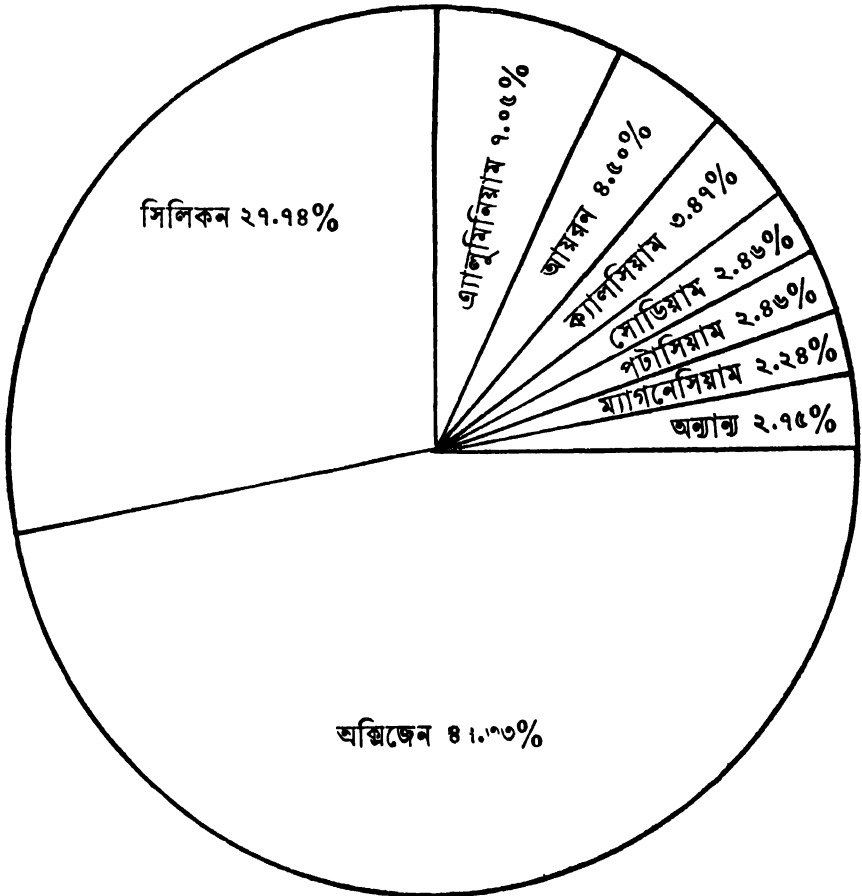
কেঁচো, পোকামাকড়, উঁই এবং মাটি খোঁড়ে এরকম অন্যান্য নানা জীবজন্তু উদ্ভিদের দেহাবশেষ খেয়ে বেঁচে থাকে—প্রচুর পরিমাণে মাটি এদের খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে এবং পুষ্টি নালী অতিক্রম করে নির্গত হয়। এরা মাটি খুঁড়ে ছোট ছোট নালী ও গর্তের সৃষ্টি করে বিভিন্ন স্তরের পদার্থগুলিকে মিশ্রণে সাহায্য করে। মরে যাওয়ার পর এদের দেহাবশেষ মাটিতে যুক্ত হয়। ব্যাক্‌টেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুগুলি (ক) উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষকে বিযোজিত করে এবং উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী বা ধুয়ে অপসারিত হতে পারে এইরূপ অবস্থায় রূপান্তরিত করে, (খ) কার্বন ডাই-অক্সাইড, জৈব এ্যাসিড, হিউমাস ও অন্যান্য নানাবিধ আঠালো পদার্থ (মাটির গঠন তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয়) প্রস্তুত করে এবং (গ) মরে যাওয়ার পর সাংশ্লেষিক কোষ পদার্থগুলি দ্বারা (synthesised cell substances) হিউমাসকে পরিপুষ্ট করে তোলে।

কার্বলিক এ্যাসিড ও অন্যান্য জৈব এ্যাসিড (পাতা ও গাছের অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশের উপর সূক্ষ্ম জীবাণুর কার্য্যাবলীর দ্বারা উৎপন্ন, বিশেষ করে সিক্ত ও শীতল অরণ্যভূমিতে) নীচের দিকে নামার সময় ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম জাতীয় ক্ষারক ও অন্যান্য দ্রবণীয় পদার্থগুলিকে ধুয়ে নিয়ে যায়। আয়রন (লৌহ) ও এ্যালুমিনিয়াম ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলিরও দ্রবীভূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে—কতকগুলি কলয়ডাল ক্লে ও হিউমাস পেপ্‌টাইসড হয়ে নীচের স্তরে এসে জমা হতে পারে। জলবায়ু (কার্য্যকরী বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা) গাছপালা ও অন্যান্য প্রাণী এবং ভূ-পৃষ্ঠের গঠন অনুযায়ী মূল উপকরণের (প্যারেণ্ট ম্যাটিরিয়ালের) উপর ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণের প্রভাবে মাটির সুস্পষ্ট 'প্রোফাইল' (profile) তৈরী হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেক মাটিরই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সূচীত হয় তার
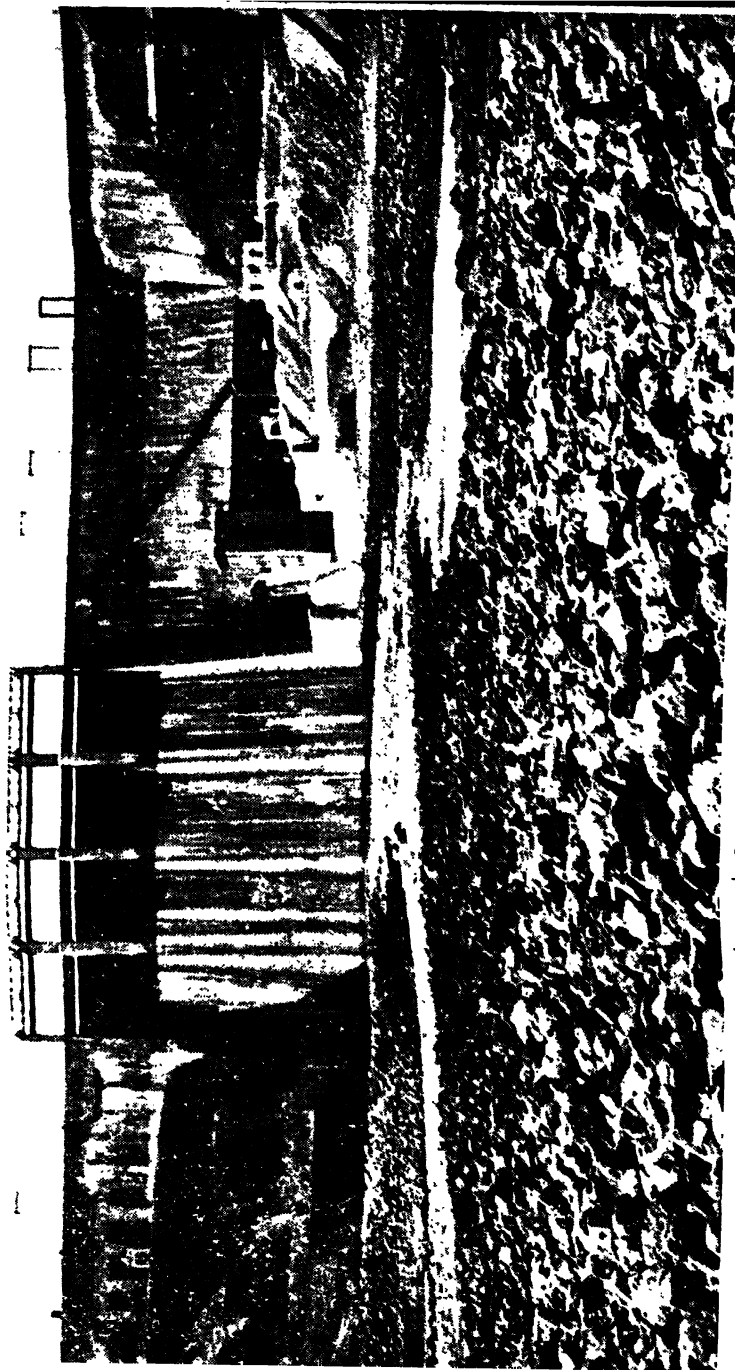
প্লেট ৫—দুই দিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ ভদ্রা নদীর উপরে লাখাভ্যালী বাঁধ (২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৬—বদ্রীনাথ যাওয়ার পথে উত্তর গারওয়ালে অবস্থিত
অলকানন্দা (২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
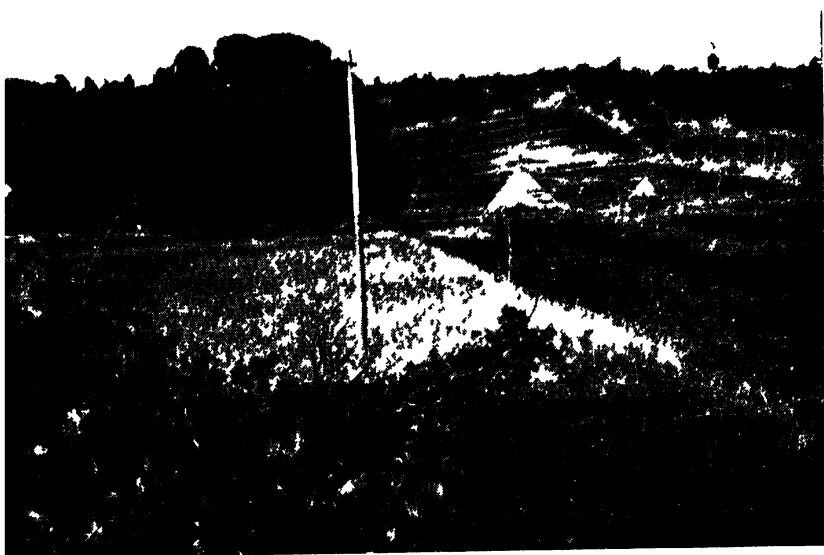
প্লেট ৭—অত্যন্ত নিবিড চাষ, সুন্দবগড জেলা (উডিষ্যা) প্রথম শ্রেণীব ভূমি (১২নং পৃষ্ঠায দেখুন)

প্লেট ৮—নিবিড চাষ, সুন্দবগড জেলা (উডিষ্যা) দ্বিতীয শ্রেণীব ভূমি (১২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৯—মাঝামাঝি নিবিড় চাষ, সুন্দরগড় জেলা (উড়িষ্যা)
তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি (১২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ১০—সীমিত চাষ, সুন্দরগড় জেলা (উড়িষ্যা)— চতুর্থ
শ্রেণীর ভূমি (১৩নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
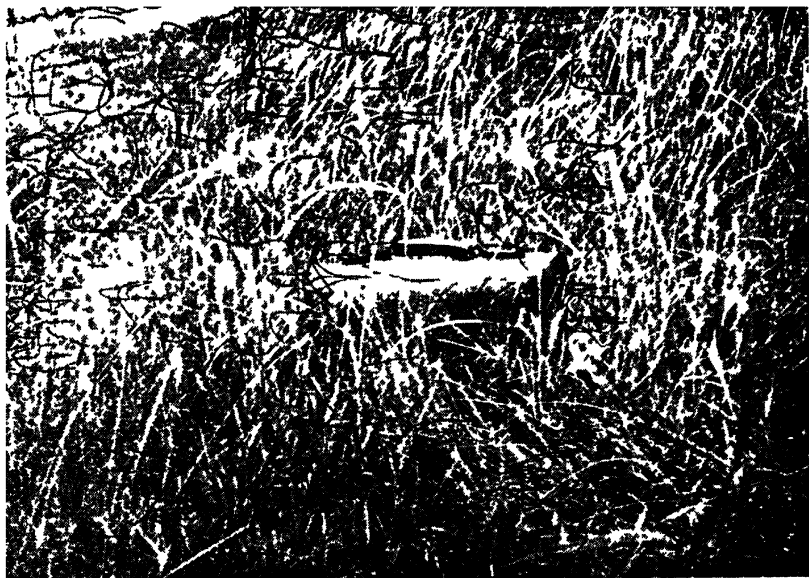
প্লেট ১১—নিবিড় পশুচারণ, সুন্দরগড় জেলা (উড়িষ্যা)
—পঞ্চম শ্রেণীর ভূমি (১৪নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ১২—সীমিত পশুচারণ, সুন্দরগড় জেলা (উড়িষ্যা)—
ষষ্ঠ শ্রেণীর ভূমি (১৪নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
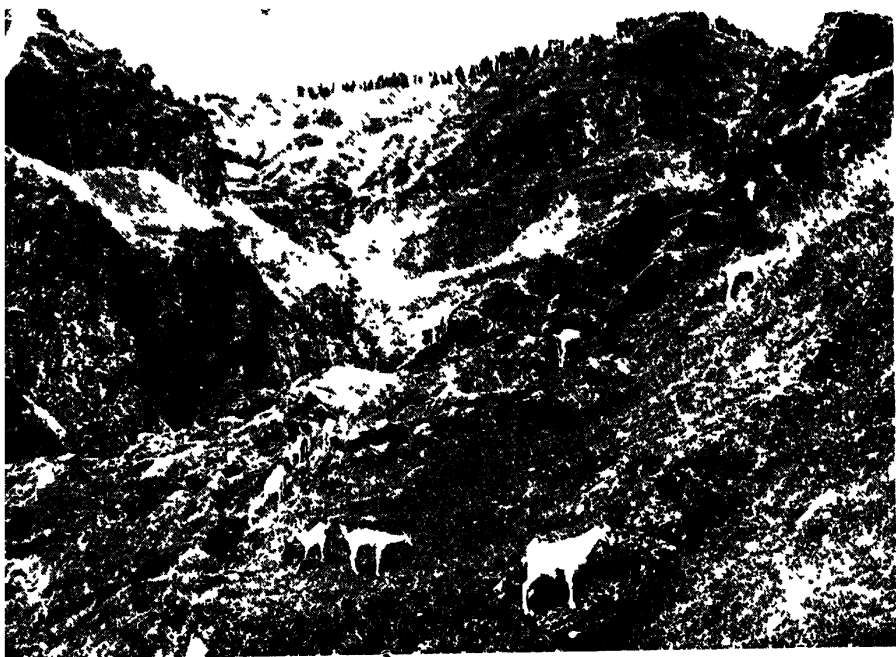
প্লেট ১৭—চন্দনধর অঞ্চলে ছাগ-চারণ ক্ষেত্র—কান্দু পর্ব্বতমালা
—চোপাল বন বিভাগ (৯০নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ১৮—সিরুরের নিকট মৌসুমী বৃষ্টিপাত হেতু ভূমিক্ষয়—কোমাণ্ড
অঞ্চলে ২-৩% ঢাল—বৃক্ষসারি বরাবর সেচ দেওয়ার জন্য
খোদ পরিকল্পনার খাল (৯০নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রোফাইল দিয়ে (মাটিকে উপর থেকে নীচে খাড়াভাবে কাটলে যে স্তর বিন্যাস দেখা যায়, তাকে বলা হয় প্রোফাইল)। প্রকৃত-পক্ষে, মাটির প্রোফাইল তার নিজের মধ্যেই নিজের ইতিহাসকে বহন করে চলে।

মুল উপকরণ থেকে মাটি তৈরী হতে কত সময় লাগে ?

হিমপ্রবাহ তাড়িত পদার্থগুলির মত যে সমস্ত পদার্থ খুব সহজেই চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হয়, তাদের উপরের ভাগটা নতুন মাটিতে পরিণত হোতে ৩০ বছরের ওয়েদারিংএর প্রয়োজন। উপরের স্তর ও নীচের স্তর নিয়ে একটি পরিণত মাটি তৈরী হোতে ৫০ বছর সময় লাগে। বায়ুতাড়িত মোটা দানার পদার্থগুলো থেকে পরিণত মাটি তৈরী হোতে ২০,০০০ বছর লাগতে পারে।

ভুমির উৎপত্তি

ভূ-পৃষ্ঠের দৃষ্টমান অংশ থেকে (landscape) তার ভূপ্রকৃতি, গাছপালা, জলধারা, শিলার গঠন প্রভৃতি নানারকম বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপ বুঝা যায়। মাটি ও তার প্রোফাইলের বৈশিষ্ট্যের উপর এগুলোর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শীতল ও সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে আদি ভূ-পৃষ্ঠ ঢেউখেলানো ও অসমান বা অসমতল হয়েছিল বলে বিশ্বাস। এইভাবে বহু উচ্চভূমি (পাহাড়, পর্বত ও মালভূমি) ও গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে এই গহ্বরগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জল জমে সমুদ্র, হ্রদ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে।

(১) ভূকম্পন, (২) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, (৩) পর্বতের সবেগে উত্থান, (৪) সমুদ্রের অবনমন ও পশ্চাদপসরণ, (৫) হিমবাহের আপতন, (৬) ফাটল, মৃত্তিকাস্তরের স্থানচ্যুতি ও ভূ-পৃষ্ঠের ভাঁজ এবং (৭) জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য হিমপ্রবাহ ও মরুভূমির সৃষ্টি ইত্যাদি নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার ফলে বহু স্থানেই আদি-প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত

হয়েছে। পাহাড়, পর্বত ও মালভূমির শিলাগুলি (১) রোদ, (২) বৃষ্টি, (৩) বাতাস, (৪) বরফ, (৫) হিমবাহ ও (৬) জলস্রোত ইত্যাদির প্রভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হয়ে (weathering) যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ক্ষয়ীভূত বস্তুগুলি, যেমন পলি, বালি, নুড়ি, বায়ুতাড়িত পলিজাতীয় পদার্থ (loess), বালুকাস্তুপ ইত্যাদি অন্যত্র এসে স্তরে স্তরে জমা হয়েছে।

জলবায়ু

ভারতবর্ষের জলবায়ু ও আবহাওয়া বৈচিত্রময়। উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের, উপকূল ভাগের সঙ্গে দেশের মধ্যভাগের ও পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে পূর্ব উপকূলের জলবায়ু ও আবহাওয়ার কোন মিল নাই। স্বাভাবিক ভাবে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আসাম পাহাড় অঞ্চলে ১১৬৮০ মিলিমিটার ও পশ্চিমঘাট পর্বত-মালার উন্মুক্ত অঞ্চলে ৭৬২০—১০১৬০ মিলিমিটার থেকে শুরু করে রাজস্থানে ৭৬ মিলিমিটারেরও কম। এ থেকেই বুঝা যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের নমুনা। বছরের একটা সময় কতকগুলো অঞ্চল অতিবৃষ্টিতে প্লাবিত হয়ে যায়; আবার আরেকটা সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ক্রমাগত খরা চলতে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চল প্রায়শই ঘূর্ণিবাত্যায় বিপর্য্যস্ত হয়; ফলে ঝঞ্ঝাজনিত উত্তাল ঢেউ পশ্চিম বঙ্গের উপকূল ভাগের নীচু জমি, মহানদী, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর বদ্বীপ অঞ্চলগুলিকে ধুয়ে নিয়ে যায়। বছরের এক সময় থাকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, অত্যধিক ও ঘন ঘন বৃষ্টিপাত এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা; আবার অন্য সময়ে থাকে মাঝামাঝি উত্তাপ ও অল্প বিস্তর ঝড়ো হাওয়া সমেত মাঝামাঝি বৃষ্টিপাত। ভারতবর্ষের প্রায় সবটা বৃষ্টিপাতই হয় ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জলীয় বাষ্প থেকে। এই বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতকে বলা হয় দক্ষিণ পশ্চিম-মৌসুমি। ১লা জুন নাগাদ ইহা প্রথমে কেরালায় শুরু হয়ে ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হতে হতে ১৫ই জুলাই নাগাদ

৪ নম্বর তালিকা

সুনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল, মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চল ও শুষ্ক অঞ্চল সমূহ[১]

বৃষ্টিপাত	অঞ্চল	মোট আয়তনের শতকরা পরিমাণ
সুনিশ্চিত (বার্ষিক ১১৪ সেঃ মিঃ ও তার উপর)	আসাম (নেফা সহ), বিহার, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশুর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর, মনিপুর, লাক্ষাদ্বীপ এবং মিনি-কয় ও ত্রিপুরা।	২৯·৬
মধ্যম (বার্ষিক ৭৬ সেঃ মিঃ ও ১১৪ সেঃ মিঃ এর মধ্যে)	অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশুর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ।	২১·২
শুষ্ক (বার্ষিক ৭৬ সেঃ মিঃ এর কম)	অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশুর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লী।	৪৯·২

[১] প্রাপ্তি সূত্র : "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার ইন ব্রিফ," ডাইরেক্টরেট অফ ইকনমিক্স এ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, মিনিষ্ট্রি অফ ফুড এ্যাণ্ড এগ্রিকালচার, ষষ্ঠ সংস্করণ

পশ্চিম পাঞ্জাবে পৌঁছায়। মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭৫ ভাগই হয়ে থাকে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে—দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমির সময়।

ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তর পূর্ব দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়ে জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর পাঞ্জাব, আসাম, পশ্চিম বঙ্গের উপকূল ভাগ ও উপদ্বীপীয় অঞ্চলের সর্ব দক্ষিণ অংশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়। একে বলা হয় উত্তর পূর্ব মৌসুমি। উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল ভাগের জেলাগুলিতে বঙ্গোপসাগরের ঘুর্ণিবাত্যার জন্য দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব মৌসুমির মধ্যের সময়টায়ও কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়। ভারতবর্ষের মোট বৃষ্টিপাতের দুই শতাংশ মাত্র উত্তর পূর্ব মৌসুমির সময় হয়ে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী ও নতুন দিল্লীতে বছরের বিভিন্ন সময়ের বৃষ্টিপাত ৩ নম্বর পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে।

সুনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল, মাঝারি বৃষ্টিপাত অঞ্চল ও শুষ্ক অঞ্চল গুলোর বিবরণ ৪নং তালিকায় দেওয়া হয়েছে।

ভূতাত্বিক গঠন

এক এক রকমের শিলা থেকে এক এক রকমের মাটি তৈরী হয়। শিলার তারতম্যের জন্য তার উপরের মাটির ঘনত্ব, গভীরতা ও ও সংযুতির তারতম্য হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও জৈবশক্তির প্রভাবেও মাটির কতকগুলো রূপান্তর সাধিত হয। তবে, যে কোনও শ্রেণীর মাটি তার আদি ভূতাত্বিক গঠন প্রকৃতির জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো পায়, তা মোটামুটি একই থাকে।

ভূতত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষের মাটির উৎপত্তিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রাচীন-কেলাসিত ও রূপান্তরিত শিলা: ভারতবর্ষের উপ-দ্বীপীয় অংশ কতকগুলো প্রাচীন শিলা, যেমন গ্রানাইট, নেইসেস ও কেলাসিত শ্লেট পাথর এবং কতকগুলো লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম

গঠিত অপ্রধান শিলা দ্বারা গঠিত। এই শিলাগুলি থেকে পরিণত লাল মাটির উৎপত্তি হয়েছে।

কুদ্দাপ্যা ও বিন্ধ্য ঃ বিন্ধ্য শিলা ও কুদ্দাপ্যা শিলার একটা বৃহৎ অংশ থেকে এই মাটির উৎপত্তি। কুদ্দাপ্যা শিলাগুলো প্রধাণত বালুকাত্মক। খুব পুরানো মাটি বলে এ মাটিও যথেষ্ট পরিণত।

গণ্ডোয়ানা ঃ নদীপ্রবাহের পুরানো সঞ্চিত বালি ও পলি দ্বারা গঠিত উপদ্বীপীয় উচ্চভূমির মধ্যে মালার আকারে সাজানো বাটীর মত খাদগুলোতে এর অবস্থিতি। গণ্ডোয়ানা শিলা থেকে তৈরী মাটি অপেক্ষাকৃত কম পরিণত এবং নীচু মানের উর্বরতা সম্পন্ন। মাটিগুলির প্রকৃতি মোটামুটি একই রকমের।

দাক্ষিনাত্যের ট্র্যাপ (এ্যালুমিনিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত পদার্থ পুষ্ট এক শ্রেণীর আগ্নেয়গিরির লাভা) ঃ দাক্ষিণাত্যের আগ্নেয় শিলা থেকে উদ্ভূত গ্রীষ্মমণ্ডলের এই মাটি উর্বর এবং যথেষ্ট জলধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট। এই মাটিকে “রেগার” বা “কাল তুলা মাটি” বলা হয়।

অতি-উপদ্বীপীয় ভারতের (Extra-Peninsular India) **তৃতীয় গঠন ভুক্ত ও মেসোজয়েক পাললিক শিলা ঃ** এই শ্রেণীর মাটিগুলো প্রধাণত অতি-উপদ্বীপীয় ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের খাদ ও উপত্যকাগুলি জুড়ে আছে। এই মাটিগুলি সাধারণতঃ অপরিণত।

আধুনিক ও অর্দ্ধ আধুনিক শিলা ঃ এই অংশের মাটি জল বা বায়ু তাড়িত পদার্থগুলি দিয়ে তৈরী, এবং এর উৎপত্তি শিলার বিশ্লিষ্ট শিলাজাত পদার্থ দিয়ে তৈরী দাক্ষিণাত্যের স্থিত (residual) মাটি থেকে সম্পুর্ণ আলাদা। (ক) পুরাতন সিন্ধু-গাঙ্গেয় এ্যালুভিয়াম, (খ) নূতন সিন্ধু গাঙ্গেয় এ্যালুভিয়াম, (গ) বদ্বীপীয় এ্যালুভিয়াম, (ঘ) ল্যাটারাইট শিলা ও (ঙ) মরুভূমির পঞ্জীভূত বালি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের মাটির শ্রেণী বিভাগ ও অবস্থান-বণ্টন

ভারতবর্ষের মাটিকে চারটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

১। পলল মাটি ;
২। কালো মাটি (রেগার) ;
৩। লাল মাটি ;
৪। ল্যাটারাইট ও ল্যাটারাইট জাতীয় মাটি।

উপরোক্তগুলি ছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও চার শ্রেণীর মাটির নাম করা চলে, যথা ঃ

৫। অরণ্য অঞ্চলীয় মাটি ;
৬। মরু অঞ্চলীয় মাটি ;
৭। লোণা এবং ক্ষার মাটি ;
৮। পিট বা বোদ মাটি।

এইসব শ্রেণীর এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিস্তারী গোষ্ঠীর মাটিগুলির অবস্থান বণ্টন ২ নম্বর মানচিত্রে দেখানো হয়েছে।

১। পলল মাটি

ভারতবর্ষের কৃষিসম্পদে এই শ্রেণীর মাটির অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী। এটিই এদেশের সব থেকে প্রয়োজনীয় মাটি এবং এর প্রাচুর্য্যও সর্বাধিক। ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলগুলির প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এর বিস্তৃতি। স্থানবিশেষে যথেষ্ট ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের মাটিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অসংখ্য নদীপ্রবাহের দ্বারা বাহিত ও সঞ্চিত পদার্থ ও পলি দ্বারা এই মাটিগুলি গঠিত—সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চলের শিলাসমূহের প্রাকৃতিক ক্ষয় ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সূক্ষ্মতর পদার্থগুলি নদীপ্রবাহের দ্বারা পরিবাহিত হয়ে সমতলভূমিতে তাদের গতিপথের পাশে জমা

হয়ে এইসব মাটির সৃষ্টি করে থাকে। ভূতত্ব অনুযায়ী পলল মাটিগুলিকে আবার প্রধান ছুটি ভাগে ভাগ করা হয়। খাদার (khadar)—অর্থাৎ বালুকাময় হালকা রঙের ও অপেক্ষাকৃত কম কাঁকর ঘটিত উপাদানের নতুনতর পলল, এবং ভাংগর (bhangar)—অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত এঁটেল, সাধারণত গাঢ় রঙের ও কাঁকরবহুল প্রাচীন পলল। বাহ্যিক গঠনের দিক থেকে এরা ঝুরো বালি কিংবা দোঁয়াশ এবং সূক্ষ্ম পলি কিংবা শক্ত কাদা—নানা প্রকারের হতে পারে। কখনও আবার এগুলির মাঝে নুড়ির স্তরও দেখা যায়। তাছাড়া এইসব পলল মাটির মধ্যে কখনও কখনও বিশেষ গভীরতায় বালি ও চূণাপাথরের সূক্ষ্মকণা জমাট বেধে শক্ত অপ্রবেশ্য স্তরের সৃষ্টি করে। উত্তর প্রদেশ, দিল্লী ও পাঞ্জাবের সিন্ধু-গাঙ্গেয় পলল অঞ্চলে কাঁকরের স্তরও দেখা যায়।

আসামের প্রাচীন পললগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এদের অম্লতা। আসামের নদীতটবর্ত্তী অঞ্চলের নতুন পলল অবশ্য কম আম্লিক কিংবা প্রশম, কোথাও আবার ক্ষারকীয়ও বটে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মাটি সাধারণত বেলে ধরণের। এদের মধ্যে উদ্ভিদের প্রাপ্তব্য এবং মোট পটাসের পরিমাণ এবং ফসফেটের উপস্থিতি বেশ যথেষ্ট এবং জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ মাঝারি ধরণের। সূর্মা উপত্যকার মাটি সূক্ষ্ম দানার সমবায়ে গঠিত।

পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ার কিছু অংশ সহ প্রায় সমগ্র রাঢ় অঞ্চল প্রধাণত প্রাচীন পলল দিয়ে তৈরী। কিন্তু এই প্রদেশের অবশিষ্ট অঞ্চল আধুনিক পললে গঠিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মাটি অত্যন্ত উর্বর ও সুফলা। নতুন বা সাম্প্রতিক পললগুলির দানার বিন্যাস (texture) বেলে দোঁয়াস থেকে এঁটেল প্রকৃতির মধ্যে নানারকমের হতে পারে এবং স্তরবিন্যাসে সুনির্দ্দিষ্ট স্তরে কর্দমাধারের (clay pan) সৃষ্টি করে।

বিহারের পলল মাটিকেও প্রকৃতিগত সুষ্টতা অনুসারে ছুটি প্রধান ভাগে ফেলা যায়ঃ—(ক) গাঙ্গেয় উত্তর পলল এবং (খ) গাঙ্গেয়

দক্ষিণ পলল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পলল অঞ্চলের বিস্তৃতি ৬ওরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত। এখানকার মাটি বেলে পালিলিক প্রকৃতির; কিন্তু পশ্চিমে ত্রিভুজাকার চূণামাটির বন্ধনী এবং মধ্যভাগে বিচ্ছিন্ন প্লাব্য অঞ্চল—এগুলি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে প্লাবিত অবস্থায় থাকে। এসব মাটি বেলে দোঁয়াস থেকে এঁটেল—দোঁয়াস প্রকৃতির এবং প্রশম কিংবা ক্ষারধর্ম্মী। রা মোট ও প্রাপ্তব্য পটাস এবং চূণের পরিমাণে সমৃদ্ধ, কিন্তু ফসফরাসের স্বল্পতায় ত্রুটি-যুক্ত। বিহারের দক্ষিণ পললভূমি উত্তরে গঙ্গা থেকে দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রং ও গঠন প্রকৃতি অনুসারে এখানকার মাটি হাল্‌কা-ধূসর দোঁয়াস থেকে ভারী ও কালো এঁটেল প্রকৃতির মধ্যে নানারকমের হয়। এই ভূমির মধ্যভাগ একটু নীচু; বর্ষাকালে জল জমে বড় বড় হ্রদের মত দেখায়। রাসায়নিক বিক্রিযায় এইসব মাটি মোটামুটি প্রশম প্রকৃতির। উত্তর পললভূমি অপেক্ষা এখানকার মাটিতে প্রাপ্তব্য পটাস ও ফসফরাসের ভাগ বেশী কিন্তু চুণের পরিমাণ কম।

উত্তর প্রদেশের পলল মাটিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, তা হল: (ক) পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের হালকা পলল, (খ) পূর্বের ভারী পলল, (গ) মধ্যাঞ্চলের মাঝারি প্রকৃতির পলল এবং (ঘ) উত্তর-পূর্বের চুণাপাথর যুক্ত মূল উপকরণের (parent material) উপর গঠিত পলল। এইসব মাটিতে বিভিন্ন পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও দ্রবণশীল লবণ থাকে। বিক্রিয়ায় এরা প্রশম থেকে ক্ষারধর্মা। রাজ্যের উত্তরে ও পূর্বে অবস্থিত দেওরিয়া ও গোরক্ষপুর অঞ্চলের পলল মাটি চূণাপাথরের মূল উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইসব মাটি যথেষ্ট উর্বর এবং আখই এখানকার সর্বাপেক্ষা উপযোগী ফসল।

উড়িষ্যার উপকূল জুড়ে দেখা যায় বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি এবং বালির পাহাড়। মাঝে মাঝে বদ্বীপ অঞ্চলীয় জলাভূমি। এই উপকূল ভূখণ্ডের পিছনের দিকে কর্ষিত পললভূমির প্রান্তর। এই মাটি

মিহি ও বেলে ধরণের এবং এতে পটাসের পরিমাণ প্রচুর কিন্তু ফসফরাসের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। রাজস্ব-রীতি অনুসারে এই রাজ্যের পললভূমিকে অবস্থাবিশেষে আত (At), মাল (Mal), বের্ণা (Berna,) ও বেহাল (Behal)—এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। আত ভূমি উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত এবং জলাভাবই এখানকার কৃষিকার্যের প্রধান অন্তরায়। মাল ও বের্ণা মাঝারি ঢালে এবং সবচেয়ে ভারী বেহাল ভূমি নীচু অঞ্চলে অবস্থিত।

মাদ্রাজের পলল অপসৃত প্রকৃতির এবং এগুলি বদ্বীপ অঞ্চল ও উপকূল রেখা বরাবর দেখা যায়। এই মাটির প্রোফাইল থেকে বুঝা যায় এদের গঠনে নদীপ্রবাহে আনীত বালি ও পলির একান্তর স্তরবিন্যাস। এই পলল মাটির স্তরের সংযুক্তি নির্ভর করে বাহিত পলির প্রকৃতি এবং নদী অববাহিকার গঠন বৈশিষ্ট্যের উপর। গোদাবরী পলল প্রকৃতি অনুসারে কাবেরী-পলল থেকে ভিন্ন। পূর্বোক্ত মাটিতে থাকে কালো উর্বর কাদা, কিন্তু শেষোক্তটিতে উদ্ভিদাদির পুষ্টি উপযোগী পদার্থের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

গুজরাটে কেবলমাত্র উত্তরাঞ্চলগুলিতে—আমেদাবাদ ও খয়রা জেলায় পলিমাটির অবস্থান দেখা যায়। এই মাটির স্থানীয় নাম "গোরাডু"। বরোদার 'গোরাট' পলল প্রাচীনতর এবং কাঁকর মিশ্রিত বাদামী কাদার সমবায়ে গঠিত। নতুন পললগুলিকে বলা হয় "ভাটা"। এই মাটি বহুলাংশেই দ্বিতীয় শ্রেণীর সঞ্চিত পলিভুক্ত এবং বেশ গভীর। এতে জৈবপদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত হলেও ফসফেট ও পটাসের উপস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে বেশী।

বালাঘাট এবং দুর্গ, রায়পুর ও বিলাসপুর জেলাগুলিসহ মহানদীর অববাহিকায় (মধ্যপ্রদেশ) হালকা ও বেলে লাল কিংবা হল্‌দে মাটিগুলির উৎস পাললিক। ভূমির উচ্চতা অনুযায়ী এই অঞ্চলের মাটিকে "ভাটা", "মাতাসী", "দোর্সা" এবং "কান্‌হার"—এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কাঁকুরে, বেলে, লাল্‌চে ও হল্‌দে রঙের ভাটা মাটি অধিক উচ্চতায় অবস্থিত এবং সাধারণত এরা অনুর্বর

পতিত জমির অন্তর্ভুক্ত। হল্‌দে, দোঁয়াস থেকে এঁটেল প্রকৃতির ভাল ধান উৎপাদক মাতাসী মাটি উচ্চ বা সমতলভূমিতে দেখা যায়। ঢালু জমির দোর্সা মাটি মাতাসীর মতই প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং ভাল ধানি জমি কিন্তু রঙের দিক থেকে গাঢ়তর। কান্‌হার নীচু জমিতে দেখা যায়। এরা দোর্সা ও মাতাসী মাটির চেয়ে গাঢ় এবং ভারী। এ মাটিতে ধানই প্রধান ফসল হলেও গমও উৎপন্ন হয়।

পাঞ্জাবের সমতলভূমির মাটি সিন্ধু-গাঙ্গেয় অঞ্চলের আদর্শ পাললিক প্রকৃতির। এখানকার মাটি বেশীর ভাগই দোঁয়াস কিংবা বেলে দোঁয়াস এবং মাটির গভীরতা বিভিন্ন রকমের। এখানকার স্তর বিন্যাসে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। নীচের স্তরগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দলা পাকানো কাঁকর জাতীয় উপাদানে গঠিত। এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে দ্রাব্য লবণ থাকে এবং বিক্রিয়ায় এরা ক্ষারধর্মী। ফসফেট ও পটাসে এরা সমৃদ্ধ হলেও জৈবপদার্থ ও নাইট্রোজেনের অভাবই এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কেরালায় দুরকমের পলল দেখা যায়—উপকূলীয় পলল এবং নদীতটবর্ত্তী পলল। মধ্য কেরালায় উপকূলীয় পললের বিস্তৃতি বেশী, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে এর অবস্থান সংকীর্ণ। কুট্টানাদের পলল মাটি একটি নিম্নাঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। মনে হয় একসময় এই ভূমি সমুদ্রের অংশ বিশেষ ছিল; পরে নদীবাহিত পলি দিয়ে ভরাট হয়েছে। সমুদ্র উপকূলের পলল মাটি বেলে প্রকৃতির এবং স্বল্প জলধারণ ক্ষমতা ও পুষ্টি উপাদানের অভাব বিশিষ্ট। নদীতটের পলল অত্যন্ত উর্বর।

সবরকমের পললেই নাইট্রোজেনের অভাব অত্যন্ত তীব্র এবং ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটিই হল এরূপ মাটির প্রধান অন্তরায়। চূনামাটি ও লোনা-ক্ষার মাটির ক্ষেত্রে অবশ্য ফসফরাসের ঘাটতি এবং লবণের আধিক্যই যথাক্রমে শস্য উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

(২) কালোমাটি—(রেগার)

দাক্ষিণাত্যের আগ্নেয়শিলা উদ্ভূত মাটিগুলি সাধারণত কালো-মাটি, যার পরিচিত নাম হল রেগার। এগুলি প্রায় ৫,৪৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, মহীশুর, অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাটের কিছু কিছু অংশ এবং দক্ষিণ প্রান্তের রামনাদ ও তিনাভেল্লী জেলাসহ মাদ্রাজের অংশ বিশেষ এই কালোমাটি অঞ্চলের অন্তর্গত। দুরকমের শিলা থেকে এই মাটির উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্য ও রাজমহলের আগ্নেয় শিলাস্তর এবং মাদ্রাজ প্রদেশের মাঝারি শুষ্ক অঞ্চলের লৌহঘটিত নেইস্ (gneiss) ও সিষ্ট (schist) থেকে এই সব মাটির সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমোক্ত শিলাশ্রেণী উদ্ভূত মাটি কখনও কখনও বেশ গভীর স্তর বিন্যস্ত করে; কিন্তু শেষোক্ত শিলা থেকে সাধারণত অগভীর স্তর বিশিষ্ট মাটির সৃষ্টি হয়। অনেক সময়েই প্রায় ১৮০ থেকে ২৫০ সেঃ মিঃ গভীরতা পর্য্যন্ত মাটির রঙের কোনো পরিবর্তনই চোখে পড়ে না।

অধিকাংশ কালোমাটিই অত্যন্ত উর্বর, কিন্তু কিছু কিছু উচ্চ অঞ্চলের মাটি উর্বরা-শক্তি বিহীন। ঢালু অঞ্চলের মাটিগুলি কিছুটা বেলে ধরণের। ভাল বর্ষার সময় উচ্চ অঞ্চলগুলিও মোটা-মুটি চাষ আবাদের উপযোগী হয়ে ওঠে। পার্বত্য প্রদেশ ও সমতল অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী মাটি গাঢ়তর ও গভীরতর এবং পাহাড় ধোয়া মাটি জমার ফলে পুষ্টি উপাদানে ক্রমশঃই সমৃদ্ধ হতে থাকে। কালোমাটিগুলি অত্যন্ত এঁটেল ও মিহি দানা বিশিষ্ট এবং গাঢ় রঙের। এগুলিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ-নেসিয়াম কার্বনেট। এদের জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী এবং ভিজে অবস্থায় এগুলি অত্যন্ত আঠালো। শুকিয়ে যাওয়ার পর খুব বেশী সংকোচনের ফলে এই মাটিতে বেশ গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়। এখানকার মাটিতে লোহার ভাগ খুব বেশী এবং প্রচুর পরিমাণে চূণ, ম্যাগনেসিয়া ও এ্যালুমিনা বিদ্যমান। পটাসের

পরিমাণে অবশ্য যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। ফসফরাস, নাইট্রোজেন এবং জৈবপদার্থের ভাগ এইসব মাটিতে অত্যন্ত কম। সাধারণত সকল রেগার অঞ্চলেই, বিশেষ করে লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত সিস্ট থেকে সৃষ্ট মাটিগুলিতে কাঁকর পিণ্ডের স্তর চোখে পড়ে। নিম্নতর গভীরতায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিশ্লিষ্ট হয়ে এই স্তরের সৃষ্টি হয়।

মহারাষ্ট্রে দাক্ষিণাত্য শিলাশ্রেণী-উদ্ভূত কালো মাটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে আছে। উচ্চ এবং ঢালু অঞ্চলগুলিতে মাটিগুলি অপেক্ষাকৃত ফিকে রঙের, অগভীর ও অনুর্বর। নীচুভূমি এবং উপত্যকাগুলিতে এই কালো মাটি গভীর ও কাদাটে ধরণের। ঘাট অঞ্চল বরাবর মাটিগুলি অত্যন্ত বেলে এবং পাথুরে। তাপ্তী, নর্মদা, গোদাবরী ও কৃষ্ণা উপত্যকার ভারী কালোমাটি প্রায়ই ছয় মিটার পর্য্যন্ত গভীর হতে দেখা যায়। নীচের স্তরের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে চূণ থাকে। দাক্ষিণাত্য ভূমির বাইরে সুরাট ও ব্রোচ জেলায় তুলাচাষের উপযোগী কালোমাটির আধিক্য দেখা যায়। এই মাটি গভীর এবং অগভীর দুরকমই হতে পারে। অগভীর অঞ্চলে 'প্রোফাইল' ৯০ থেকে ১২০ সেঃ মিঃ নীচে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং আংশিক ক্ষয়িত পদার্থ প্রায় ৪৫-৬০ সেঃ মিঃ নীচেও দেখা যেতে পারে। অগভীর মাটি অঞ্চলে প্রোফাইল ২.৭ মিটার কিংবা তারও বেশী গভীরতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই সব মাটি অত্যন্ত ভারী বা এঁটেল এবং বিক্রিয়ার দিক থেকে ক্ষারধর্মী। এগুলি চূণে সমৃদ্ধ এবং এই মাটিতে জলের প্রবেশ্যতা খুব কম, কিন্তু মাটির জলধারণ ক্ষমতা খুব বেশী। নাইট্রোজেনের পরিমাণ এইসব মাটিতে কম থাকলেও পটাস এবং ফসফরাস এগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

মধ্যপ্রদেশে সুনির্দ্দিষ্ট দুরকমের কালোমাটি দেখা যায়। (ক) নর্মদা উপত্যকার গভীর ও ভারী কালো মাটি এবং (খ) নিমার, ওয়ার্ধা, নাগপুরের পশ্চিমাঞ্চল, সওগর ও জব্বলপুর জেলাগুলির অগভীর কালো মাটি। তুলাচাষের জমির মাটি প্রধানত গভীর ও ভারী বা

এঁটেল প্রকৃতির। কিন্তু ভৌত বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখা গেছে যে এ অঞ্চলের মাটি হালকা প্রকৃতিরও হতে পারে।

মহীশূরের কালো মাটি বেশ ভারী এবং প্রচুর পরিমাণে লবণ-যুক্ত। এই সব মাটি সাধারণত চুণ ও ম্যাগনেসিয়ার পরিমাণে সমৃদ্ধ।

উত্তর প্রদেশের নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমিতে এক শ্রেণীর কালো এঁটেল মাটি দেখা যায়। এগুলির চলতি নাম কারাইল। এগুলির এবং দক্ষিণ-ভারতের তুলাচাষের কালো মাটির মূল উপকরণ একই রকম। বুন্দেলখণ্ডের আগ্নেয় শিলায় উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির দ্বারা আনীত ব্যাসাল্ট জাতীয় পলল গঙ্গার প্রবাহে বাহিত হয়ে তার গতিপথে সুবিধামত স্থানে সঞ্চিত হয়ে এইরূপ পলল মাটি সৃষ্টি করেছে।

সেচ কার্য্যের জন্য কালো মাটির জমি বেশ ভালরকম তৈরী হওয়া দরকার। এই মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ থাকার জন্য অনিয়ন্ত্রিত সেচ ক্রিয়ার ফলে মাটির লোনা কিংবা ক্ষারকীয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। কালো মাটিতে মণ্টমরিলোনাইট খনিজ থাকে। মাটির আর্দ্রতা রক্ষা এবং আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় বহির্দেশে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ক্ষারক পদার্থগুলিকে ধরে রাখার ক্ষমতা এটির অত্যন্ত বেশী। অগভীর ও মাঝারি প্রকৃতির কালো মাটিতে কণ্টুর বাঁধের সাহায্যে ভূমির আর্দ্রতা রক্ষণ জোয়ার ইত্যাদি রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩। লাল মাটি

রোদ, বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদির প্রভাবে প্রাচীন কেলাসিত ও রূপান্তরিত শিলার ক্ষয় ক্রিয়ায় এই লাল মাটির সৃষ্টি হয়েছে। এ মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও হিউমাসের পরিমাণ অত্যন্ত কম। রেগারের তুলনায় চূণ, পটাস ও আয়রন অক্সাইডের পরিমাণ এই মাটিতে কম থাকে এবং ফসফরাসের ঘাটতিও সর্বত্র সমানভাবে সুস্পষ্ট।

মাদ্রাজ, মহীশুর, দক্ষিণ-পূর্ব মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুরের মোট ৩৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ ভূমি এই লাল মাটিতে গঠিত। উত্তরাঞ্চলে এই মাটি বিহারের সাঁওতাল পরগণায়, পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় এবং উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর, ঝাঁসী ও হামীরপুর জেলায় ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

মাদ্রাজে লালমাটি সব থেকে বেশী এবং কর্ষিত ভূমির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে। মাটিগুলি সাধারণত অগভীর, আলগা এবং প্রশমধর্মী। এদের ক্ষারকের পরিমাণ এবং আয়ন বিনিময় ক্ষমতা কম। তাছাড়া জৈবপদার্থ ও উদ্ভিদের উপযোগী পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিও এ মাটিতে স্পষ্ট।

মহীশুর প্রদেশের বাঙ্গালোর, কোলার, মহীশূর, টুমকার এবং মন্দ্যা জেলাগুলিতে লাল মাটির প্রাধান্য চোখে পড়ে। দু এক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার গভীরতা পর্য্যন্ত এদের বিস্তৃতি দেখা যায়। শিমোগা, হাসান ও কাডুর এই তিনটি বাগিচাপূর্ণ জেলায় দোঁ-আস প্রকৃতির লাল মাটির প্রাধান্য। মোট এবং প্রাপ্তব্য পটাসের পরিমাণে এ অঞ্চলের মাটি পুষ্ট এবং মোট ফরফরাসের পরিমাণও যথেষ্ট, কিন্তু নাইট্রোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

কুর্গের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রদেশের মধ্যবর্তী সুবিস্তৃত অঞ্চলের মাটি লাল দোঁ-আস এবং সহজেই জল নিষ্কাশন যোগ্য। এখানে বেশ ঘন গাছপালার বিস্তার চোখে পড়ে।

বিহারে রাঁচী, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগণা, পালামৌ এবং ধানবাদ জেলার মাটি লাল এবং অম্লধর্মী। এইসব মাটিতে প্রাপ্তব্য পটাসের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত, কিন্তু ফসফরাস যথেষ্ট নয়।

পশ্চিমবঙ্গে লাল মাটিগুলিকে মাঝে মাঝে ল্যাটারাইট বলে ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড় থেকে বাহিত মাটি।

উত্তরপ্রদেশে ঝাঁসী, বারাণসী এবং মির্জাপুর জেলার কিয়দংশে

লাল মাটি বর্তমান। ঝাঁসীর লাল মাটি দুরকমের। এদের স্থানীয় নাম হল "পারোয়া" এবং "রাকার"। অনেকটা বাদামী ধূসর রঙের পারোয়া মাটি আদর্শ দোঁ-আস থেকে বেলে বা এঁটেল দোঁ-আস ইত্যাদি নানা রকমের হয়। রাকার হল প্রকৃত লাল মাটি। এ মাটি সাধারণত চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত।

অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা বিভাগের লাল মাটির চলতি নাম "চল্‌কাস" এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে দেখা যায়। খরিফ শস্য চাষের জন্য এ মাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশের আর এক ধরনের লাল মাটির স্থানীয় নাম "দুব্বা মাটি"। এগুলি দোঁ-আস বেলে থেকে অত্যন্ত মোটা বেলে দোঁ-আস প্রকৃতির এবং মাঝে মাঝে লালচে বাদামী ছিটযুক্ত হালকা বাদামী কিংবা বাদামী রঙের। এ ম টি প্রশম ধর্মী এবং এতে দ্রাব্য লবণের পরিমাণ কম। জৈবপদার্থ প্রায় নেই বললেই চলে। এগুলি জলপ্রবাহের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষয়িত এবং কখনও কখনও নানা আকারের নুড়ি বা পাথরের টুকরো দিয়ে ঢাকা থাকতে দেখা যায়। এইরূপ মাটি তৃণাঞ্চল এবং গবাদি পশুর আহার্য্য শস্যের পক্ষেই বেশী উপযোগী। কিন্তু নাগার্জুনসাগর প্রকল্পের ফলে সেচের সুবিধা পাওয়ার জন্য কতকগুলি সর্তসাপেক্ষে ধান ৮.যের পক্ষেও এগুলিকে উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে।

লাল মাটিগুলিতে কেওলিনাইট খনি.জর প্রাধান্য বেশী। জলকণা শোষণের এবং আয়ন বিনিময় ক্রিয়ায় পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ক্ষারক ধারণের ক্ষমতা এদের অত্যন্ত কম। লাল মাটিতে ফসফেট অতি সহজেই আবদ্ধ হয়ে যায়; মাটির অম্লত্ব বাড়ার সাথে সাথে এই ক্রিয়া বাড়তে থাকে। সাধারণত এই মাটিতে নাইট্রোজেন প্রয়োগে সব থেকে বেশী সুফল পাওয়া যায়। তারপরই ফসফেট ও পটাসের স্থান। নীচু ভূমিগুলি ছাড়া বেশীর ভাগ লাল মাটিই হালকা প্রকৃতির। চাষের সমস্যা এখানে খুব একটা মারাত্মক নয়। অবশ্য মাটির আশ্লেষণ এতে যথেষ্ট নয়।

৪। ল্যাটারাইট ও ল্যাটারাইট জাতীয় মাটি

ল্যাটারাইট বা ল্যাটারাইট জাতীয় মাটির সৃষ্টি সবিরাম আর্দ্র জলবায়ু যুক্ত ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য নিরক্ষীয় দেশগুলির বিশেষত্ব। এগুলি মূলতঃ অল্প পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, টাইটেনিয়া ইত্যাদি ঘটিত এ্যালুমিনিয়াম ও লৌহের সোদক অক্সাইডের মিশ্রিত উপাদানে গঠিত সুসংবদ্ধ কিংবা ক্ষুদ্র কোষবিশিষ্ট শিলা। ভারতবর্ষের প্রায় ২৪৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি এই মাটির পর্য্যায়ে পড়ে।

ল্যাটারাইটগুলি আবার ভেঙ্গে গিয়ে জলধারার প্রভাবে নীচুভূমিতে বাহিত হতে পারে এবং সেখানে জমাট বেঁধে নূতন ল্যাটারাইট স্তর গঠন করতে পারে। কাজেই পাহাড়ের উঁচু অঞ্চলের ল্যাটারাইট-গুলির বিশ্লিষ্ট ও পরিবাহিত পদার্থগুলি থেকেই নীচু অঞ্চলের পুনঃশিলীভূত ল্যাটারাইটের উৎপত্তি।

দাক্ষিণাত্য, মহীশূর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার পূর্বঘাট অঞ্চল, মহারাষ্ট্র, মালাবার ও আসামের অংশ বিশেষে পাহাড়ের শিখরগুলিতে ল্যাটারাইট মাটি বিশেষভাবে গঠিত হয়ে উঠেছে। সব ল্যাটারাইট মাটিতেই চুণ ও ম্যাগনেসিয়ার পরিমাণ থাকে অত্যন্ত কম। নাইট্রোজেনের ঘাটতিও এ মাটির একটি বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফসফেটের প্রাচুর্য্য দেখা গেলেও (সম্ভবতঃ লৌহের লবণ হিসেবে) পটাসের ভাগ প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। কদাচিৎ এই মাটিতে হিউমাসের আধিক্য দেখা যায়।

মাদ্রাজে নানারকমের শিলাজ পদার্থ থেকে উদ্ভূত উঁচু এবং নীচু উভয় প্রকার ল্যাটারাইট ভূমিই বর্ত্তমান। নীচু অঞ্চলের ল্যাটা-রাইট ভূমিতে ধান এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিগুলিতে চা, সিঙ্কোনা, রবার ও কফির চাষ হয়। উদ্ভিদের উপযোগী পুষ্টি উপাদানে মাটিগুলি সমৃদ্ধ। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির অম্লত্ব বাড়তে দেখা যায়।

মহারাষ্ট্রে কেবলমাত্র রত্নগিরি ও কানাড়া অঞ্চলে ল্যাটারাইট দেখা যায়। কানাড়ার মাটি মোটা দানার এবং চুণ ও ফসফেটের

৫নং চিত্র : মধ্য কেরালার একটি পাহাড়ের প্রোফাইল
(ল্যাটারাইটের গঠন দেখান হয়েছে)
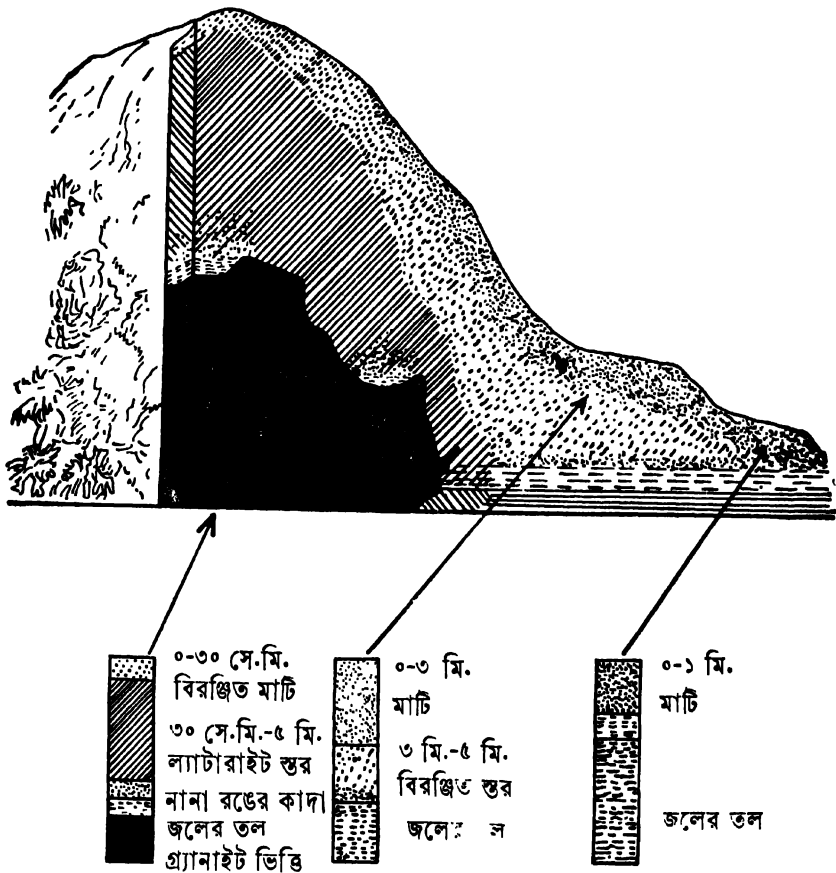
অভাব বিশিষ্ট, জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন ও পটাস অবশ্য এ মাটিতে বেশ ভালরকমই থাকে। রত্নগিরির মাটিতে মোটাদানার

উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে আছে। কেরালায় উঁচু এবং নীচু দুরকমের ল্যাটারাইট দেখা যায়। উঁচু ভূমির ল্যাটারাইট অঞ্চল বাগিচা ফসলের উপযোগী এবং ভালরকম পরিচর্য্যার ব্যবস্থা থাকার জন্য মাটিগুলি বেশ সমৃদ্ধ। অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় অবস্থিত ল্যাটারাইটের পুষ্টিমান যথেষ্ট কম। পশ্চিম উপকূলের এইরূপ অঞ্চলে প্রধানতঃ চা, রবার, সিঙ্কোনা, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি বাগিচা ফসলের চাষ হলেও নীচু ভূমিগুলিতে ধানের চাষও করা হয়। এইসব মাটিতে জৈব পদার্থসহ উদ্ভিদের অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলি সাধারণত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে থাকে। মহীশুরে ল্যাটারাইট মাটি দেখা যায় শিমাগো, হাসান, কাদুর ও মহীশুর জেলাগুলির পশ্চিমাংশে। উৎপত্তি ও প্রকৃতি অনুসারে এখানকার মাটি মাদ্রাজের মালাবার, নীলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলগুলির সদৃশ। অতিরিক্ত জল সঞ্চলন ও ক্ষয়ক্রিয়ার জন্য এই মাটিতে চূণ ইত্যাদি ক্ষারকের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ফসফেটের পরিমাণও এতে পর্য্যাপ্ত নয়।

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ব্যাসাল্ট ও গ্রানাইটের পার্বত্য ভূমি গুলির উপর আচ্ছাদনের মত ল্যাটারাইটের অবস্থান দেখা যায়। এই অঞ্চলের মাটিকে দুটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের মাটি। সমগ্র বাঁকুড়া জেলা ল্যাটারাইট জাতীয় মাটির অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই মাটিগুলিতে পটাস, ফসফরাস ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত নয়।

বিহারে ল্যাটারাইটগুলি প্রধানতঃ উচ্চতর অধিত্যকার উপর আচ্ছাদন হিসেবে থাকলেও কোনো কোনো উপত্যকা অঞ্চলেও এই মাটি দেখা যায় এবং এদের গভীরতাও যথেষ্ট। উড়িষ্যায় পাহাড় ও মালভূমির উপর ঢাকনার মত এবং মাঝে মাঝে বেশ পুরু ল্যাটা-রাইটের বিন্যাস চোখে পড়ে। খুরদা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূমি এই

ল্যাটারাইট দ্বারা অধিকৃত। বালাসোর জেলার ল্যাটারাইট পাথুরে প্রকৃতির এবং অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু। উড়িষ্যার ল্যাটারাইট দুরকমের : (১) ল্যাটারাইট মুরাম (murrum) ও (২) ল্যাটারাইট শিলা। এরা আলাদা জাতের হলেও এক সঙ্গেও এদের অবস্থান দেখা যায়।

ল্যাটারাইট মাটিতে প্রাপ্তব্য ফসফরাস, পটাস ও ক্যালসিয়াম—এই পুষ্টি উপাদানগুলির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম বেশী শতকরা ০·০৩ ভাগের মত থাকে। এদের pH ৪·৮ থেকে ৫·৫ এর মধ্যে এবং এগুলির ক্ষারক বিনিময় ক্ষমতা কম। কাজেই এই মাটি চূণ ও পটাসের প্রয়োগে খুব ভাল কাজ দেয়। বিভিন্ন মাটির প্রকৃতি অনুসারে চূণের প্রয়োজনের পরিমাণ স্থির করার পর এর ব্যবহার সুপারিশ করা উচিৎ। এইসব মাটিতে চাষীদের মাঠে ধানের উপর নানারকম পরীক্ষা করা হয়েছে। কেরালা, মহীশুর, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল, উড়িষ্যা এবং আসামে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস একসঙ্গে প্রয়োগ করে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। খড়গপুরে নাইট্রোজেন ব্যবহারে আলু উৎপাদনে সামান্য ভাল ফল দেখা গেলেও সামঞ্জস্য রেখে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসের একসঙ্গে প্রয়োগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গেছে। ফসফেটের ব্যবহারে সবুজ ছোলা ও ছোলার উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও নাইট্রোজেন ও পটাসের প্রয়োগে কিংবা তাদের একসঙ্গে প্রয়োগেও খুব একটা ভাল ফল দেখা যায় না। নীচু ভূমিতে পাতার পিঙ্গল-বর্ণ হওয়া বা শিকড়ের পচণ, চূর্ণ নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাসের প্রয়োগে সহজেই রোধ করা সম্ভব। নীচু ল্যাটারাইট মাটিতে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ অনেক সময় বিষক্রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফেরিক লৌহের ফেরাস অবস্থায় ও চতুর্যোজী ম্যাঙ্গানিজের দ্বিযোজী অবস্থায় রূপান্তরের ফলেই পাতা ও শিকড়ের এইরূপ রোগ জন্মে। চূণের প্রয়োগে মাটি এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হয় এবং উদ্ভিদ কর্তৃক নাইট্রোজেন ও ফসফেটের গ্রহণ স্বাভাবিক হতে থাকে। চূণের ব্যবহারের পরিমাণ ২৪৭০ কে, জি, / হেক্টর

থেকে ৩৭০০ কে, জি, / হেক্টর। বেশীরভাগ ল্যাটারাইট অঞ্চল-গুলিতেই বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৭৭.৮ সে. মি. থেকেও বেশী হয় এবং প্রতি বছরই ভূমির ভয়ানক ক্ষয় হযে থাকে'

(৫) অরণ্য অঞ্চলীয় মাটি

এদেশের প্রায় ২৮৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত অঞ্চলের অরণ্য মাটির উৎপত্তি ও গঠন নির্ভর করে প্রধানতঃ অরণ্যজাত বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ জৈব পদার্থের জমা হওয়ার উপর। কাজেই পার্বত্য বা সমভূমি অঞ্চলের মাটির জলবায়ুর বিভিন্নতা হেতু এইরূপ মাটির শ্রেণীবিভাগে নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

মোটামুটি দুরকম অবস্থায এই মাটির সৃষ্টি হতে পারে। (১) অল্প হিউমাস ও কম ক্ষারকের উপস্থিতিতে আম্লিক অবস্থায় সৃষ্ট মাটি এবং (২) অধিক ক্ষারকযুক্ত ও সামান্য আম্লিক বা প্রশম অবস্থায় সৃষ্ট মাটি। দ্বিতীয় প্রকার পরিবেশে সাধারণত বাদামী রঙের মাটি (brown earth) গড়ে ওঠে।

মালাবার অরণ্যাঞ্চলে দেখা গেছে যে গাছগুলি কেটে ফেলার পর নীচেকার মাটি ল্যাটারাইটে রূপান্তরিত হয়।

আসামের পার্বত্য জেলাগুলিতে জৈবপদার্থ ও নাইট্রোজেনের আধিক্য দেখা যায়। পার্বত্য মাটির অকৃষ্ট অবস্থাই মনে হয় এর জন্য দায়ী।

উত্তর প্রদেশে হিমালয় সংলগ্ন অরণ্য অঞ্চলকে তিনটি সুনির্দিষ্ট অংশে ভাগ করা যায়; যেমন—পাহাড়ের ঠিক নীচেই ভাবার (bhabar), তরাই (terai) এবং সমতল ভূমি। তরাই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হল এখানকার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু। মাটির অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং গাছপালার অত্যধিক বৃদ্ধিই এর কারণ।

হিমাচল প্রদেশের মাটির বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে এই অঞ্চলের ভূতত্ত্ব, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও হিমালয় শৈলমালার বিস্তারের উপর। উচ্চতা অনুসারে মোটামুটি পাঁচরকম আঞ্চলিক শ্রেণীতে এগুলিকে

ফেলা যায়ঃ (ক) নিম্ন পর্বতাঞ্চলীয় মাটি (০-৯১০ মি. সমুদ্র পৃষ্ঠের উপর), (খ) মধ্য পর্বতাঞ্চলীয় মাটি (৯১০-১৫১৭ মি.), (গ) উচ্চ পর্বতাঞ্চলীয় মাটি (১৫১৭-২১২৩ মি.) (ঘ) পার্বত্য মাটি অঞ্চল (২১২২-৩০৩৪ মি.) ও (ঙ) শুষ্ক পার্বত্য মাটি অঞ্চল।

কুর্গ প্রদেশের পার্বত্য মাটি গভীর এবং উচ্চ উর্বরাশক্তি সম্পন্ন। পশ্চিম অঞ্চলগুলি বেশীর ভাগই সংরক্ষিত বনভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল। এখানকার ভূমির উপরিভাগ নুড়ি আবৃত এবং সহজেই জল নিষ্কাশণের উপযুক্ত। এগুলির নীচে রয়েছে ল্যাটারাইটের ভিত্তিস্তর।

দার্জিলিং জেলার মাটি নীচে উত্তমরূপে বিযোজিত হিউমাস এবং উপরে খনিজ মাটির স্তর দ্বারা গঠিত। উপরের স্তরটির রং ক্রমশ হালকা হতে হতে বিভিন্ন গভীরতায় ভিত্তিশিলার সঙ্গে মিশে গেছে। বিক্রিয়ায় মাটিগুলি অত্যন্ত অম্লধর্মী।

(৬) মরুঅঞ্চলীয় মাটি

সিন্ধুনদ ও আরাবল্লীর মধ্যবর্ত্তী রাজস্থান ও দক্ষিণ পাঞ্জাবের (বার্ষিক বৃষ্টিপাত ০-৬২˙৫ .স. মি.) শুষ্ক এবং শুষ্কপ্রায় অঞ্চলের প্রায় ১৪২,০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত ভূমি মরুঅঞ্চলীয় প্রভাবে কবলিত। ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এগুলি সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি। এখানকার ভূমি উড়ে আসা আলগা বালির আবরণে ঢাকা থাকার জন্য মাটির বৃদ্ধি বাধা পায়। রাজস্থান মরুভূমির বালি আংশিকভাবে নীচেকার শিলাস্তরের বিচূর্ণণ থেকে সৃষ্ট হলেও বেশীর ভাগই হল সমুদ্রতীর এবং সিন্ধু উপত্যকা থেকে উড়ে আসা। কোনও কোনও স্থানে এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে দ্রাব্য লবণ আছে। বিক্রিয়ায় এরা ক্ষারধর্মী এবং জৈবপদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত কম। উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা পাওয়া গেলে এইরূপ মাটিকে সংশোধন করা সম্ভব।

(৭) লোনা ও ক্ষার মাটি

বিস্তীর্ণ পললভূমির বহুস্থানে ভূনিম্নস্থ নিষ্কাশন প্রণালীর অভাবে

মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে ওঠে। গ্রীষ্মের সময় কৈশিক প্রক্রিয়ায় এগুলি মাটির উপরে উঠে আসে এবং সাদা উদত্যাগী আস্তরের সৃষ্টি করে।

পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, উত্তর প্রদেশের ১·২৫ মিলিয়ন হেক্টার এবং পাঞ্জাবের ১·২১ মিলিয়ন হেক্টার ভূমি এই "উষর" দ্বারা আক্রান্ত। এইরূপ মাটি সংশোধনের উপায় হিসেবে সেচ ব্যবস্থা, চূণ বা জিপসামের প্রয়োগ এবং লবণ প্রতিরোধী ফসল যেমন ধান, বারসীম ও আখের চাষের সুপারিশ করা হয়ে থাকে। খুব বেশী মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষারকীয় জমির ক্ষেত্রে গন্ধক বা জিপসামের প্রয়োগের পর প্রচুর জল সেচন করে দেখা গেছে যে, ধীরে ধীরে মাটির উন্নয়ন এবং ভাল ফসল ফলানো সম্ভব। হারদোয়া, লক্ষ্ণৌ ও কানপুর জেলায় মাটির আভ্যন্তরীন নিষ্কাশন অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এখানকার মাটি ক্ষারকীয় এবং এখানে জিপসাম একেবারেই থাকে না বললেই চলে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অধিক শুষ্ক প্রদেশগুলির তুলনায় এই মাটি কার্বনেট-ক্লোরাইড প্রকৃতির লোনা ক্ষার যুক্ত।

পাঞ্জাবের সমভূমির 'কালার' (kallar) মাটির সংশোধনও একটি বড় সমস্যা। এখানে লবণের উর্দ্ধসরণ অপেক্ষা অধোসরণ অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে জমির উপরিভাগে বা এর ঠিক নীচেই লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই লোণামাটিগুলি ক্রমে ক্ষার মাটিতে পরিণত হয়ে আরও অপকৃষ্ট জমিতে রূপান্তরিত হয়। সোডিয়াম লবণগুলি জটিল ক্লের মধ্যে প্রবেশ করে সোডিয়াম ক্লের সৃষ্টি এবং ক্যালসিয়ামের অপসরণ ঘটায়। এইরূপ মাটি সংশোধনের একমাত্র উপায় ক্যালসিয়াম লবণের প্রয়োগ অথবা মাটির পূর্বসঞ্চিত ক্যালসিয়ামের সু-ব্যবহার। সাম্প্রতিক নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে কালার মাটি একাধারে লোণা ও ক্ষারযুক্ত। যে সব ভূমি জলে ডুবে যায় অথচ জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা নেই, সেইরূপ স্থানে এই মাটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই মাটির স্তরবিন্যাসে সাধারণত শক্ত

ক্যালিচের (caliche) স্তর হিসেবে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উপস্থিতি দেখা যায় এবং এখানে জলের তল ছয় ফুটের মধ্যেই থাকে। কৃত্রিম সারের প্রয়োগ, ধইঞ্চার সবুজ সার ব্যবহার বা ধান ও বারসীমের পর্য্যায়ক্রমে চাষ পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা এইরূপ মাটির উন্নয়ন করা সম্ভব। অবশ্য জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থাও এক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সর্ত।

মহারাষ্ট্রের সর্বত্র ক্ষার মাটি দেখা যায়। গুজরাট ও কাম্বে উপসাগরের সন্নিহিত অঞ্চল সমুদ্রের জোয়ারে আক্রান্ত হয় এবং জোয়ার তাড়িত পলি এখানে জমা হতে থাকে। নর্মদা, তাপ্তী ও সবরমতীর অববাহিকার প্রায় ১৭৩,৫৩০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত ভূমি এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ দিয়ে এবং জলদ্বারা ধুয়ে দ্রাব্য লবণগুলিকে অপসারণ করে এই মাটিগুলিকে সংশোধন করা যায়।

ধারওয়ার ও বিজাপুরের কিয়দংশ কার্ল (karl) মাটির দ্বারা আবৃত। এগুলি লোনা—ক্ষারকীয়, যথেষ্ট গভীর এবং এঁটেল জাতীয়। নীরা উপত্যকার লোণা ভূমিগুলি স্থানীয় গভীর কালো মাটিতে অত্যাধিক সেচ ক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠেছে।

দিল্লীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মাটিগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) লোণা মাটি (বেশীর ভাগই সাম্প্রতিক পলল), (খ) লোণা—ক্ষার মাটি (প্রাচীন পলল এবং নিম্নঅঞ্চলগুলিতে) ও (গ) লোণা-ক্ষার কাঁকুরে মাটি (বেশীর ভাগই প্রাচীন পলল ও নিম্নঞ্চল গুলিতে)।

(৮) পিট বা বোদ মাটি

আদর্শ পিট জাতীয় লোণা মাটি (কাড়ি-kari) কেরালার কুট্টানাদে প্রায় ১৫০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি জুড়ে আছে। বর্ষার সময় এগুলি সাধারণত জলে ডুবে থাকে। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ধান চাষ শুরু হয়। এই মাটি কালো, এঁটেল, অত্যন্ত আম্লিক এবং জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ। কাড়ি অঞ্চলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে দ্রাব্য ক্ষার লবণ জমা হয়ে থাকে।

পাললিক এবং উপকূল ভূমির শুষ্ক নদীখাতের ও হ্রদের নিম্নাঞ্চল-গুলিতে মাঝে মাঝে অদ্ভুদ রকমের জলবদ্ধ ও বায়ুহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফেরাস লৌহের উপস্থিতির জন্য এখানকার মাটি সাধারণত নীল রঙের। স্থান ভেদে এই মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এ ধরনের জলাভূমি উড়িষ্যার উপকূল বরাবর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও অন্যান্য অঞ্চলে, উত্তর বিহারের কেন্দ্র অঞ্চল।

উত্তর প্রদেশের আলমোরা জেলায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব মাদ্রাজে দেখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

মাটির উর্বরাশক্তি ও পরিচালন সংক্রান্ত ভৌত ধর্মাবলী

মাটির ব্যবহারিক প্রয়োগ বহুলাংশে নির্ভর করে তার ভৌতধর্ম-সমূহের উপর যথা—মাটির কণাগুলির আকার, আকৃতি ও বিন্যাস, ছিদ্রগুলির আয়তন ও প্রকৃতি এবং মাটির যে কার্য্যকরী গভীরতা থেকে উদ্ভিদেরা তাদের পুষ্টিমৌল সংগ্রহ করে সেই গভীরতা ও মাটির মণিক সংযুক্তি। মাটিতে জলের প্রবাহ ও সঞ্চয়, বায়ু সঞ্চালন এবং উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রদানের যোগ্যতা নির্ভর করে মাটির ভৌত-ধর্মগুলির উপর এবং এই ভৌত-ধর্মগুলিতে মাটির ছোট ও বড় কণাগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বড় আকারের কণা-গুলি হল পাথর, কাঁকর ও বালি এবং ছোট কণা বলতে বুঝায় পলি (silt) ও কাদা (clay)। কাদা খনিজগুলি পাতের মত আকৃতি-বিশিষ্ট দ্বিতীয় গঠনভুক্ত সোদক এ্যালুমিনোসিলিকেট। পাথর কুচি, কাঁকর, বালি, কাদা ইত্যাদি কণাগুলি সম্মিলিতভাবে মাটির মোট আয়তনের প্রায় অর্দ্ধাংশ দখল করে থাকে। কণাগুলির মধ্যে যে শূন্যস্থান পড়ে থাকে তাকে বলে রন্ধ্রপরিসর এবং এগুলি জলকণা ও বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে। মাটির আদর্শ ভৌত অবস্থার জন্য এবং উদ্ভিদের মূলে বায়ুসঞ্চালন ও মাটির জলধারণ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে গাছের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে কৈশিক (সূক্ষ্ম) ও অকৈশিক (বড়) রন্ধ্র গুলির সুষম বণ্টন থাকা দরকার। এই দুরকম রন্ধ্রের মধ্যে একটি যদি অন্যটি অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী থাকে, তবে খরা বা বর্ষা উভয় সময়েই মাটিতে জল বা বায়ু চলাচলের অসুবিধা ঘটে। যদি মাটিতে পিণ্ডীভূত বড়দানার আধিক্য থাকে, যেমন পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে সাধারণত দেখা যায় সেখানে মাটিকে পরিপাটিরূপে বিছানো প্রয়োজন। বিভিন্ন আকারের দানাগুলির পরিমাণ এমন থাকা উচিৎ যাতে বড় কণাগুলির সমন্বয়ে সৃষ্ট রন্ধ্রগুলি সূক্ষ্মতর কণাগুলির দ্বারা পরিপূরিত হয়।

মাটির ক্রিয়াশীলতা নির্ভর করে, তার আপেক্ষিক তল বা একক ভরের মাটির মোট পৃষ্ঠতলের উপর। কণাগুলির আকার ছোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশীলতাও বৃদ্ধি পায়।

৬ নং চিত্র

একটি আদর্শ প্রোফাইল
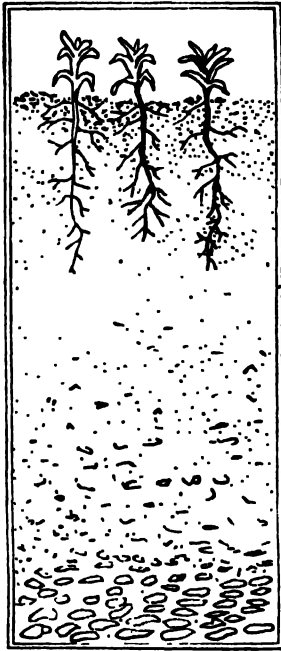
মাটির সূক্ষ্মতম আকারের কণাগুলি হল কাদা এবং সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল। প্রচুর পরিমাণে বালি ও কাঁকর ঘটিত বেলে বা কাঁকুরে মাটি সবচেয়ে কম ক্রিয়াশীল এবং ফলে এরা খুব বেশী জল বা পুষ্টি উপাদান ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু, কণাগুলির মধ্যে বড় বড় ছিদ্র থাকার জন্য জল নিষ্কাশন ও বায়ুসঞ্চালন খুব সহজ হয়।

পলিকণাগুলির আপেক্ষিক তল পাথরকুচি, কাঁকর ও বালির আপেক্ষিক তল অপেক্ষা বেশী হওয়ায় এগুলিও অনেক বেশী ক্রিয়াশীল। মাটির পরিচর্য্যার ব্যাপারে যে সমস্ত ভৌত গুণগুলি

৭নং চিত্র

সাধারণ দোঁয়াশ মাটিতে বায়ু, জল ও জৈব পদার্থের অনুপাত।
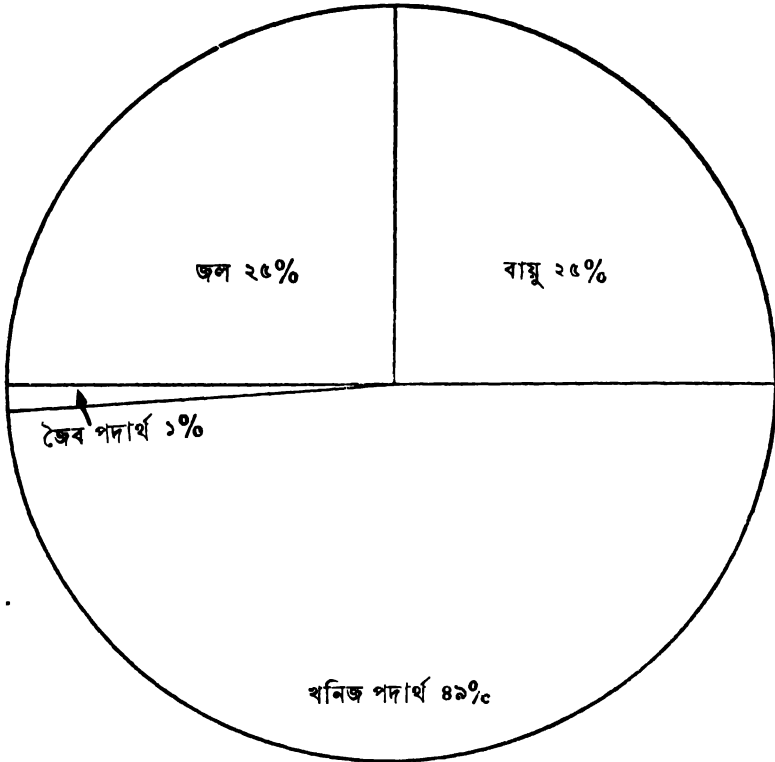
আমরা বিচার করি সেগুলি হল: গ্রথন, রং কার্য্যকরী গভীরতা, গঠন বা বিন্যাস, প্রবেশ্যতা, জলধারণ ক্ষমতা, পৃষ্ঠ নিষ্কাশন যোগ্যতা, ঢাল এবং ক্ষয়।

৮ নং চিত্র

মাটির তিনপ্রকার কণার আপেক্ষিক আকার। ৬০ গুণ বিবর্দ্ধিত করা সত্ত্বেও কাদার কণাটি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।
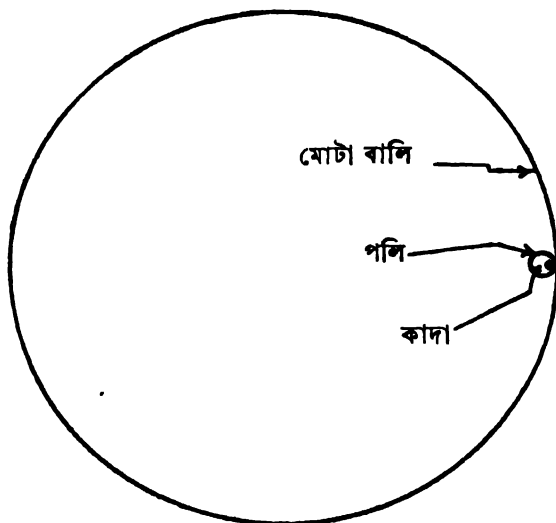
৯ নং চিত্র

সাধারণ আকরিক মাটির যান্ত্রিক বিশ্লেষণের লেখচিত্রে প্রকাশ।
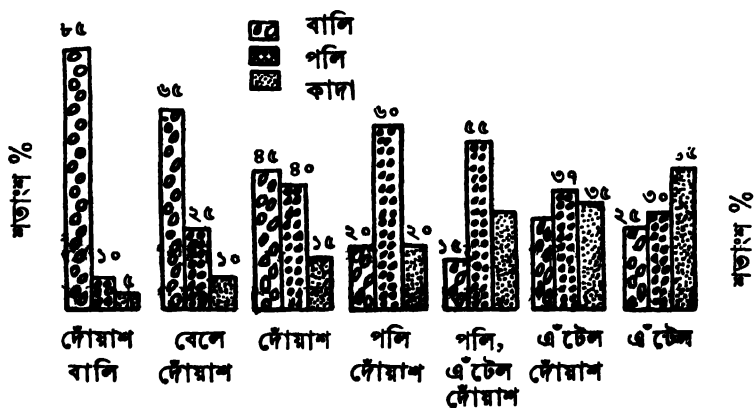
১। মাটির গ্রথন (Texture)

মাটির গ্রথন মাটিতে বালি, পলি (silt) ও কাদা-কণাগুলির আপেক্ষিক অনুপাতকে নির্দ্দেশ করে। প্রচুর পরিমাণে বালি থাকলে মাটি মোটা ও বালুকাময় হয়। এরূপ মাটি হাল্‌কা এবং এগুলিকে বেলে বা বেলে-দোঁয়াশ বলে। প্রচুর পরিমাণে পলি থাকলে মাটিকে ময়দার মত মিহি মনে হয়। এই মাটিগুলি মাঝারি গ্রথণভুক্ত এবং এগুলিকে পলি-দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ বলা হয়। কিন্তু কাদার ভাগ বেশী থাকলে মাটি ভিজে অবস্থায় আঠালো এবং শুকালে শক্ত হয়ে যায়। এরূপ ভারী মাটিকে এঁটেল বা এঁটেল দোঁয়াশ বলে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা ও উদ্ভিদমূলে বায়ুসঞ্চালন ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের কৃষিকার্য্যে মাঝারি গ্রথন বিশিষ্ট মাটিই সর্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী।

২। রং

কোনো জমির উপরের মাটির রং সেখানকার জল নিষ্কাশন অবস্থার নির্দ্দেশক। খুব ভাল বা মোটামুটি ভালভাবে জল নিষ্কাশিত হয়, এরূপ মাটির রং সাধারণত ভিজে অবস্থায় সমানভাবে বাদামী রঙের হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাল বা হলদে ছোপ থাকতেও দেখা যায়। মাটি বিবর্ণ বা ধূসর রঙের হলে বুঝতে হবে বহুদিন ধরে জমির জল নিষ্কাশন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। উপরকার মাটির রং কালো হলে বুঝতে হবে হয় মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী না হয বহুদিন ধরে মাটি ভিজে অবস্থায় আছে। নীচের মাটির বহুচিত্রিত মরচে ধরা রং জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থার লক্ষণ। এই রং ও বিচিত্রিত অংশগুলি মাটির ভিজে অবস্থায় অতি সহজেই চোখে পড়ে।

৩। মাটির কার্যকরী গভীরতা

মাটিতে গাছের শিকড় যতদূর পর্য্যন্ত নীচে যেতে পারে সেটাই হল মাটির কার্য্যকরী গভীরতা। মাটির অন্যান্য অবস্থা অনুযায়ী

বেশীর ভাগ শস্যের শিকড়ই ৯০ সে, মি, বা তারও বেশী গভীরে পর্যন্ত যায়। মাটি বেশ গভীর হলে গাছের শিকড় অনেকটা আয়তন জুড়ে থাকে বলে অনাবৃষ্টির সময় এইরূপ মাটিতে গাছপালা অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তাছাড়া এরূপ ক্ষেত্রে গাছ নীচের মাটিতে সঞ্চিত খনিজ উপাদানগুলিও গ্রহণ করতে পারে।

গভীরতার শ্রেণীবিভাগ

গভীর	৯০ সে, মি বা তার বেশী
মাঝারি গভীর	৫০-৯০ সে, মি,
অগভীর	২৫-৫০ সে, মি,
অত্যন্ত অগভীর	২৫ সে, মি, থেকে কম

৪। গঠন বা বিন্যাস

মাটির গঠন বা বিন্যাস বলতে বুঝায় আলাদা আলাদা কণাগুলি কিভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এক একটি পিণ্ডের সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য পিণ্ডের থেকে কি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। মাটির এই গঠন প্রধাণত চার প্রকারের : দানাদার বা গোলাকৃতি, বাক্স আকৃতি, পাতের আকৃতি, এবং এক দানা বিশিষ্ট। সাধারণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে এবং মাটির ঢেলাগুলির ভাঙ্গার প্রকৃতি দেখে মাটিকে গঠন অনুযায়ী শ্রেণীগত করা যায়। মাটির প্রবেশ্যতার উপর এই গঠন বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। মাটির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা তার গঠন এবং পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ, এই দুই-এর উপরেই সমানভাবে নির্ভরশীল। জৈব পদার্থ প্রয়োগ করে উপরের মাটির গঠন সংস্কার করা যায়, কিন্তু নীচের মাটির গঠনের সংস্কার সাধন খুবই শক্ত ; অথচ মাটির উৎপাদন ক্ষমতা, প্রবেশ্যতা এবং শিকড়ের বৃদ্ধি সরাসরিভাবে মাটির গঠনের সঙ্গে জড়িত।

৫। প্রবেশ্যতা

প্রবেশ্যতা বলতে বোঝায় মাটির ভিতর জল এবং বায়ুর চলাচল

১০নং চিত্র

অনুস্রবনের (Percolation) উপর জৈব পদার্থের প্রভাব
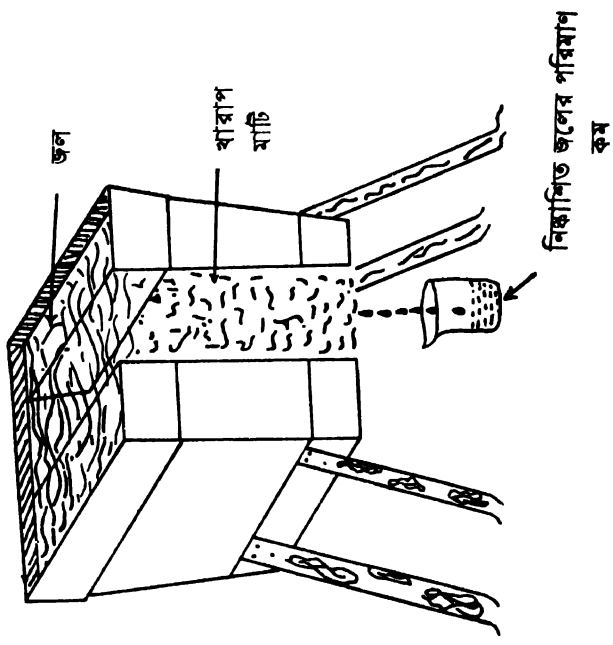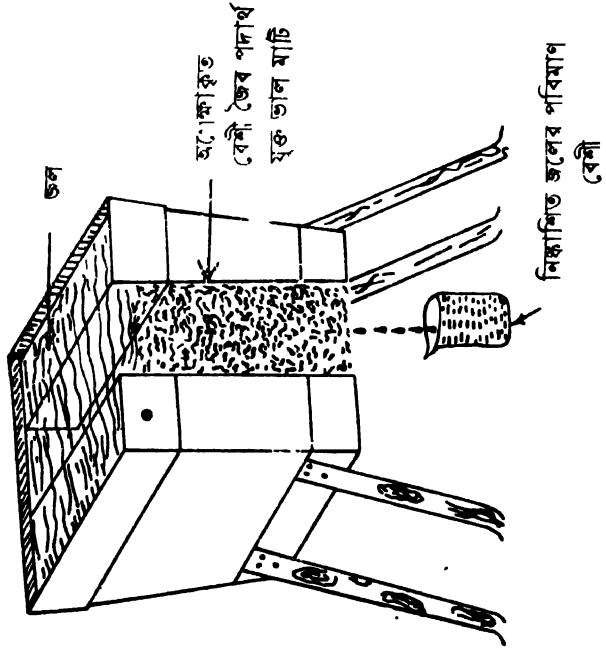
কতটা অনায়াসসাধ্য। জল অন্তরীকরণের হার, জলধারণ ক্ষমতা, শিকড়ের অবনমন এবং আভ্যন্তরীণ জল নিষ্কাশন এসবই প্রবেশ্যতার সঙ্গে জড়িত। যে সব মাটির নীচের স্তর বালুকাময় বা কাঁকরযুক্ত সেগুলির প্রবেশ্যতা খুব বেশী। নীচের মাটিতে বালি ও পলি দুটোই মোটামুটি ভাল পরিমাণে থাকলে প্রবেশ্যতা মাঝামাঝি রকমের, কিন্তু পলি ও কাদার পরিমাণ খুব বেশী থাকলে প্রবেশ্যতা অত্যন্ত মন্থর হয়। শোষোক্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় ঐ স্তরের নীচে শক্ত মাটির স্তর (hard pan) বা জমাট ভিত্তি শিলার অবস্থান থাকে।

১১নং চিত্র

মাটির তুলনামূলক জল ধারণ ক্ষমতা

৬। জলধারণ ক্ষমতা

এটির অর্থ হল মাটি উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী কতটা পরিমাণ জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে। সাধারণত এক কিলোগ্রাম শুষ্ক উপাদান তৈরী করার জন্য উদ্ভিদের ২৫০ থেকে ৬০০ কিলোগ্রাম জলের প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত দ্রুত বৃদ্ধিশীল গাছের প্রয়োজন মত যথেষ্ট জল যোগাতে পারে না বলে শস্যের

১২ নং চিত্র

গাছের বৃদ্ধির উপর জল নিষ্কাশনের প্রভাব
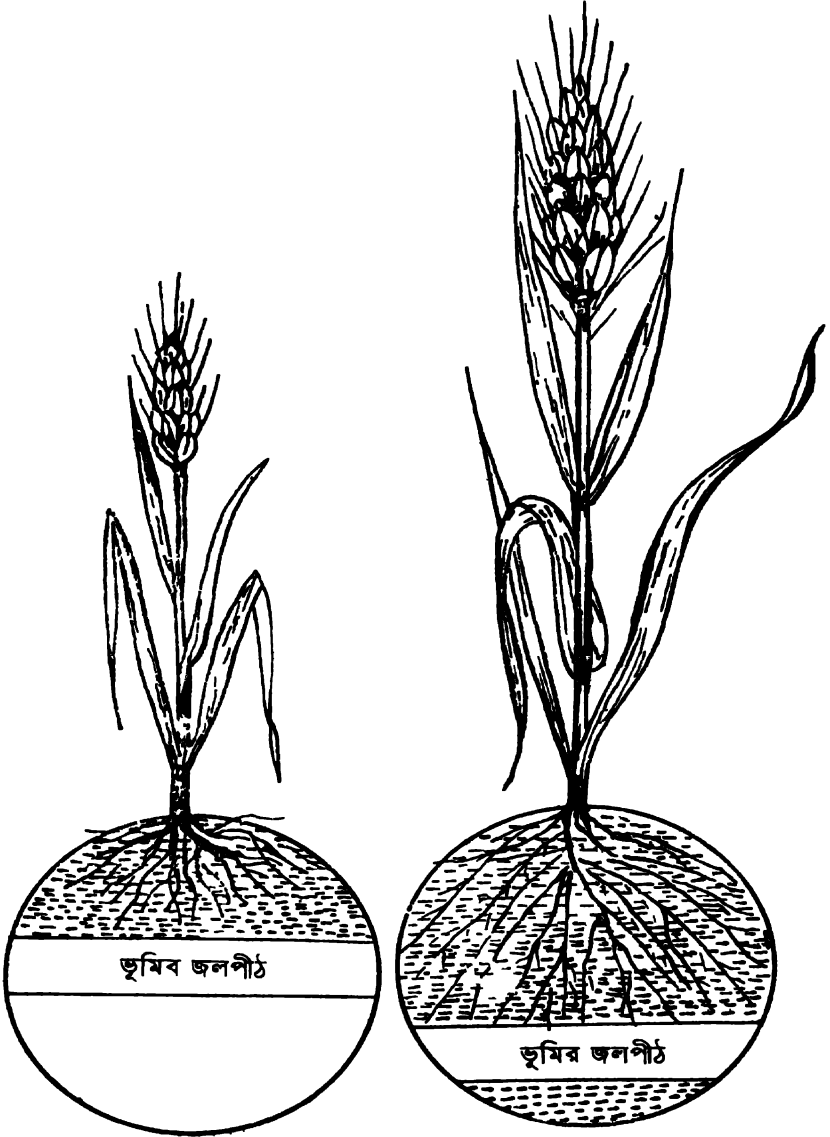
খারাপ নিষ্কাশন যুক্ত ভূমি **ভাল নিষ্কাশন যুক্ত ভূমি**

ভাল ফলন নির্ভর করে মাটির জল শোষণ ক্ষমতা এবং গাছের প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত ঐ জল ধরে রাখার ক্ষমতার উপর। সাধারণত মাটি যত মোটা বা বেলে হয় জল ধারণ ক্ষমতা তত কমে আসে। ভারতের কালো মাটির জল ধারণ ক্ষমতা লাল মাটির অপেক্ষা বেশী। তাই দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণ অংশের কালো মাটি অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে জল সংরক্ষণের জন্য শুষ্ক ঋতুতেও শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়।

৭। পৃষ্ঠনিষ্কাশন

মাটি যতটা সম্ভব জল শুষে নেওয়ার পর অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের আপেক্ষিক গতিকে বলে পৃষ্ঠনিষ্কাশন। যদি এমন মন্থর গতিতে জল নিষ্কাশিত হয় যে অনেকদিন ধরে মাটি ভিজা থাকে, তাহলে পৃষ্ঠনিষ্কাশন যোগ্যতা অত্যন্ত কম বলে ধরা হয়। আবার যদি জল এমনভাবে নিষ্কাশিত হয় যে উপরের অতিরিক্ত জল কদাচিৎ সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহলে একে বলা হয় মাঝামাঝি রকমের পৃষ্ঠনিষ্কাশন। পৃষ্ঠনিষ্কাশন ভাল হলে জল কখনোই সমস্যার সৃষ্টি করে না। অনেক সময় পৃষ্ঠনিষ্কাশনে অতিরিক্ত জল চলে যাওয়ায় মাটি শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে যায়।

১৩নং চিত্র

যেখানে প্রতি ১০০ ফুট আনুভূমিক দূরত্বে ৫ ফুট অবনমন ঘটে সেখানে ঢালকে ৫ শতাংশ ঢাল বলা হয়।
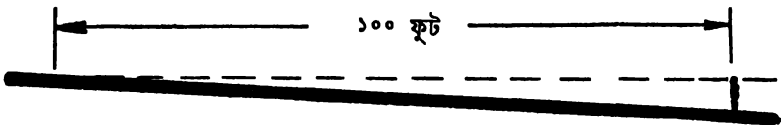
১০০ ফুট

৮। ঢাল

ঢালকে ডিগ্রীতে মাপা হয় এবং প্রয়োগের সুবিধার জন্য একে শতকরা ঢালে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেখানে প্রতি ১০০ ফুট

আনুভূমিক দূরত্বে ৫ ফুট অবনমন ঘটে সেখানে ঢালকে ৫ শতাংশ ঢাল বলা হয়।

প্রায় সমতল—প্রতি ১০০ ফুটে ১ ফুটের কম অবনমন।
অত্যন্ত ধীর ঢালু—প্রতি ১০০ ফুটে ১ থেকে ৩ ফুট অবনমন।
ধীর ঢালু—প্রতি ১০০ ফুটে ৩ থেকে ৫ ফুট অবনমন।
মোটামুটি ঢালু—প্রতি ১০০ ফুটে ৫ থেকে ১০ ফুট অবনমন।
অত্যন্ত ঢালু—প্রতি ১০০ ফুটে ১০ থেকে ১৫ ফুট অবনমন।
মাঝামাঝি খাড়াই থেকে খাড়াই—প্রতি ১০০ ফুটে ১৫ থেকে ২৫ ফুট অবনমন।

৯। ক্ষয়করণ

জল এবং বাতাসের দ্বারা মাটির অপসারণকে বলে ক্ষয়করণ। মাটির এই ক্ষয়কে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ

(ক) কিছুই না থেকে সামান্য—২৫ শতাংশেরও কম উপরের মাটি অপসারিত হয় এবং কোনো খাদের সৃষ্টি হয় না।

(খ) মাঝারি—২৫ থেকে ৭৫ শতাংশ উপরের মাটি অপসারিত হয়। ছোট ছোট খাদের সৃষ্টি হতেও পারে বা নাও হতে পারে।

(গ) মারাত্মক—৭৫ শতাংশ বা তারও বেশী উপরের মাটি অপসারিত হয়। মাঝে মাঝে অনতিক্রমনীয় খাদ কিংবা বাতাসে উড়ে আসা বালির বড় বড় স্তূপের সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাটির উর্বরতা

মাটির উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি-বস্তুগুলি যোগান দেওয়ার ধর্মকে বলে মাটির উর্বরতা। যে কোনও সজীব বস্তুর মতই গাছেরও বাঁচা ও বাড়ার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্তু পেলে গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং বেশ সতেজ ও সবল হয়। এতে গাছের কীট পতঙ্গ ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ে এবং ফলে ফলনও হয় প্রচুর। আবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্তু না পেলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে না এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই ফলনও কমে যায়। পুষ্টি বস্তুর পরিমাণ যদি অত্যন্ত কম হয়, তাহলে পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির আগেই এবং বীজ ধারণ না করেই হয়ত গাছ মরে যেতে পারে।

কৃষিজাত ফসলের উৎপাদনের দিক থেকে মাটির উর্বরতা খুব ভালভাবে বুঝতে হলে একে চারটি ভাগে আলোচনা করা দরকার: (১) উদ্ভিদের পুষ্টিবস্তুগুলির চাহিদার পরিমাণ (২) মাটিতে পুষ্টি বস্তুগুলির সরবরাহের পরিমাণ (৩) মাটি থেকে পুষ্টি বস্তুগুলির অপসারণের পথ এবং (৪) মাটির উর্বরতা বজায় ও পুনরুদ্ধারের উপায়।

উদ্ভিদের পুষ্টি বস্তুগুলির চাহিদা

যদিও প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ শস্য উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ করে আসছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। তখন তারা জানত না যে ঠিক কি ভাবে কি হচ্ছে। হামফ্রি ডেভি নামে লণ্ডন রয়াল ইনষ্টিটিউটের একজন রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সার ও ছাইয়ের কার্য্যকারীতা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, যদি কোনও জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে, তবে এই অনুর্বরতার কারণ ও মাটির অন্যান্য দোষ

ত্রুটীগুলি নির্দ্ধারণের জন্য মাটির রাসায়নিক পরীক্ষা প্রয়োজন। এরও সাতাশ বৎসর পর, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জুস্টাস্ ফন্ লিবিগ নামে একজন জৈব রসায়নবিদ তাঁর "কৃষি ও শরীরতত্ত্বে (physiology) জৈব রসায়ন বিদ্যার ব্যবহার" নামক বইয়ে লিখে গেছেন যে উদ্ভিদ দেহের রাসায়নিক পদার্থগুলি মাটি ও বায়ু থেকে আসে, এবং মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে হলে মাটি থেকে এই পদার্থগুলির যে অপচয় হয় তা পূরণ করা আবশ্যক। লিবিগের ধারণা ছিল যে উদ্ভিদ বাতাসের এ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। ঠিক ঐ একই সময়ে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রথামষ্টেডে জন বেনেট লয়েস নামে একজন বিজ্ঞানী উদ্ভিদের ফস্ফেটের চাহিদা মেটানোর জন্য হাড়ের গুড়োর কার্য্যকারীতা পরীক্ষা করে দেখেন যে উদ্ভিদের জন্য আরও অধিক দ্রবণশীল ফস্ফেট ঘটিত যৌগের প্রয়োজন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি এবং তাঁর সহকর্ম্মী, জে. এইচ, গিলবার্ট হাড়ের সঙ্গে সালফিউরিক এ্যাসিড মিশিয়ে সুপারফস্ফেট তৈরী করেন। আজকের ফস্ফেট ঘটিত রাসায়নিক সার শিল্পের যে বুনিয়াদ তা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সাফল্যের পরই পটাসিয়াম ও নাইট্রোজেন ঘটিত লবণের ব্যবহারও ব্যাপকভাবে চালু হয়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জে, বি, বৌসিংগাল্ট নামে একজন কৃষি রসায়নবিদ এ্যাল্সাসেতে তাঁর নিজের জায়গায় প্রথম দেখান যে শুঁটি-জাতীয় গাছ (legumes) বায়ু থেকে একমাত্র তখনই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে যদি মাটি বা যার মধ্যে গাছ জন্মাবে তাকে উত্তপ্ত না করা হয়। তিনি এর এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, মাটির কতকগুলি সজীব জীবানু বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী কতকগুলি যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত করে। কিন্তু মাটিকে উত্তপ্ত করলে এই জীবাণুগুলি মরে যায়

বৌসিংগাল্টের এই পরীক্ষার পঞ্চাশ বৎসর পর এম্, ডব্লিউ, বাইজারিঙ্ক নামে একজন ডেনিস বৈজ্ঞানিক শুঁটীজাতীয় গাছের

শিকড়ের গুটি থেকে একপ্রকারের ব্যাকটেরিয়াকে আলাদাভাবে সনাক্ত করেন এবং এদের নাম দেন "রাইজোবিয়া" বা "মূলে অবস্থানকারী ব্যাক্টেরিয়া"। তিনি প্রমাণ করেন যে শিম্বি জাতীয় গাছের নাইট্রোজেন সংগ্রহ করার জন্য গাছের শিকড়ে এই ব্যাকটেরিয়া গুলির অবস্থান অত্যাবশ্যক। তিনি আরও দেখেন যে মাটিকে উত্তপ্ত করলে এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি মরে যায়। এই আবিষ্কারের ফলে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য শিম্বি জাতীয় গাছের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৪নং চিত্র

নাইট্রোজেন চক্র
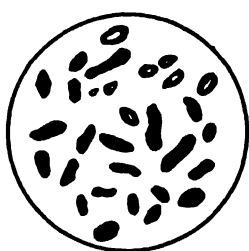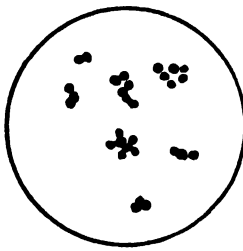
এ্যাজটোব্যাক্টার — নাইট্রেট ব্যাকটেরিয়া — শিম্বি জাতীয় গাছের গুটির জীবাণু
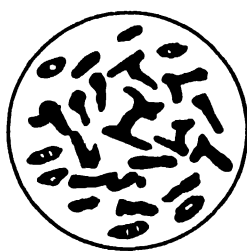
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ফ্রিট্জ হাবের নামে একজন জার্মান রসায়নবিদ ধাতব লৌহকে সহায়ক (catalyst) হিসেবে ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলের কয়েক শত গুণ চাপে ও প্রায় ৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে বন্ধন ক্রিয়াদ্বারা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে দ্রবণীয় যৌগ পদার্থে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ্যামোনিয়া তৈরীর এই পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর মত অনেক কঠিন প্রশ্নেরই সমাধান সম্ভব হয়েছে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এইচ, বোরটেল্স নামক একজন জার্মান ব্যাক্-

টোরিওলজিষ্ট দেখান যে এই নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্‌টোরিয়া-গুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মলিব্‌ডেনাম পেলে নাইট্রোজেন ছাড়াও বাঁচতে পারে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দেখতে পান যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মলিব্‌ডেনাম প্রয়োগ করলে ক্লোভার, বিন ও মটরশুঁটীর বেলায় নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপ্রধান মৌলগুলির মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে লৌহ এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম এটা নির্ণয় করেন এ, গ্রীস নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক। এর অভাবে গাছের পাতা হল্‌দে হয়ে যায়, যাকে বলা হয় পাতার ক্লোরোসিস। কিন্তু লৌহঘটিত লবণ ছিটিয়ে এটা সরানো সম্ভব। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বোরোন, কপার, ম্যাঙ্গানীজ ও জিঙ্ক প্রভৃতি অন্যান্য পুষ্টি-মৌলগুলিরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।

মাটির উর্বরতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হল মাটির ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ক্ষারীয় মৌল ও হাইড্রোজেনকে ধরে রাখার ক্ষমতা এবং একটি মৌলদ্বারা আরেকটি মৌলের অপসারণ। এই প্রক্রিয়াটির আবিষ্কর্তা হলেন রথামষ্টেড লয়েসের সহকর্ম্মী, টি, টি, ওয়ে। এই আবিষ্কারের ফলেই এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মাটিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে তা মাটি থেকে ধুয়ে নষ্ট না হয়ে বরং মাটিতে আটকে থাকে এবং সমপরিমাণ অন্য পদার্থ মাটি থেকে অপসারিত হয়। ওয়ে এটাও প্রতিষ্ঠিত করেন যে মাটিতে ক্ষারীয় মৌলের বিনিময় প্রক্রিয়া অতি সূক্ষ্ম কাদা-কণাগুলির জন্যই হয়ে থাকে।

লিবিগের পূর্ব পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে গাছ হিউমাস গ্রহণ করতে পারে এবং হিউমাস প্রত্যক্ষ্যভাবে মাটির উর্বরতার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু লিবিগ দেখান যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বরং অজৈব যৌগগুলির উপরই নির্ভরশীল।

ঠিকভাবে দেখতে গেলে গাছকে একটি সজীব কারখানা বলা চলে। কারণ গাছ তার শিকড় ও পাতা দিয়ে কাঁচা খাদ্যদ্রব্যগুলি

গ্রহণ করে সূর্য্যালোকের সাহায্যে দানা, খর ইত্যাদি নানাবিধ উদ্ভিজ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়ার জন্য যে সমস্ত কাঁচা দ্রব্যাদির প্রয়োজন সেগুলি হল—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্, পটাসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ম্যাঙ্গানীজ, জিঙ্ক, কপার, বোরোন ও মলিব্‌ডেনাম। অবশ্য এ ছাড়াও অন্য কতকগুলি পদার্থ থাকতে পারে, যেগুলি হয়ত খুবই কম পরিমাণে লাগে। অত্যাবশ্যকীয় মৌলগুলির মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটির অফুরন্ত উৎস হল বাতাস ও জল।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই মৌলগুলি কখনোই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। উদ্ভিদের তালিকাভুক্ত শেষের নয়টি মৌলের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম এবং সাধারণত উদ্ভিদের প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে। এর ব্যতিক্রম যে হয় না তা ঠিক নয়; তবে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়ামের মত এই নয়টি মৌলের অভাব সচরাচর দেখা যায় না। নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়াম এই তিনটি মৌলের অভাবই সাধারণত উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং এই জন্যই এই তিনটি মৌলের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই তিনটি মৌলের পরিমাণের উপরই সাধারণত মাটির উর্বরতা নির্ভর করে।

নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়াম এর প্রত্যেকটিই গাছের প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। গাছের জন্য এইগুলির সরবরাহ মাটি থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না হলে মাটিতে জৈব সার ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই মৌলগুলির প্রয়োজনীয়তা সব ফসলের একরকম নয়। এক প্রকার গাছের কোনও একটি মৌলের যেমন নাইট্রোজেনের চাহিদা অন্য প্রকার গাছ অপেক্ষা অনেক বেশী হতে পারে। তাছাড়া, যে কোনও ফসলের উৎপাদন যত বাড়বে এই অত্যাবশ্যকীয় মৌলগুলির চাহিদাও ততই বৃদ্ধি পাবে। মাটি, ফসলের জাত,

জলবায়ু ও অন্যান্য অবস্থার প্রকার ভেদে একই প্রকার ফসলেরই উপাদান ও গঠন বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে গাছের মোট চাহিদার তুলনায় এই তারতম্য খুবই সামান্য। তাই, অন্তত কতকগুলি ফসলের গাঠনিক উপাদান জেনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কয়েকটি ফসলের তিনটি প্রধান পুষ্টি উপাদানগুলির পরিমাণ ৫ নম্বর তালিকায় দেওয়া হল। উৎপাদন সাধারণের চেয়ে একটু ভাল হলে প্রতি হেক্টর জমির ফসলের দানা ও খরে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক এ্যাসিড ও পটাস (নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক অক্সাইড ও পটাসিয়াম অক্সাইড হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে) থাকবে তাই দেখানো হয়েছে।

তালিকা—৫

ফসলদ্বারা উদ্ভিদের পুষ্টিবস্তু অপসারণের পরিমাণ

ফসল	উৎপাদন (প্রতি হেক্টরে কিলোগ্রাম হিসেবে)	উদ্ভিদের পুষ্টি-বস্তুর অপসারণ (প্রতি হেক্টরে কিলোগ্রাম হিসেবে)		
		নাইট্রোজেন	ফস্‌ফরাস	পটাসিয়াম
ধান	১৮০০	৩৭	১৩	৯
গম	২২৪০	[illegible]	১২	১১
জোয়ার	১১২০	১৭	১০	৮
বাজরা	৮৯৬	[illegible]	৭	১০
ভুট্টা	২৭৮৮	[illegible]	২৬	১৫
যব (বার্লি)	২৫৩৪	[illegible]	২১	১৩
চীনা বাদাম	১৯০৪	৭৮	২২	৪৫
সরষে	৬৯২	২১	১১	২৮
রেড়ি	১৫০৫	৪৫	১৮	২৮
তিসি	১০০৮	১৯	১২	৩২
আখ	৯০৩১৭	৮৫	৬০	১৯০
তুলা (লিন্ট)	১০৪	১০	২০	৮৭
পাট	১১২০—১৬৮০	১১১—২৮০	১১১—১২৩	১৬৮—২২৪
আলু	১৭৫৬২	৮৫	৩০	১৪০
তামাক	১১২০—১৩৪৪	৮৭	১৯	১৬৫

তবে এরদ্বারা কিন্তু এটা বোঝায় না যে মাটিতে এই পরিমাণ পুষ্টি বস্তুগুলি থাকলেই (তালিকা-৫) বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের পরিমাণও তালিকা অনুযায়ী হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিমাণ ফলন পেতে হলে তালিকায় যা দেখানো হয়েছে পুষ্টি বস্তুগুলির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী থাকা দরকার। এর কারণ নানাবিধ। প্রথমতঃ গাছের শিকড়ে, যার আকার আমাদের সাধারণ ধারণার চেয়েও অনেক বড়, প্রচুর পরিমাণে এই মৌলগুলি থাকে। শিকড়ে যে পরিমাণ পুষ্টি বস্তুগুলি থাকে তালিকায় তা ধরা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এই তিনটি মৌল যে পরিমাণে মাটিতে থাকে তার সবটাই ঠিক উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। অধিকাংশ সময়ই এই মৌলগুলির মোট পরিমাণের একটা সামান্য অংশই সহজলভ্য অবস্থায় থাকে। বাকীটা অপ্রাপ্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সহজলভ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়তঃ গাছের বৃদ্ধির সব পর্য্যায়েই পুষ্টি বস্তুগুলির চাহিদা ঠিক একরকম নয়। সাধারণত গাছের চারা অবস্থায় এই পুষ্টি বস্তুগুলির চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। তারপর, যখন গাছ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে তখন এইগুলির চাহিদাও খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, এবং যখন ফসল পাকতে আরম্ভ করে তখন আবার এগুলির চাহিদা কমতে থাকে। এটাকে, একটি শিশু, বাড়ন্ত বালক ও বয়স্ক লোকের খাদ্যের চাহিদার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টি-বস্তুগুলির চাহিদা দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস ঠিক এক রকম থাকে না।

মাটির পুষ্টি বস্তুর সম্ভার

মাটিতে পুষ্টি বস্তুগুলির যে সঞ্চয়, তা যে কোনও ফসলের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। তবে, আগেই বলা হয়েছে যে এর সবটাই উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে না।

নাইট্রোজেন ঘটিত সমস্যা

যে কোনও মাটিতে নাইট্রোজেনের অধিকাংশটাই থাকে বিয়োজিত

বা বিয়োজন হচ্ছে এরকম উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত জৈব পদার্থে ও মাটির জীবাণুতে। মাটিতে এই জৈব পদার্থের উৎস হল পরিত্যক্ত উদ্ভিদের মূল ও উপরের অংশ, প্রাণীজাত সার বা কম্পোষ্ট এবং মাটিতে অবস্থিত প্রাণীর দেহাবশেষ।

মাটিতে জৈব পদার্থের নাইট্রোজেন ছাড়াও কিছু অজৈব নাইট্রোজনও থাকে। এদের মধ্যে নাইট্রেট ও এ্যামোনিয়া ঘটিত যৌগগুলিই প্রধান।

মাটির প্রকার ভেদে এই জৈব ও অজৈব নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম বেশী হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মাটিতেই নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৬৭০ থেকে ৪৪৮০ কিলোগ্রামের মত। তবে এর গড় হিসেব নীচের দিকের সীমারই বেশী কাছাকাছি হবে এবং খুব সম্ভবত প্রতি হেক্টরে প্রায় ১১২০ কিলোগ্রামের মত। এই মোট নাইট্রোজেনের খুব সামান্য অংশই অজৈব ও গাছের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে। বাকী বৃহদাংশ জৈব অবস্থায় থাকে বলে গাছের গ্রহণোপযোগী নয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত রয়েছে এবং এতে জৈব নাইট্রোজেন অজৈব নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হতে পারে। এই প্রক্রিয়া মাটির জীবাণুগুলিদ্বারাই সাধিত হয়। মাটিতে এই প্রক্রিয়া অনবরতই চলছে এবং এর গতি নির্ভর করে জলবায়ু ও অন্যান্য অবস্থার উপর। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় বলেই নাইট্রোজেন ঘটিত উর্বরতা নির্দ্ধারণে মাটির মোট নাইট্রোজেনের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও যে কোনও এক সময় মাটির মোট নাইট্রোজেনের একটি সামান্য অংশই গাছের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই গ্রহণোপযোগী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

ভারতের কৃষি উন্নয়নে খুব সম্ভবত জলের পরই প্রয়োজন নাইট্রোজেন সমস্যার সমাধান। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে আমাদের উৎপাদিত শস্য দ্বারা ভারতবর্ষের মাটি থেকে প্রতি বৎসর তিন

মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন অপসারিত হয়, কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র এক মিলিয়ন টন পুনরায় মাটিতে যুক্ত হয়। জৈব নাইট্রোজেনের দিক থেকে ভারতবর্ষের মাটি মোটামুটি একটা স্থিতাবস্থায় এসে পৌঁছেছে। দেখা গেছে যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ আকবরের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মাটির উৎপাদন ক্ষমতা মোটামুটি একই রয়ে গেছে ; যদিও ইদানীং, ১৯৫৮-৫৯ থেকে ১৯৬০ এর মধ্যে, কোনও কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় শস্যের বেলায় ফলনের কিছুটা বৃদ্ধি দেখা গেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রতি একরে ফলন বৃদ্ধি করতে হলে শুধু যে নাইট্রোজেনের অপচয় কমাতে হবে তাই নয়, মাটিতে অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে এবং এর কার্য্যকরী ক্ষমতাও বাড়াতে হবে।

ভারতবর্ষের যে কৃষিপদ্ধতি তাতে নানাভাবে নাইট্রোজেন নষ্ট হয়ে থাকে। জ্বালানীর অভাবের দরুণ আমাদের উৎপাদিত গোবরের প্রায় অর্দ্ধেকই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এইভাবে কৃষিতে ব্যবহারোপযোগী গোবরের নাইট্রোজেন নষ্ট হয়। নাইট্রোজেন নষ্ট হওয়ার আরেকটি পথ হল বর্ষাকালে জমিতে জল জমার জন্য নাইট্রেট নাইট্রোজেনের ধ্বংশ প্রাপ্তি। ভূমিক্ষয় হেতু জমির উপরিতলের মাটির অপসারণ জৈব নাইট্রোজেন নষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ। ভারতবর্ষের মাটির নাইট্রোজেন ঘটিত উর্বরতা বৃদ্ধির স্বাভাবিক উপায়গুলি হল মাটিতে নাইট্রোজেনের বন্ধন, সবুজ সার, তৈলবীজের খোল ও জৈব আবর্জনাদির প্রয়োগ। শিম্বি জাতীয় ফসলের চাষ জমিতে জৈব নাইট্রোজেন বৃদ্ধির আরেকটি উপায়। একটি শিম্বি জাতীয় ভাল ফসলের সবুজ সার থেকে প্রতি হেক্টরে ৫৬ থেকে ১১২ কিলোগ্রামের মত নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে। পর্য্যায়ক্রম চাষে শিম্বি জাতীয় ফসলের একটি বিশেষ মূল্য আছে, কিন্তু তা ছাড়াও এর কতকগুলিকে সবুজ সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। সবুজ সারের প্রয়োগ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন রকমের মাটি ও জলবায়ুতে সবুজ সারের উপযোগীতা সম্বন্ধে

অনেক মূল্যবান কাজ ভারতবর্ষে হয়ে গেছে। বিশেষ করে মাদ্রাজে সবুজ সার ব্যবহারে ধানের ফলন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নাইট্রোজেনের সরবরাহ বৃদ্ধির অন্যান্য দেশীয় উপায়গুলির মধ্যে পল্লী ও সহরের কম্পোষ্ট ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদের মধ্যে নাইট্রোজেন প্রধানতঃ প্রোটিনের উপাদান হিসেবে থাকে। উদ্ভিদ সাধারণত এ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং তারপর এটা অন্যান্য যৌগে রূপান্তরিত হয়। তবে মাটিতে এ্যামোনিয়াম আয়ণ ও নাইট্রেট আয়ণের ধর্ম্ম সম্পুর্ণ বিপরীত। মাটির কণাগুলি, বিশেষ করে কাদার কণা এ্যামো-নিয়াম আয়নকে আকর্ষণ করে। ফলে এ্যামোনিয়া স্থানান্তরিত হয়ে ধুয়ে চলে যেতে পারে না। এ্যামোনিয়া অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করতে পারে; আবার কতকগুলি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নাইট্রেটেও রূপান্তরিত হতে পারে। মাটির কণা নাইট্রেট আয়নকে ধরে রাখতে পারে না বলে এরা জলের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে উপরে নীচে সঞ্চলিত হতে পারে।

মাটিতে নাইট্রোজেনের উৎস হল বায়ুমণ্ডল। নানাবিধ শস্য বছরের পর বছর মাটি থেকে এই নাইট্রোজেন শোষণ করে নিচ্ছে। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কতকগুলি কাল রঙের অরণ্য অঞ্চলের মাটিতে প্রতি হেক্টরে ৫৬০০ কিলোগ্রাম (১৫ সেঃ মিঃ গভীর) থেকে শুরু করে হেক্টর প্রতি ১২০ কিলোগ্রামেরও কম হতে পারে। মাটির মোট নাট্রোজেনের পরিমাণ নির্ভর করে তার জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর। যে কোনও একটা সময়ে এই মোট নাইট্রোজেনের একটা সামান্য অংশই নাইট্রেট বা এ্যামোনিয়া অবস্থায় থাকে।

নাইট্রোজেন সরবরাহের দিক থেকে সবুজ সারের সুফল প্রথম বৎসরেই পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যেই শিম্বি জাতীয় গাছের প্রায় অর্দ্ধেক নাইট্রোজেন উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। অথচ, ঐ একই সময়ের মধ্যে গোবর সার, পল্লীর কম্পোষ্ট ও সহরের

কম্পোষ্টের মত স্থূল জৈব সারের মাত্র এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অতএব, সহজ-লভ্য নাইট্রোজেনের সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য এ্যামোনিয়াম সালফেট (২০.৫ শতাংশ নাইট্রোজেন); বা ইউরিয়া (৪৬ শতাংশ নাইট্রোজেন), বা এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেড (২৬ শতাংশ নাইট্রোজেন), বা ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (২০.৬ শতাংশ নাইট্রোজেন) ইত্যাদি রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রয়োজন। এই সমস্ত রাসায়নিক সারে নাইট্রোজেন সহজলভ্য অবস্থায় থাকে। এছাড়া সেচের জলের সঙ্গে দ্রবণরূপে বা বাষ্পীয় এ্যানহাইড্রাস এ্যামোনিয়া রূপে মাটিতে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা যায়। এ্যানহাইড্রাস এ্যামোনিয়ায় নাইট্রোজেনের অনুপাত খুব বেশী—৮২.২৫ শতাংশ।

মাটির ফসফরাস ঘটিত সমস্যাবলী

ফসফরাস উদ্ভিদের যে কোনও সজীব কোষের একটি উপাদান।

১৫ নং চিত্র

ফসফরাস চক্র

মাটির জৈব পদার্থ

মাটির সহজলভ্য ফসফরাস

শস্যের দ্বারা অপসারণ

ধুয়ে যাওয়া

মাটিক্ষয়

বন্ধন
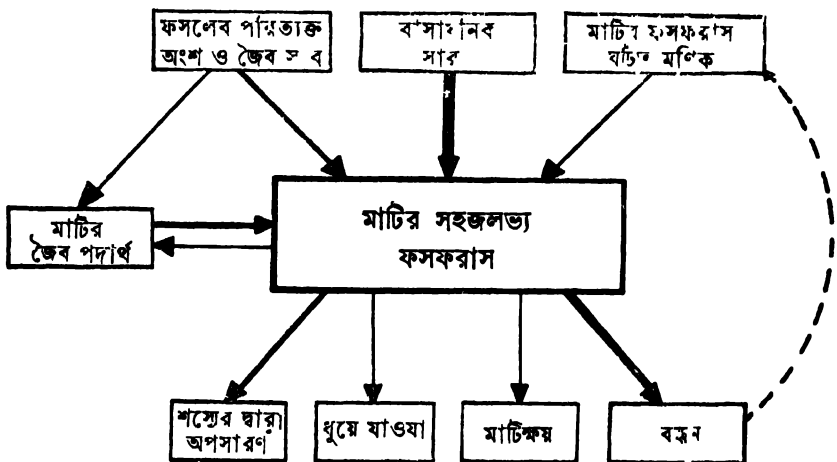
উদ্ভিদদেহের কার্য্যাবলীর অত্যন্ত জটিল পরীক্ষাদ্বারা দেখা গেছে যে গাছের বৃদ্ধি, শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রজনন ইত্যাদি প্রতিটি কাজের জন্যই ফসফরাসের প্রয়োজন। বীজে যতটুকু ফসফরাস থাকে তা ফুরিয়ে গেলে যদি মাটি থেকে ফসফরাস না পায় তবে কোন গাছই আর বাড়তে পারে না। ফসফরাসের প্রাচুর্য্যের অভাবে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা-প্রাপ্ত হয়, গাছ স্বাভাবিক ভাবে পুষ্পিত হতে পারে না এবং শেষ পর্য্যন্ত ফল ও দানার ফলন কমে যায়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফসফরাসের অভাবে গবাদি পশুর খাদ্যোপযোগী ঘাস জাতীয় ফসলের ফলন কম হয় এবং তাতে ফসফরাসের পরিমাণও কম থাকে। ফসফরাসের অভাব হলে অনেক সময় ফসল অনেক আগেই পেকে যায়।

গাছকে মাটির দ্রবণ থেকে ফসফরাস নিতে হয়। কিন্তু মাটির দ্রবণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে কোনও এক সময় এই দ্রবণে ফসফেটের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মাটিতে কিছু পরিমাণ ফসফরাস এমন অবস্থায় থাকে যা অতি সহজেই মাটির জলে দ্রবীভূত অবস্থায় আসতে পারে। অধিকাংশ রাসায়নিক সারের ফসফরাসই অতি সহজে দ্রাব্য এবং সে জন্যই এর কার্য্যকরী ক্ষমতা এত বেশী। যাতে অলভ্য অবস্থার ফসফরাস নিয়মিতভাবে সহজলভ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে তার জন্য মাটির মোট ফসফরাসের সঞ্চয় গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। আরেকটা বিষয় স্পষ্ট যে ফসফরাস পেতে হলে গাছের শিকড়কে ফসফরাসের কাছে যেতে হবে। অতএব লক্ষ্য রাখতে হবে, মাটির খারাপ গঠনের জন্য যেন শিকড়ের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত না হয়। আরও একটি জিনিষ দেখা গেছে যে জৈব সার ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশ মাটিতে ফসফরাসের বন্ধন কমিয়ে দেয়।

অধিকাংশ মাটিতেই প্রথম দিকে ফসফরাসের পরিমাণ খুবই কম থাকে। অতি সামান্য পরিমাণ থেকে শুরু করে প্রতি হেক্টরে সাধারণত ৩·২ মেট্রিক টনের বেশী হয় না (১৫ সেঃ মিঃ গভীর)।

নীচের মাটিতে ফসফরাসের পরিমাণ উপরের মাটির ফসফরাসের পরিমাণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মাটিতে কিছুটা জৈব ফসফরাসও থাকে এবং এর পরিমাণ মাটির মোট ফসফরাসের ২˙৬ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্য্যন্ত হতে পারে। কার্য্যতঃ ফসফরাসের মোট পরিমাণের গুরুত্ব খুবই কম ; বরং ফসলের দিক থেকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল সহজলভ্য ফসফরাসের পরিমাণ। দেখা যায়, অনেক মাটিতেই সহজলভ্য ফসফরাসের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৫˙৬—২২˙৪ কিলোগ্রাম (৫ সেঃ মিঃ গভীর)। ফসফরাসের সহজলভ্য অবস্থা থেকে পুনরায় অলভ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার বা আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। অত্যধিক অম্ল বা অত্যধিক ক্ষারীয় মাটিতে রাসায়নিক সারের ফসফরাস খুব তাড়াতাড়ি অলভ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং খুব অল্প সময়ের জন্যই গাছের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে। মাটিক্ষয়ের দ্বারা ফসফরাস অপসারণের পরিমাণ খুবই সামান্য—বৎসরে হেক্টর প্রতি ১˙১২ কিলোগ্রামেরও কম।

নাইট্রোজেনের মত মাটির ফসফরাসেরও একটা বৃহদাংশ এমন অবস্থায় থাকে যা উদ্ভিদের পক্ষে আশু কার্য্যকরী নয়। মোট ফসফরাসের অতি সামান্য অংশই যে সহজলভ্য অবস্থায় থাকে তার প্রমাণ হল প্রতি হেক্টরে ১১২০ কিলোগ্রাম ফসফরাস আছে এরূপ মাটিতেও কয়েক পাউণ্ড ফসফেট ঘটিত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করায় উল্লেখযোগ্য ভাবে ফসলের ফল বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক মেট্রিক টন জৈব সারে প্রায় ২˙৩ কিলোগ্রাম ফসফরাস থাকে। এই পরিমাণ যথেষ্ট নয় বলেই রাসায়নিক সারের মাধ্যমে খনিজ ফসফরাসের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। অম্ল মাটিতে চুণের প্রয়োগ আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করতে সাহায্য করে।

সহজলভ্য ফসফেটের মধ্যে এর পরই হল সুপারফসফেট, ফসফরিক এ্যাসিড, ক্যালসিয়াম মেটাফসফেট ও ফিউসড ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট। এ্যাসিড বা উত্তাপ প্রয়োগ করে রকফসফেট

থেকে এগুলি তৈরী করা হয়। রকফসফেটে সালফিউরিক এ্যাসিড প্রয়োগ করে সাধারণ সুপারফসফেট তৈরী করা হয়। চুল্লীর গরম বাষ্পকে সূক্ষ্ম বালুকাবৎ ফসফেট রকের সংস্পর্শে এনে ক্যালসিয়াম মেটাফসফেট তৈরী করা হয়। রকফসফেটে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত P_2O_5 (ফসফরাস পেণ্টাঅক্সাইড) থাকতে পারে, কিন্তু এর কোন অংশই জলে দ্রাব্য নয়। কিন্তু খুব মিহিভাবে গুড়ো করে অধিক মাত্রায় মাটিতে প্রয়োগ করলে এর থেকেও ফসফরাস সরবরাহ হতে পারে। ফসফেট ঘটিত কৃত্রিম রাসায়নিক সার যদি খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় তাহলে একে জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিকে নেড়েচেড়ে বা লাঙ্গল দিয়ে চষে উল্টে পাল্টে দেওয়া উচিৎ।

মাটির মোট ফসফরাসের পরিমাণ থেকে শুধু এইটুকু জানা যায় যে কোনও কালে সর্বোচ্চ কতটা পরিমাণ ফসফরাস মাটি থেকে গাছের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আসতে পারে। এর বাস্তব মূল্য খুবই কম। কারণ, এই অলভ্য ফসফরাসের অধিকাংশই অত্যন্ত ধীরে ধীরে সহজলভ্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়। ফসলের বৃদ্ধিকালে কতটা পরিমাণ ফসফরাস গাছের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আসতে পারবে সেটাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। একে বলা হয় "তৈরী সঞ্চয়" বা "সহজলভ্য ফসফরাসের পরিমাণ"। বিভিন্ন প্রণালীতে এর পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। কিন্তু এর কোনটাই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়; তবে অনেকগুলি থেকেই যে আনুমানিক ফলাফল জানা যায় তাদ্বারা মাটির ফসফেট ঘটিত উর্বরতার একটা মোটামুটি পরিমাপ করা সম্ভব।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মাটিতেই সহজলভ্য ফসফরাসের পরিমাণ হল প্রতি হেক্টরে ১০ থেকে ১১২ কিলোগ্রামের মধ্যে। গড় হিসেবে অবশ্য খুব কম। সম্ভবত শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ মাটিতেই সহজলভ্য ফসফরাসের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ২৮ কিলো-গ্রামেরও কম। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এই পরিমাণ ফসফরাস

ফসলের পর্য্যাপ্ত ফলনের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং এটা কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষাদ্বারাই নিরুপিত হয়েছে। দেখা গেছে যে ভারতবর্ষের অর্দ্ধেকেরও বেশীর ভাগ মাটিতে ফসফেট ঘটিত রাসায়নিক সার ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর অন্যান্য কৃষি অঞ্চলের অবস্থাও মোটামুটি একই রকম; যদিও সর্বত্রই এরকম হবে এরূপ কিছু বলা খুবই শক্ত।

গাছের পাতা লাল্‌চে হয়ে গেলে এটাকে ফসফরাসের অভাবের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। অবশ্য এর পর মাটি পরীক্ষা করে এর সত্যতা নির্দ্ধারণ করা উচিৎ।

মাটির পটাস ঘটিত সমস্যাবলী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকে পটাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়, যদিও এর আগে কয়েকশ বৎসর ধরেই কাঠের ছাই ব্যবহার করা হত। যেহেতু আগে মাটিতে ছাই ব্যবহার করা হত, অতএব পটাসিয়াম বা সার হিসেবে ব্যবহৃত পটাস এই শব্দটি এসেছে "পাত্রের ছাই" কথাটি থেকে। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মতই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ পটাসিয়াম মাটি থেকে অপসারিত হয় শস্যের দ্বারা।

যেহেতু কাদার কণাগুলি পটাসিয়ামকে আকর্ষণ করে, অতএব পটাসিয়াম ধুয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যাটি কেবল মাত্র বেলে মাটিতেই দেখা যায়। এরকম মাটিতে মাঝে মাঝেই পটাসিয়ামের প্রয়োগ প্রয়োজন হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই ভূমিক্ষয়ের দ্বারাও মাটি থেকে পটাসিয়াম নষ্ট হয়ে যায়।

অত্যধিক পরিমাণে রাসায়নিক পটাসিয়াম সার প্রয়োগ করা হলে এক প্রকার অস্বাভাবিক ভাবে পটাসের অপচয় হতে দেখা যায়। আঙ্গুরের মত শস্যাদি প্রয়োজনাতিরিক্ত পটাসিয়াম গ্রহণ করে। এতে গাছের ক্ষতিও কিছু হয় না, আবার অতিরিক্ত ফলনও কিছু হয় না; হয় শুধু সার কেনার জন্য কৃষকের অতিরিক্ত টাকা খরচ।

পটাসিয়ামের সবচেয় অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এটা উদ্ভিদের দেহের গঠনে প্রবেশ করে না। গাছ প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম গ্রহণ করে, কিন্তু এর সবটাই থাকে গাছের রসের মধ্যে। গাছ মরে গেলে কিছুটা পটাসিয়াম বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটিতে চলে যায়। অথচ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস, যেগুলি নাকি উদ্ভিদদেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয, সেগুলি উদ্ভিদের দেহ পচে ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্ত হতে পারে না। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরই পটাসিয়াম হল তৃতীয় মৌল, যার অভাব মাটিতে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। পটাসিয়ামের অভাব নানা কারণে হতে পারে, যেমন—যদি মাটিতে প্রথম থেকেই পটাসিয়াম কম থাকে ও খুব বেশী পরিমাণ শুঁটী জাতীয় শস্য উৎপাদন করা হয় এবং যদি ফসল উৎপাদনের পক্ষে মাটি স্বাভাবিক না হয়, যথা বেলে, ক্ষারীয় বা জল নিকাশের অব্যবস্থা।

মাটি থেকে পটাসিয়ামের সরবরাহ কমে গেলে পটাসিয়াম পুরানো কোষ থেকে নতুন কোষের দিকে চলে যেতে থাকে। এই জন্যই প্রথমে পুরনো পাতায় পটাসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পটাসিয়াম না থাকলে ফসলের ক্ষতি হয় এবং ফলনও কমে যায়। যথেষ্ট পরিমাণ পটাসিযামের অভাবে অত্যধিক পটাসিয়াম গ্রহণকারী শুঁটিজাতীয় ফস˝লর ফলন কমে যায় এবং ফসলে পটাসিয়ামের পরিমাণও কম হয়। এছাড়া পটাসিয়ামের অভাব হলে ভুট্টা গাছের শিকড়ের সংখ্যা কমে যায়, লম্বায় ছোট হয় এবং কাণ্ড নুইয়ে পড়ে।

সমস্ত প্রধান পুষ্টি-মৌলগুলির মধ্যে মাটিতে পটাসিয়ামের পরিমাণই থাকে সব থেকে বেশী। ‹ খানে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের ০·১১ শতাংশ হল ফসফরাস, সেখানে পটাসিয়ামের পরিমাণ হল ২·৪০ শতাংশ। পটাসিয়ামের পরিমাণ বিভিন্ন খামারের মাটিতে বিভিন্ন রকম। এর পরিমাণ হেক্টর প্রতি কয়েকশ কিলোগ্রাম থেকে কয়েক হাজার কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত হতে পারে। মাটিতে

পটাসিয়ামের মোট পরিমাণের একটা সামান্য অংশই উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে। সর্বাধিক শতকরা ৯৮ ভাগ অলভ্য অবস্থায় থাকতে পারে। পটাসিয়ামের অলভ্য অবস্থায় যাওয়ার কারণ হল ইহা কাদার কণাদ্বারা আকর্ষিত হয়। কোন কোনও মাটিতে পটাসিয়াম সহজলভ্য অবস্থায় না থাকার জন্যই এর অভাব ফসল উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। বায়ুদ্বারা বা জলদ্বারা ভূমিক্ষয় হেতু পটাসিয়ামের অপচয় হতে পারে। তবে, এই ক্ষতি নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মত খুব সাংঘাতিক কিছু নয়।

যে মাটিতে আলু, মিষ্টি বিট বা তামাকের মত প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিবস্তু শোষণকারী ফসল ঘন ঘন উৎপাদন করা হয়, সে মাটিকে খুব সতর্ককার সহিত পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ যে পটাসিয়ামের অভাব হয়েছে কিনা। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই একটি করে মাটি পরীক্ষাগার আছে। সেখানে মাটির হেক্টর প্রতি কিলোগ্রাম হিসেবে পুষ্টিবস্তুগুলি মাপা হয় এবং এই সঙ্গে সহজলভ্য পটা-সিয়ামের পরিমাণও দেখা হয়।

পটাসিয়ামের অভাব হলে পুরনো পাতার আগা ও ধারের দিকটা হল্‌দে হয়ে যায়। এই অভাব বেশী দিন ধরে চললে শেষের দিকে পাতার ধার শুকিয়ে যায়। শুঁটীজাতীয় গাছে পটাসিয়াম অভাবের প্রথম লক্ষণ হিসেবে পাতার ধারের সমান্তরাল ভাবে কতকগুলি সাদা সাদা ছোট বিন্দু দেখা দেয়।

পটাস ঘটিত রাসায়ানিক সারের মধ্যে প্রধান হল পটাসিয়াম ক্লোরাইড, একে মিউরিয়েট অফ পটাসও বলা হয়। এতে পটাসিয়ামের পরিমাণ খুব বেশী (৬০ শতাংশ পর্যন্ত) এবং এর সবটাই থাকে সহজলভ্য অবস্থায়। পটাসিয়াম সালফেটও আরেকটি পটাস ঘটিত রাসায়নিক সার। এতে পটাসের পরিমাণ হল শতকরা ৪৮ ভাগ এবং এরও সবটাই সহজলভ্য অবস্থায় থাকে।

কতটা পটাসিয়াম দিতে হবে, কখন দিতে হবে এবং কিভাবে দিতে হবে এর সমস্তটাই নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের উপর।

পটাস ঘটিত সার জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিকে চষে দেওয়া যেতে পারে, অথবা যন্ত্রদ্বারা সারিবদ্ধ গর্ত করে তা'তেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মাটিতেই প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম আছে, গড়ে হেক্টর প্রতি ৯০০ থেকে ১১০০ কিলোগ্রাম K_2O (পটাসিয়াম অক্সাইড)। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার তুলনায় এর পরিমাণ মোটামুটি ভালই বলতে হবে। এক্ষুনি ঠিক কতটা পরিমাণ পটাসিয়াম গাছ পেতে পারবে তা জানা থাকলেও নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের থেকে যে এর অবস্থা ভাল তা বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পরীক্ষাদ্বারা মাত্র অল্প কয়েকটি জায়গায়ই পটাসিয়ামের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য, ভারতবর্ষের মাটিতে পটাসিয়াম প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক কাজ খুব বেশী কিছু হয় নি। অন্যান্য জায়গার অভিজ্ঞতা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে পরীক্ষামূলক কাজ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দেখা যাবে যে আমাদের বর্তমান ধারণার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ জায়গায়ই পটাসিয়ামের অভাব ফসল উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে আছে।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতবর্ষের মাটিতে অপ্রধান পুষ্টিবস্তুগুলির মান

গাছের স্বাভাবিক জীবন আবর্ত্ত সম্পূর্ণ করার জন্য যে সমস্ত পুষ্টি-মৌলগুলি অত্যন্ত অল্প পরিমাণে লাগে সেগুলিকে বলা হয় "অপ্রধান মৌল" বা "সূক্ষ্ম পুষ্টিবস্তু"। প্রথম দিকে কার্য্যের আপেক্ষি প্রয়োজনীয়তা নির্বিশেষে ম্যাঙ্গানীজ, বোরোন, কপার, জিঙ্ক ও মালিবডেনাম এই কয়টিকেই "অপ্রধান মৌল" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কারণ এইগুলি গাছের স্বাভাবিক আবর্ত্ত সম্পূর্ণ করার জন্য খুব অল্প পরিমাণে লাগে। উদ্ভিদের জীবন ধারণে কোবালটের কোনও ভূমিকা না থাকলেও পরে দেখা গেছে যে প্রাণীর স্বাস্থ্যের জন্য সামান্য পরিমাণ কোবালটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতএব কোবালটকেও অনেক সময় 'অপ্রধান মৌল' বলে ধরা হয়। গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে. সঙ্গে হয়ত আরও অন্যান্য মৌলেরও আবশ্যকতা স্বীকৃত হবে এবং এইভাবে সেগুলিও "অপ্রধান মৌল" বা "সূক্ষ্ম পুষ্টিবস্তুর" তালিকায় স্থান পাবে।

যেহেতু এই মৌলগুলি খুবই সামান্য পরিমাণে উদ্ভিদের প্রয়োজনে লাগে, অতএব এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এগুলি সহায়ক (catalyst) হিসেবে কাজ করে, কিংবা উদ্ভিদের জীবন আবর্ত্তে যোগবাহী ক্রিয়াগুলির (catalytic processes) যুক্ত থাকে। কপার, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানীজ সহায়ক রূপে কাজ করে এবং এদের ক্রিয়া কলাপ উদ্ভিদ-কোষে জারন-বিজারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। শিম্বি জাতীয় গাছের গুটির জীবাণুগুলির জন্য মলিব-ডেনামের প্রয়োজন এবং দেখা গেছে যে উদ্ভিদের কোষে নাই-ট্রোজেনের পরিবর্ত্তনের জন্যও, যেমন নাইট্রেটের বিজারণের জন্য মলিব্‌ডেনামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদ্ভিদের দেহে কোবালটের বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু গরু, ভেরা প্রভৃতি পশুর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অতি সামান্য পরিমাণ কোবালটের প্রয়োজনীয়তা

সর্ব্বজন স্বীকৃত। কোবালট ভিটামিন 'বি১২' এর একটি উপাদান এবং এই ভিটামিন কতকগুলি এবং সম্ভবত সমস্ত প্রাণীরই পুষ্টির জন্য প্রয়োজন।

মাটির অজৈব পুষ্টিবস্তুর পরিমাণ নির্ভর করে যে মূল উপকরণ থেকে মাটি তৈরী হয়েছে তার সংযুতির উপর। অনেকেই সূক্ষ্ম বালুকা অংশের আকরিক পরীক্ষাদ্বারা (mineralogical examination) মাটির অপ্রধান মৌলগুলির পরিমাণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। কপার, জিঙ্ক, লেড (সীসা), কোবালট ও ম্যাঙ্গানীজের মত ধাতুগুলি অনেক শিলার মধ্যেই অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলি স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত আকরিক পদার্থগুলির ল্যাটিসের গঠনের মধ্যে থাকে। পলল মাটির আকরিক পদার্থগুলি নির্ভর করে মূল শিলার সংযুতির উপর। কোন মৌলের কেলাসের ল্যাটিসে প্রবেশে তার আয়নের ব্যাসার্দ্ধের এবং তার পরবর্ত্তী আচরণে তার আয়নিক পোটেনসিয়ালের (ionic potential) প্রভাবকে ভূ-রাসায়ন শাস্ত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ম্যাগমা (magma) থেকে ফসফরাস খুব তাড়াতাড়ি ইলমেনাইট (ilmenite) ও ম্যাগনেটাইটের (magnetite) সঙ্গে এ্যাপাটাইটরূপে (apatite) কেলাসিত হয়। জিঙ্ক, ক্যাডমিয়াম ও কপার সাধারণত ক্ষারীয় শিলাতে খুব বেশী পরিমাণে থাকে এবং কোবালট, নিকেল, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদির স্থান হল ম্যাগনেসিয়ামের পরে। কোন কোন অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি পুষ্টি মৌলের অভাব জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভূ-রাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখার জন্য কেন এই সমস্ত অঞ্চলে এই মৌলগুলির অভাব রয়েছে তা বুঝতে অনেক সুবিধা হয়েছে।

উদ্ভিদের পুষ্টির মান নির্দ্ধারিত হয় মাটির প্রাপ্তব্য পুষ্টি মৌলের পরিমাণ দিয়ে, মৌলের মোট পরিমাণ দিয়ে নয়। আবার কোন মৌলের সহজলভ্যতা নির্ভর করে সেটা কিভাবে সংবদ্ধ আছে তার

উপর। বিভিন্ন মৌলের সহজ লভ্যতা নির্দ্ধারণে হাইড্রোজেন আয়নেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত মাটির অম্লত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তব্য আয়রণ, ম্যাঙ্গানীজ, বোরোন, কপার ও জিঙ্কের পরিমাণ বেড়ে যায়, কিন্তু প্রাপ্তব্য মলিবডেনামের পরিমাণ কমে যায়। ম্যাঙ্গানীজের বেলায় মাটির বিক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ছাড়াও এর জারন অবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শোনা যায় যে উত্তর বিহারের কোশী বন্যা প্লাবিত এলাকায় আম ও কাঁঠাল গাছগুলি মরে যায়। এটা যে কোশীর পলিতে প্রচুর পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজ থাকায় তার বিষক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে তার নিদর্শন আছে (আর, ভি, তামহানে, বিজ্ঞপ্তি, ১৯৩৬ ; কে, কে, ঝা, বিজ্ঞপ্তি, ১৯৫৬)।

অপ্রধান মৌলগুলির ঘাটতি এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য মৌলগুলির প্রয়োগ ইত্যাদির উপর কতকগুলি রাজ্যে বেশ ভাল সমীক্ষার কাজ হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা ভারতবর্ষের মাটিতে অপ্রধান মৌলগুলির ঘাটতি অনুসন্ধান পরিকল্পনার জন্য এবং চাষীদের মাঠে ও মডেল এ্যাগ্রনমিক ট্রায়ালের মাধ্যমে এই মৌলগুলি প্রয়োগের ফলাফল পরীক্ষা করার জন্য আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। এর ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণত মাটিতে এই অপ্রধান মৌলগুলির পরিমাণ এবং ফসলের উপর এইগুলি প্রয়োগের প্রতিফলন, এই দুইটির মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই। রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা মাটিতে কোন একটি মৌলের পরিমাণ খুব কম দেখা যাওয়া সত্বেও যে মাটিতে বা গাছে মৌলটি প্রয়োগ করে কোনও সুফল পাওয়া যায় না তার কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয় দুটি উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা—

(১) বিভিন্ন ফসলের প্রকৃত চাহিদা, বিশেষ করে মাটিতে এই অপ্রধান মৌলগুলির নীচু, সংকট ও উচ্চ মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এই চাহিদার পরিমাণ আমাদের জানা নেই ; এবং

(২) এই অপ্রধান মৌলগুলির প্রাপ্তব্য অবস্থা মাটির কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাও আমাদের ভালভাবে জানা নেই।

মাটিতে অপ্রধান মৌলগুলি ব্যবহারের সময় একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ, অর্থাৎ দেখতে হবে এই অপ্রধান মৌলের পরিমাণ যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়; কারণ এর পরিমাণ একটা বিশেষ মাত্রার অতিরিক্ত হলেই গাছের মধ্যে এর বিষক্রিয়া দেখা দেয়। আরও দেখা গেছে যে এগুলি মাটিতে প্রয়োগ না করে গাছের পাতা ও ডাল-পালায় ছিটিয়ে দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়। সাধারণত দেখা যায় যে, যেখানে খুব অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম ঘটিত সার ব্যবহার করা হয় এবং ফলে ফলনও কম হয়, সেখানে এই অপ্রধান মৌলগুলির অভাব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ও পটাশ ঘটিত সার ব্যবহার করার ফলে যখন উৎপাদন বেড়ে যায় তখনই এই ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৪ নম্বর পরিশিষ্টে যে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে তা থেকে দেশের অপ্রধান মৌলের অভাব জনিত সমস্যাটি বোঝা যাবে।

প্রধান মৌলগুলির মত অপ্রধান মৌলের অনুসন্ধান কার্য্য তত জোর দিয়ে করা হয় নি এবং এবিষয়ে আমাদের জ্ঞানও সীমিত ধরনের। ইদানীং আমাদের দেশ একটা উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে কৃষিউন্নয়ন এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মাটির স্বাভাবিক উর্বরতার পরিপূরণের কোনও ব্যবস্থা না করেই গতানুগতিক সেই পুরনো পদ্ধতিতে চাষবাসের ফলে ভারতবর্ষের মাটির উর্বরতার মান অনেক নীচে নেমে গেছে, বছরের পর বছর উৎপাদনের মানও সর্বনিম্ন স্তরে থেকে যাচ্ছে এবং ফলে অপ্রধান মৌলগুলির অভাব কখনোই ফসল উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়নি। নিবিড় সার ব্যবহার পরিকল্পনায় এটা খুবই স্বাভাবিক যে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে অপ্রধান মৌলগুলি গ্রহণ করার

জন্য উদ্ভিদদেহে পুষ্টিবস্তুর সাম্য নষ্ট হবে এবং ফসলের ফলনও কমে যাবে। চরম অবস্থায় শস্যহানিও একেবারে অসম্ভব নয়। অতএব অপ্রধান মৌলগুলি সম্বন্ধে সকল রকমের অনুসন্ধানমূলক কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক কাজ হল আমাদের মাটির অপ্রধান মৌলগুলির মোট পরিমাণ ও প্রাপ্তব্য পরিমাণ নির্ণয় করা। ৩ নম্বর মানচিত্র থেকে ভারতবর্ষের মাটির অপ্রধান মৌলগুলির পরিমাণের একটা সাময়িক চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

মোটের উপর দেশের অনেক জমিতেই ও বাগিচা ফসলে যে অপ্রধান মৌলগুলির অভাব রয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বহু ফসল, শঙ্কর ভূট্টার মত অধিক উৎপাদনশীল ফসলের চাষ, নতুন সেচ অঞ্চলে এবং ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে জমিকে সমতল করা, অধিক ফলনের জন্য প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটা-সিয়ামের ব্যবহার ইত্যাদি নিবিড় চাষ পদ্ধতির জন্য অপ্রধান মৌলের অসাম্য বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এতএব ভবিষ্যতে মাটি-উদ্ভিদ পারস্পরিক সম্বন্ধ পর্য্যবেক্ষণে অপ্রধান মৌলগুলি নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর মৌলিক ধরণের কাজ অত্যন্ত জরুরী, যথা—(ক) বিভিন্ন ফসলে ও জলবায়ুতে অপ্রধান মৌলের অভাব জনিত রোগের লক্ষণ সনাক্তকরণের জন্য পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করা, (খ) ফসলের দিক থেকে গাছে ও মাটিতে অপ্রধান মৌলগুলির কম, সংকটও অধিক বা ক্ষতিকর মাত্রা নির্দ্ধারণ করা এবং (গ) মাটির ও মাটি তৈরীর শিলার ভূ-রাসায়নিক পরীক্ষা করা। এই পর্য্যবেক্ষণের কাজ এমন কার্য্যসূচী অনুযায়ী করতে হবে যাতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ের মধ্যেই একটা কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়।

অষ্টম অধ্যায়

মাটির জীব-জীবাণু

এক মুঠো মাটি শুধু যে প্রাণহীণ নির্জ্জীব পদার্থ, তা নয়। অনু-বীক্ষণ যন্ত্রেও চোখে পড়ে না এরকম ভাইরাস থেকে আরম্ভ করে ব্যাক্টেরিয়া, এ্যাকটিনোমাইসেটিস, এ্যালগি, ফাংগি, প্রটোজোয়া, কেঁচো, পিঁপড়ে এবং অন্যান্য ছোট ছোট পোকামাকড় ও প্রাণী মিলিয়ে ইহা অসংখ্য জীব-জীবাণুর আবাসস্থল। প্রকৃতপক্ষে, এক মুঠো মাটি অগণিত জীব-জীবাণুতে ভরপূর এবং এদের মধ্যে এমন কতকগুলি জীবাণু আছে যারা উপযুক্ত অবস্থা পেলে অসম্ভব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। ঠাণ্ডা মাটিতে এই জীবাণুগুলি খুব কম ক্রিয়াশীল ; কিন্তু মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ জল, তাপ ও বাতাস থাকলে খুব তাড়াতাড়ি এদের প্রয়োজনীয় সুস্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, মাটিতে কেঁচোর প্রাচুর্য্য ও বংশবৃদ্ধি মাটির উর্বরতার নিদর্শন। মাটিতে এমন অনেক জীবাণু আছে যেগুলি চোখে না দেখা গেলে'ও সপ্তাহের মধ্যে অগণিত সংখ্যায় বেড়ে ওঠে। জীবাণুগুলির সংখ্যা ও কার্য্যক্ষমতা যত বেশী, মাটির উর্বরতাও তত বেশী এবং এর উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে এই জীবাণুগুলির বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত অবস্থা ও খাদ্য সরবরাহের উপর। বিজ্ঞান সম্মতভাবে মাটির পরিচর্য্যায় এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাটির উৎপত্তি

ব্যাকটোরিয়া, ফাংগি, পাখি ও অন্যান্য প্রাণী সব সময়ই মাটি সৃষ্টির পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা অংশ বিশেষরূপে কাজ করে। কেঁচো, পিঁপড়ে ও গোফারস (gophers) ইত্যাদিও শিলা থেকে অবিরাম মাটি সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

মাটির জীবাণুগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যারা জৈব

পদার্থ বিযোজন করে, নাইট্রোজেনের পরিবর্ত্তন সাধন করে, এ্যান্টিবাইওটিক্স প্রস্তুত করে এবং আরও নানাভাবে উদ্ভিদের উপকার করে থাকে। মাটির সজীব জীবগুলির মধ্যে ব্যাকটেরিয়া সব থেকে ছোট এবং সংখ্যায় সব থেকে বেশী। মাপলে এদের প্রায় দশ হাজারটি মিলে দৈর্ঘ্যে এক সেন্টিমিটার হবে। আকারে খুব সূক্ষ্ম হলেও এক একর উর্বর জমির উপরের এক মিটার মাটিতে অবস্থিত এদের মোট ওজন হবে ৩'৭ হাজার কিলোগ্রামের মত; অথবা বলা যেতে পারে যে মাটির ওজনের ০'০৩ শতাংশ। অনুর্বর বা বেলে মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা খুবই কম থাকে। ব্যাক-টেরিয়াগুলি কোষপ্রাচীরে আবৃত আটালো প্রোটোপ্লাজমের (protoplasm) মত। এদের অধিকাংশকেই পরিত্যক্ত জৈব বস্তুর উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। এরা জৈব পদার্থ থেকে কোষের কার্বন ও শক্তি সংগ্রহ করে এবং এদেরকে বলা হয় (heterotropic) ব্যাকটেরিয়া। যে সমস্ত ব্যাক্টেরিয়ার বেঁচে থাকার জন্য জটিল জৈব পদার্থের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে বলে অটোট্রপিক (auto-tropic) ব্যাকটেরিয়া। এদের কতকগুলির মধ্যে এক রকমের রঞ্জক (pigment) থাকে, যার সাহায্যে এরা সূর্য্যরশ্মী থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে; কোষের জন্য সরাসরি বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন সংগ্রহ করে। আবার কতকগুলি আছে যারা সরল অজৈব পদার্থকে জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম; কিন্তু কার্বনের জন্য বায়ুমণ্ডলের উপরই নির্ভর করতে হয়। এই শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়াগুলি কার্বন মনোক্সাইডকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে, সালফারকে সালফেটে, এ্যামোনিয়াকে নাইট্রাস এ্যাসিডে এবং নাইট্রাস এ্যাসিডকে নাইট্রিক এ্যাসিডে জারিত করে। মাটির অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়ার জন্যই নাইট্রোজেন প্রয়োজন এবং এরা এই নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়া বা নাইট্রেটের মত অজৈব পদার্থ বা উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত প্রোটিনের মত জৈব পদার্থগুলি থেকে সংগ্রহ করে। কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক কতকগুলি জীবাণু সরাসরি বায়ুমণ্ডল

থেকে বায়বীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। এই শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়াগুলির মধ্যে আছে শিম্বি জাতীয় গাছের গুটির ব্যাকটেরিয়া বা রাইজোবিয়া। এরা শিম্বি জাতীয় আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের সংসর্গে থেকে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করে। গুটি যুক্ত শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদ প্রতি হেক্টরে বছরে ২৫ থেকে ৭৫ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে।

এছাড়া মাটিতে মুক্তজীবি ব্যাকটেরিয়াও আছে, যেমন এ্যাজো-টোব্যাকটর। এরাও বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে এ্যাজোটোব্যাক-টরের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাটিতে এই ব্যাকটোরিয়া-গুলি সর্বত্র সমান ভাবে ছাড়িয়ে থাকে না। সাধারণত এরা অল্প কয়েকটি বা হাজার হাজার কোষ একত্রে মিলে দলবদ্ধ হয়ে বা উপনিবেশ তৈরী করে অবস্থান করে।

এ্যাকটিনোমাইসেটিস অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখে পড়ে এরূপ এক শ্রেণীর মাটির জীবাণু। জৈব পদার্থের বিযোজনে এদের যথেষ্ট প্রয়ো-জনীয়তা রয়েছে। প্রস্থচ্ছেদে (cross section) ব্যাকটেরিয়ার সমান হলেও এ্যাকটিনোমাইসেটিসের বৈশিষ্ট্য হল এরা সূতোর মত লম্বা শাখা প্রশাখা (filament) তৈরী করে। এইজন্য এইগুলিকে অনেক সময় রশ্মি ফাংগিও বলা হয়। অধিকাংশ মাটিতেই এ্যাকটিনোমাইসেটিসের সংখ্যা ব্যাকটেরিয়ার এক দশমাংশ থেকে এক পঞ্চমাংশ মাত্র। ভিজে মাটি ও দ্রুত পচনশীল জৈব পদার্থ যুক্ত মাটি অপেক্ষা শুকনো মাটিতে ও জৈব পদার্থ বিযোজনে শেষ অবস্থায় সাধারণত এ্যাকটিনোমাইসেটিসের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। শ্রেণীগতভাবে এরা জৈব পদার্থ থেকে হিউমাস প্রস্তুতকরণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদের মধ্যে এক জাতের জীবাণু আলুর স্ক্যাব (scab) রোগের সৃষ্টি করে। আবার আরেক শ্রেণীর জীবাণু আছে যারা এমন কতকগুলি এ্যান্টিবাইওটিক দ্রব্য

প্রস্তুত করে যেগুলি মানুষের ওষুধ হিসাবে এবং উদ্ভিদের রে'গ নিরোধক হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান।

মাটিতে নানারকমের ফাংগি আছে। ব্যাকটেরিয়া ও এ্যাকটি-নোমাইসেটিস অপেক্ষা ফাংগি মাটিতে অনেক কম সংখ্যায় থাকে। এদের মধ্যে যারা অপরোজীবি শ্রেণীর তারা সেলুলোজ ও লিগ্‌-নিনের মত জটিল পদার্থ সমেত মাটির বিভিন্ন বস্তুর উপর আক্রমণ চালায়। ফাংগি জৈব পদার্থ বিযোজনের সূত্রপাত করে; কারণ এরা একবার আস্তানা পেলে প্রবল পরাক্রমে বেড়ে ওঠে। এদের মধ্যে কতকগুলি হল অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান ঈষ্ট (yeast) ও সাধারণ মোল্ডস্ (moulds); আবার কতকগুলি ব্যাঙের ছাতার (mush-rooms) মত বেশ বড় ও জটিল আকৃতি বিশিষ্ট। উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত পদার্থের খণিককরণে (mineralization) ব্যাকটেরিয়া, এ্যাকটিনো-মাইসেটিস ও ফাংগির ভূমিকা অপরিহার্য্য। প্রতি হেক্টর জমির উপরের বায়ুমণ্ডলে আনুমানিক প্রায় ৫০ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। আবার এক হেক্টর উর্বর জমির সজীব জীবগুলি বছরে এই পরিমাণ কার্বণ ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে। এই জীবানু-গুলি প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্রেও অংশগ্রহণ করে। মাটিতে *সঞ্চিত নাইট্রোজেনের প্রায় সবটাই জৈব নাইট্রোজেন*। মাটির উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত জীবাণুগুলি মাটির জৈব নাইট্রোজেনকে মুক্ত করে এ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করে। তারপর এই এ্যামোনিয়া বায়ু-মণ্ডলে চলে যায়, কিংবা বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়াদ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রাইট বা নাইট্রেটে পরিণত হয়।

প্রটোজোয়া মাটির আরেকরকমের উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত জীবাণু এবং এরা প্রধানতঃ ব্যাকটেরিয়া খেয়ে বেঁচে থাকে। দৈহিক গঠনে প্রটোজোয়া ব্যাকটেরিয়া অপেক্ষা জটিল, কিন্তু মাটিতে সংখ্যায় অনেক কম।

নিমাটোডস্ (Nematodes) অবিভক্ত দেহবিশিষ্ট মাটির এক শ্রেণীর পোকা। এদের অধিকাংশই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান। এদের

মধ্যে অল্প কয়েক রকমের পোকা আছে যারা দৈর্ঘ্যে কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্য্যন্ত হয়। এদের মধ্যে আবার কতকগুলি উদ্ভিদমূলে পরোভোজী হয়ে বাস করে, এবং কৃষিতে এদের ভূমিকাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এক হেক্টর উর্বর জমির উপরের এক মিটার মাটিতে অবস্থিত নিমাটোডগুলির মোট ওজন ১৮৫ কিলোগ্রামের মত।

মাটির জীব হিসেবে কেঁচো মানুষের অত্যন্ত পরিচিত। উত্তম জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ ও ক্যালসিয়াম যুক্ত মাটিতে এদের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। উপযুক্ত মাটিতে প্রতি হেক্টরে এদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন পর্য্যন্ত হতে পারে। এই জীবগুলি উপরের মাটির সঙ্গে জৈব পদার্থের মিশ্রণ ঘটায় এবং প্রতি হেক্টরে বছরে ৫০ টনের মত নীচের মাটি উপরে নিয়ে আসতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কেঁচোর প্রাচুর্য্য মাটির উর্বরতার নিদর্শন। মাটির গঠন রচনায় কেঁচোর ছাচে ঢালা কাজ একটি মূল্যবান অবদান। কেঁচোগুলি খাদ্যহিসেবে জৈব পদার্থ মিশ্রিত মাটি গ্রহণ করে। খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও অস্ত্রের গাত্র-নিঃসৃত শ্লৈষ্মিক পদার্থের সঙ্গে ছাচে ঢালা ছোট ছোট দানার আকারে উদ্‌গীরিত হয়। কোনো কোনো জাতের কেঁচো এই ছাঁচে ঢালা মাটির দানাগুলিকে মাটিতে উদগীরণ করে; আবার কতক আছে যারা এগুলিকে উপরিতলের মাটিতে এনে ছেড়ে দেয়।

নবম অধ্যায়

মাটির ক্ষয় ও তার সংরক্ষণ

বৃষ্টি বা বায়ুদ্বারা অবিরাম মাটিক্ষয় হেতু নদীনালা ও বদ্বীপ সৃষ্ট হয়ে দৃশ্যমান ভূখণ্ডের ক্রম পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কিন্তু ঘাস ও বৃক্ষ প্রভৃতি ঘন গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমিতে এই মাটিক্ষয়ের পরিমাণ খুবই কম। যখন থেকে মানুষ খাদ্যের জন্য ভূমির কর্ষণ শুরু করে তখন থেকেই মাটির এই অনুকূল স্বাভাবিক সাম্য নষ্ট হতে আরম্ভ হয়। প্রাচীনকালে আদিম কৃষিজীবিরা প্রকৃতিজাত গাছপালা পুড়িয়ে স্থূল যন্ত্রপাতি দ্বারা উপরিতলের মাটি ভেঙ্গে ফেলত। এর ফলে মাটির এই অপসারণ ক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত শেষের শতাব্দীগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে যখন মানুষ খাড়াই ঢালু জমিগুলিকেও চাষ করতে বাধ্য হয় তখন থেকেই মাটিক্ষয় সমস্যাটি মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষকগণ খাড়াই ঢালু জমিগুলিকে সোজা উপরে-নীচে চাষ করেছে, যথেচ্ছভাবে পার্বত্য অঞ্চল ও তৃণক্ষেত্রগুলিতে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর চারণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করেছে এবং মাটি সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা না করেই বৎসরের পর বৎসর জমিতে একই ফসল লাগিয়েছে।

যদিও মাটির এই ক্ষয় প্রক্রিয়া এত মন্দ গতিতে চলে যে প্রায় ধরাই যায় না, তবুও অনেক দিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ক্ষতির পরিমাণ সত্যিই খুব অসাধারণ হয়ে দেখা দেয়। সরু নালা থেকে গভীর খাতগুলির সৃষ্টিই এই ধ্বংশ ক্রিয়ার জ্বলন্ত নিদর্শন। ক্রমবর্দ্ধমান খাতগুলির সৃষ্টি তৎপরতার সহিত বন্ধ না করলে পরে এর প্রতিরোধ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্য্যন্ত খামার সমেত সমস্ত জনবসতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

উপরিতলের মাটি পাতলা আস্তরণের ন্যায় সমানভাবে অপসারিত হয়ে যে ভূমিক্ষয় হয় তারও গুরুত্ব কম নয়। মাটির এই ধরণের ক্ষয়

১৬নং চিত্র

বৃষ্টির ফোঁটা অরক্ষিত
মাটির ক্ষতি করে
গাছপালার আচ্ছাদন মাটিকে
বৃষ্টির ফোঁটা থেকে রক্ষা করে
এবং ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে
দেয়

অত্যন্ত ক্ষতিকারক ; কারণ এতে জমির উপরিতলের মাটি সব চেয়ে আগে আক্রান্ত হয়। এক একর জমি থেকে যদি সপ্তাহে এক ঘনগজ করে মাটি ৩০ বৎসর বা এক পুরুষ ধরে অপসারিত হয়, তাহলে মোট ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করলে দেখা যাবে যে জমির উপরিতল থেকে ২৮ সেন্টিমিটার করে মাটি অপসারিত হয়েছে। উপরিতলের মাটিই কৃষির পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী এবং এটা নষ্ট হয়ে গেলে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয়েও জমির উপরিতলের মাটিরই অপচয় হয়ে থাকে।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় গড়ে ২ মিলিয়ন টন মাটি ধুয়ে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে এবং মেক্সিকো উপসাগরে এসে পড়ে। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের মত যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত পশুচারণ করে বৎসরের কোনো সময়ই জমিকে একেবারে অনাচ্ছাদিত রাখা হয় না। সেখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ভারতবর্ষের মত এত বেশী নয়। তা সত্ত্বেও সেখানে এরকমটি হয়ে থাকে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত দেশ জুড়ে উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থাগুলি ছড়িয়ে আছে এবং তারা মাটি ও জল সংরক্ষণের জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যায় করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে নদীগুলি দ্বারা যে পলি বাহিত হয় তার ৯০ শতাংশই আসে পললের উৎস অঞ্চল থেকে। ভারতবর্ষে এই ধরণের বিবরণাদি সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে কোনও রকম চেষ্টা হয়নি, কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ পরিমাপ করে দেখেছেন যে জল বা বায়ুদ্বারা ক্ষয় জনিত ধ্বংশাত্মক ক্রিয়ার ফলে কম পক্ষে ৪০,০০০ হেক্টর জমি স্থায়ীভাবে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং প্রতিবৎসর এর চেয়েও বেশী জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে স্বল্প বৃষ্টিপাত যুক্ত (বাৎসরিক ১২৭ থেকে ২৫৪ মিলি-মিটার) শুষ্ক অঞ্চলে এবং নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বায়ুদ্বারা ভূমিক্ষয় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটাকেই অনেক সময় বলা হয় বালুকা ঝটিকা। এই বালুকা ঝটিকা মরুভূমি থেকে

পার্শ্ববর্ত্তী উর্বর ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ায় তার উর্বরতা হ্রাস পায় এবং সময় সময় এই উর্বর ভূমি পার্শ্ববর্ত্তী মরুভূমির সঙ্গে মিশে যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাকৃতিক বা ভূতাত্ত্বিক ক্ষয় একটি অবিরাম প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যতেও এটা আপন গতিতে চলতে থাকবে। আমাদের ভাল-মন্দের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ভূমিক্ষয় একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষের কার্য্যাবলীর দ্বারাই এর শুরু এবং এর নিরোধও মানুষেরই আয়ত্বাধীন। অপ্রতি-হত ভূমিক্ষয় দারিদ্র্য বয়ে আনে এবং অলক্ষ্যে জাতির শক্তি ক্ষয় করে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের অত্যন্ত জরুরী সমস্যাগুলির মধ্যে ভূমিক্ষয় অন্যতম। ইতিমধ্যেই এর ফলে লক্ষ লক্ষ একর আবাদি জমি ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ একর জমির মান প্রান্তিক মানেরও নীচে নেমে গিয়েছে। চল্‌তি পদ্ধতিতে চাষের ফলে আমাদের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট আবাদি জমি থেকে অনবরত মাটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কর্ষিত ভূমিতে (arable land) মাটিক্ষয়ের উপর বিভিন্ন ফসলের প্রভাব বিভিন্ন রকম। যেমন, ভুট্টা, তুলা, তামাক ও আলু প্রভৃতি ফসলের চাষে মাটিক্ষয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঘাস, গবাদি পশুর খাদ্যশস্য এবং বহু শুঁটীজাতীয় ফসল মাটিক্ষয় প্রতিরোধে সাহায্য করে। আবার গম, বার্লি, যব ও ধানের মত ছোট দানার শস্যগুলি এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি পড়ে। স্ট্রিপ ক্রপিং নামে পরিচিত ক্ষয় সাহায্যকারী ও ক্ষয় নিরোধক ফসলের পর্য্যায়ক্রমে, চাষে ভূমিক্ষয় জনিত ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়। কেবলমাত্র পর্য্যায়ক্রমে চাষ ও স্ট্রিপ ক্রপিংই সম্পূর্ণরূপে মাটি ক্ষয় নিরোধে সক্ষম নয়। এর জন্য এই ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলির সঙ্গে যান্ত্রিক উপায়ে ভূমিসংরক্ষণের ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এদের মধ্যে টেরেসিং বা জমিকে সিড়ির মত করে ধাপে ধাপে চাষ করার পদ্ধতি সবচেয়ে পুরানো। উপরটা প্রায় সমতল এবং পিছন ও সামনের দিকটা অত্যন্ত খাড়া এরূপ বেঞ্চ টেরেস নামে পরিচিত সুন্দর সুন্দর টেরেসের ব্যবহার অতি

প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। নাগাল্যাণ্ডে নাগা উপজাতীয়দের চাষপদ্ধতি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অনেক সময় দীর্ঘ ঢালকে অনেকগুলি ছোট ছোট ঢালে ভাগ

১৭নং চিত্র

মাটি সংরক্ষণকারী শস্য মাটির ক্ষয় রোধ করে
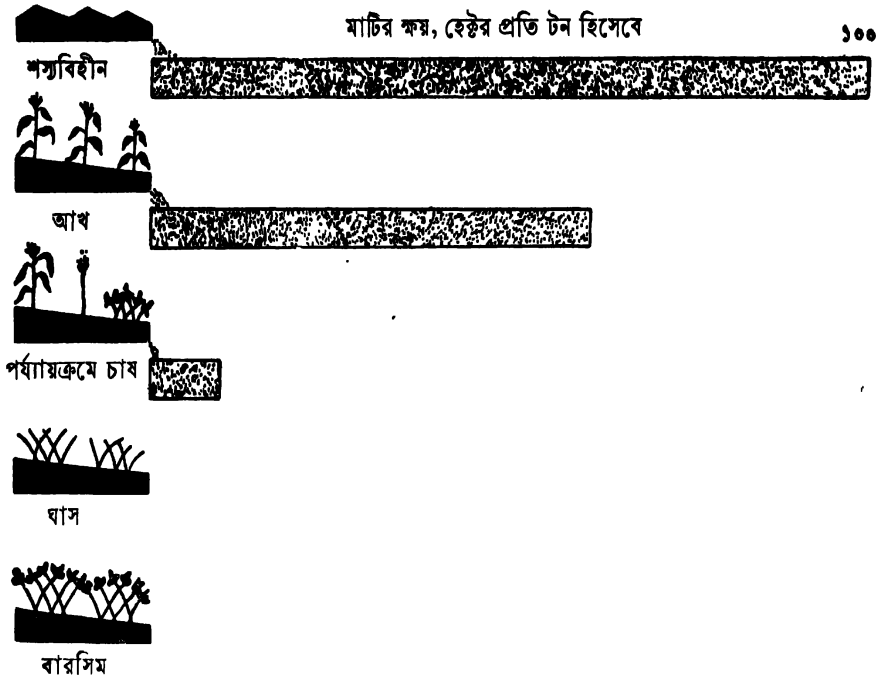
করার জন্য কণ্টুর বা একই সমতল রেখা বরাবর মাটির বাঁধ ও মাটির অন্যান্য রচনা তৈরী করা হয়। এগুলি জলের গতি পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং মাটিতে সর্বাধিক জল শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এরূপ বাঁধের ব্যবহার ভারতবর্ষের শুষ্ক ও শুষ্কপ্রায় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রসার লাভ করেছে এবং

প্লেট ১৯—মানুষ ও ছাগল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ঝিলামের এই
চন্দ্রাকৃতি ভূখণ্ড, প্রতিকার পশুচারণ বন্ধ করা
(৯০নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ২০—বনাঞ্চলে প্লাবন সেচ হেতু জমির ক্ষতি—সিরুরের
নিকট খোদ পরিচালনা (৯২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
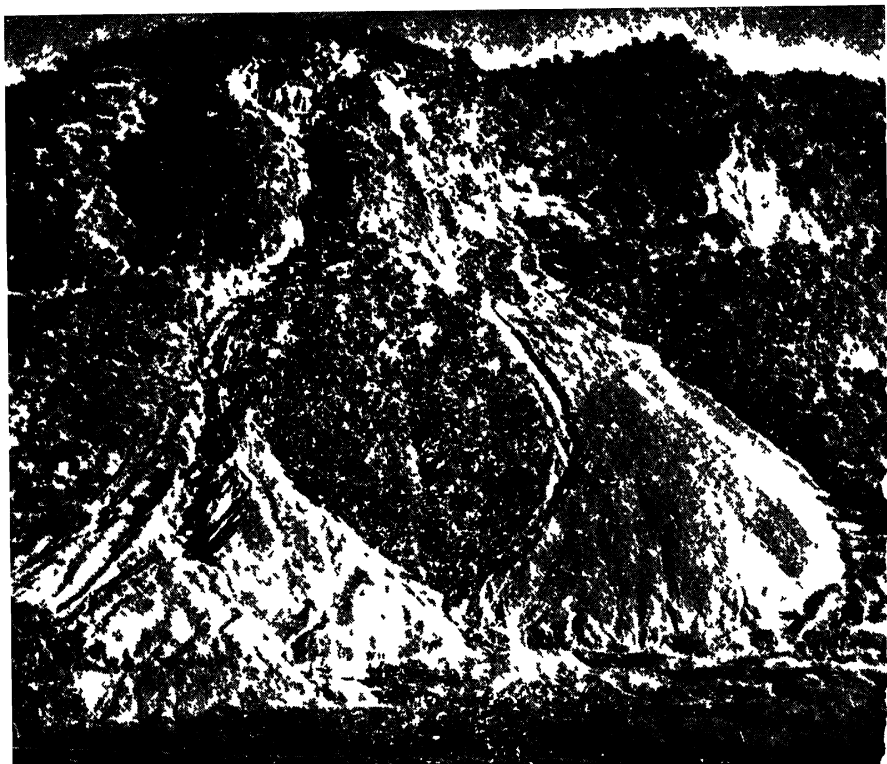
প্লেট ২১—ডুন উপত্যকায চূণাপাথব খননেব ফল (৯২নং পৃষ্ঠায দেখুন)

প্লেট ২৩—মহাবাষ্ট্র ৬" বাঢে ডেগ্রিজেব নিকট তূলা চাষ—তূলা চাষেব পক্ষে মাটি অত্যন্ত স্বল্প গভীব—ডাল, জোযাব ও বাজবাব চাষ কবা উচিৎ (পশ্চাৎপটে ভাল ফসল দেখা যাচ্ছে) (৯৮নং পৃষ্ঠায দেখুন)
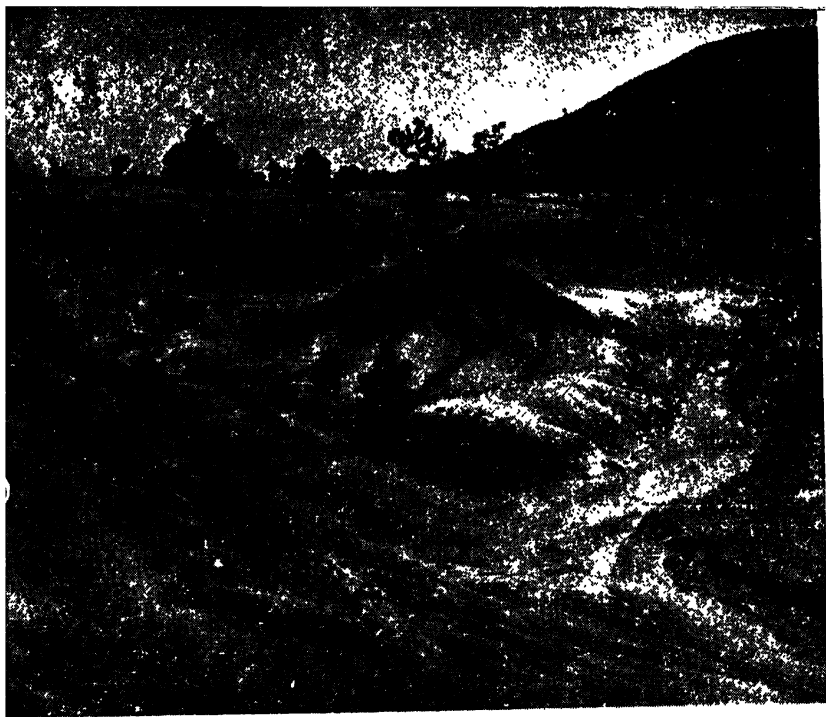
প্লেট ২২—পশ্চিমবঙ্গে রঘুনাথপুর থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার
পথে দবি ভূমি (৯৫নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ২৪—মানুষেব কাযিক পবিশ্রমে বাঁধ নির্মাণ
(৯৯নং পৃষ্ঠায দেখুন)

প্লেট ২৫—মাচকুঁদেব উপব অববাহিকা অঞ্চলে লাগানো গাছ ববাবব কন্টুব
বাঁধেব সাবি (৯৯নং পৃষ্ঠায দেখুন)

এইগুলির ব্যবহারে মহারাষ্ট্র ও মহীশূর রাজ্যের সেচবিহীন চাষ অঞ্চলে আশ্চর্য্য রকমের ফল পাওয়া গেছে।

ভূমিক্ষয়ের সমস্যাগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। যেমন, আসাম, খাসি ও জয়ন্তি পাহাড়ে সিঁড়ির মত ধাপগুলির সমতল জমিতে আলুর চাষ করা হয়। এগুলিকে বলা হয় "টেরেস" (trerrace)। ঢাল বরাবর এই "টেরেস"গুলিতে খুব ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তন করে চাষ করা হয়, এবং এই প্রকার চাষ পদ্ধতিকে বলা হয় "ঝুমিং"। এই 'ঝুম' চাষে মারাত্মকভাবে মাটি ক্ষয় হয়। 'কণ্টুর' চাষ করে এবং মাঝে মাঝে বৃক্ষাদি ও স্থানীয় প্রাকৃতিক গাছপালা-যুক্ত প্রতিরোধকারী জমির ফালি রেখে এই ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ কমানো যেতে পারে। সুপারিশযোগ্য আরেকটি রেওয়াজ হল মাটির পুনঃসংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু বৃক্ষাদি রেখে দেওয়া।

আসামে ভূমিক্ষয়ের একটি প্রধান সমস্যা হল "চাপারির" সংরক্ষণ। এগুলি ব্রহ্মপুত্র নদীর ভিতরের ও সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের বেলে জমি। বর্ষাকালে এগুলি ভীষণভাবে বন্যায় প্লাবিত হয়। সাধারণত এই অঞ্চলগুলি দীর্ঘ কান্তযুক্ত ঘাসে আচ্ছাদিত থাকে এবং খুব তাড়াতাড়ি বন্যা না এলে এখানে বেশ ভাল বোরো ধান জন্মায়। এই "চাপরিগুলি" প্রায়ই ব্রহ্মপুত্রের জলে ভেঙ্গে ধুয়ে যায় এবং নতুন নতুন "চাপারির" সৃষ্টি হয়।

এইভাবে ঘনবসতিপূর্ণ বহু বর্দ্ধিষ্ণু চাপারি এখন ব্রহ্মপুত্রের জলের নীচে চলে গেছে। নদীর ধার দিয়ে সুদূরপ্রসারী শিকড়যুক্ত বৃক্ষাদি রোপণই হল এই "চাপারিগুলি" রক্ষার একমাত্র উপায়।

ভূমিক্ষয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় ১৩০০ বর্গকিলোমিটার পরিমিত জমি পতিত পড়ে আছে। এই সমস্ত অঞ্চলে গাছপালার বৃদ্ধির ক্রমাবনতি খুবই স্পষ্ট। ভাল ভাল শাল বনগুলি ক্রমশ কেন্দু ও পলাশ বনে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। যে সমস্ত জায়গায় এই ভূমিক্ষয় খুব মারাত্মক রকমের সেখানে গাছপালা খুবই কম এবং কোথাও

কোথাও প্রায় নেই বললেই চলে। বন উচ্ছেদ ও অতিরিক্ত পশুচারণের জন্য ডাঙ্গা অঞ্চলের জমিগুলি অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত। এই সব অঞ্চলে চাষের জন্য নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, তৃণক্ষেত্রের উন্নয়ন ও বনের সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজন।

বিহারের নদ নদী সমন্বিত পাহাড়ী অঞ্চলগুলিও ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। বন সৃষ্টি করে এই অববাহিকার কাষ্ঠ অরণ্য অঞ্চলগুলি সংরক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এতে এক দিকে যেমন প্রয়োজনীয় কাঠ ও পশুচারণের জন্য ভাল তৃণ ক্ষেত্র পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই বন্যাজনিত শস্যহানি থেকে কৃষি ভূমিগুলিও রক্ষা পায়। দামোদর নদী ও তার শাখা প্রশাখাগুলির জল নিয়ন্ত্রণ ও এই সমস্ত অঞ্চলে সেচের জল যোগান দেওয়ার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যথাযথ ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেছেন।

উত্তর প্রদেশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, বিশেষ করে আগ্রা, এটোয়া ও জালাউন জেলার যমুনা ও চম্বল অঞ্চলে প্রায় ১·২ লক্ষ হেক্টর খাত যুক্ত জমি আছে। এই খাতগুলি প্রধানতঃ জলস্রোত দ্বারা তৈরী। বন বিভাগ ইতিমধ্যে দেখিয়েছেন যে খাতের উপরে সমতল জমিতে বাঁধ দিয়ে, বন সৃষ্টি করে ও পশুচারণ নিয়ন্ত্রন করে এই সমস্ত ক্ষয়ীভূত খাত জমিগুলির সংস্কার সম্ভব। এটোয়ার নিকট ফিসার বন ও আগ্রার নিকটবর্ত্তী বাইনপুরে যে সমস্ত কাজ হয়েছে সেগুলিই এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এটোয়ার প্রাথমিক অনুসন্ধিৎসা পরিকল্পনার একটি প্রধান বিষয় হল খাতযুক্ত জমির সংস্কার সাধন। এই পরিকল্পনায় দলীপ নগরে খাতভূমিতে কতকগুলি বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। এইগুলি ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ ছাড়াও ক্ষয়ীভূত জমিতে পলি সঞ্চয়ে সাহায্য করে।

দিল্লী ও আজমীর-মারোয়ার সমেত রাজস্থানের কতকগুলি অঞ্চলে অতিরিক্ত পশুচারণ ও বৃক্ষছেদন হেতু ভূমিক্ষয়ে উপরিতলের মাটির অপসারণ একটি প্রধান সমস্যা। মাটি সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে জরুরী কাজ হল সমস্ত রাজ্য জুড়ে খাড়াই ঢালগুলিতে

ও পাহাড়ের চূড়ায় উপযুক্ত জাতের বৃক্ষ ও গুল্মাদি রোপণ করা। সারা বৎসর ধরে অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ ও গ্রামবাসীগণ কর্তৃক যথেচ্ছ-ভাবে বৃক্ষ ও গুল্মাদি কাটার ফলে "শ্যামলেট্স" (shamlats) বা গ্রামীন সাধারণ বনগুলি লোপ পেতে বসেছে। টোডগড়ের নিকট বারাখানে ও আজমীরের নিকট লোহাগোলায় নানাবিধ সংস্কার মূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেখা গেছে যে পশুচারণ বন্ধ করে "শ্যামলেট্সগুলির" উন্নয়ন সাধন সম্ভব। পাহাড় ও তার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বন সৃষ্টির ফলে রাজ্যের ঐশর্য্য বৃদ্ধি ও গোবর সংরক্ষণ ছাড়াও পরোক্ষভাবে রাজ্য ক্রমাগত শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে এবং বাত্যাজনিত ভূমিক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই রাজ্যগুলিতে কণ্টুর বাঁধের সাহায্যে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং এইভাবে জল সংরক্ষণ করে বারানী অঞ্চলে ২৫-৩০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধির আশা করা যেতে পারে। বৃক্ষরোপন করে যে বাত্যা-জনিত ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়, পুকুরে ও নদীর ধারে লাগানো গাছ-পালাগুলি তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

উত্তর গুজরাট থেকে শুরু ক'রে একদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাব ও অন্যদিকে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাজস্থান মরুভূমির ১০৬,০০০ বর্গকিলোমিটার ভূমি বাত্যাজনিত ভূমিক্ষয়ে আক্রান্ত। সমস্ত অঞ্চলটি বেলে সমতলভূমি, কিন্তু এর উর্বরতা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাথুরে পাহাড় ও মালভূমি গুলিতে উপরিতলের মাটি উড়ে যাওয়ায় বা ধুয়ে যাওয়ায মাটি স্বল্প গভীর, ক্ষয়ীভূত এবং গাছপালা বিহীন। আরাবল্লীর পাদদেশের জমি বেশ উর্বর, কিন্তু এর অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিই নোনা বা ক্ষারীয় এবং উচ্চ pH যুক্ত। কচ্ছের রান অঞ্চলে বেলে, পলি বা কাদার সমতলভুমিও দেখা যায়। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বায়ুর দ্রুত গতি এবং জলাভাব এখানকার বৈশিষ্ট। যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানেও এর

অবস্থিতি মাটির গভীরতম অঞ্চলে এবং অনেক সময় হয়ত ৩০-১২০ মিটার মাটির নীচে এর অবস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

'কচদ্বারা' (chos) মাটির অপসারণ পাঞ্জাবের একটি অন্যতম সমস্যা (সিবালিক পাহাড়ের পাদদেশের বালুকাঝড়)। রাজ্যের বন বিভাগ বন সৃষ্টি করে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কতকগুলি অঞ্চলের সংস্কার সাধন করেছেন।

মহারাষ্ট্রের আহামেদনগর, সোলাপুর ও বীজাপুরে এবং সাতারা ও পুনাজেলার কিয়দংশে ভূমিক্ষয় ও জল সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। রাজ্য সরকার মাটির অপসারণ প্রতিরোধ ও জল সংরক্ষণের জন্য বড় বড় বাঁধ নির্ম্মান প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং সোলাপুর ও বীজাপুরের জলাভাব অঞ্চলের বৃহৎ এলাকায় কণ্টুর বাঁধের ব্যবস্থা করেছেন। এই বাঁধগুলি অনুপ্রস্থে সাধারণত ১·১ থেকে ১.৩ বর্গমিটার (১২ থেকে ১৪ বর্গফুট) করে। এইগুলি হাল্কা ও মাঝামাঝি ধরণের সুগভীর মাটিতে মাটি ও জল সংরক্ষণে বিশেষ ফলপ্রসু হয়েছে এবং এতে রবি (জোয়ার) শস্যের ফলন প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে যে ভারী কাল মাটিতে এঁটেল পদার্থগুলিতে ফাটল ধরায় বাঁধগুলি ভেঙ্গে যায়। তদানীন্তন বোম্বে সরকার ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারী কাল মাটিতে কণ্টুর বাঁধের ব্যার্থতার বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য একটি ভূমি উন্নয়ন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিটি ভারী কাল মাটিতে কণ্টুর বাঁধ নির্ম্মান স্থগিত রাখার সুপারিশ করেন এবং কাল মাটি অঞ্চলের উপযুক্ত বাঁধগুলির জন্য বিশেষ বিবরণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান কার্য্য চালানোর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। একমাত্র মহারাষ্ট্র রাজ্যেই প্রায় ৩·২ মিলিয়ন হেক্টর (৮০ লক্ষ একর) গাঢ় কাল মাটি আছে। আগের বাঁধগুলি ব্যার্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার পর থেকেই এই সমস্ত এলাকার মৃত্তিকা সংরক্ষণ একটা বিরাট সমস্যা হয়ে রয়েছে। সোলাপুর জেলার হোনমুরগিতে ১৬২ হেক্টর (৪০০ একর) জমি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একটি কাজ হাতে

নেওয়া হয়েছিল। এতে বাঁধগুলির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দূরত্বে বাঁধ রচনা করা হয় এবং জল নিষ্কাশনের পথগুলিও বিভিন্ন উচ্চতায় তৈয়ারী করা হয়। সব বাঁধগুলিই ছিল কণ্টুর বরাবর। এতে দেখা গিয়েছিল যে অপেক্ষাকৃত নীচের ক্যাচমেণ্ট গুলিতে লবণের আস্তরণ পড়েছে। তাছাড়া, জমি বোনার উপযুক্ত অবস্থা তৈরী করার জন্য চাষীরা বাঁধগুলিকে ভেঙ্গেও দিয়েছিল। এই নিরীক্ষায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে গাঢ় কাল মাটি অঞ্চলে মাটি সংরক্ষণের উপায় হিসেবে কণ্টুর বাঁধ অনুপযোগী এবং সম্ভবত এখানে ধাপে ধাপে পর্য্যায়ক্রমে বাঁধই বিশেষভাবে কার্য্যকরী হবে। মহারাষ্ট্রের বাইরে (ওসমানাবাদ জেলা), বেলারীর কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ গবেষণা কেন্দ্রে এবং আরও কতকগুলি জায়গায় গাঢ় কাল মাটি অঞ্চলের উপযুক্ত বাঁধ তৈরীর গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে।

গাঢ় কাল মাটি এলাকা ছাড়া সমস্ত রাজ্যেই স্বল্প ও মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চলের উঁচু-নীচু ঢেউখেলানো কৃষিভূমিগুলিতে কণ্টুর বাঁধের কার্য্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সাধারণত যে সমস্ত স্বল্প-বৃষ্টিপাত অঞ্চলে কণ্টুর বাঁধ গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরণের বাঁধ মাটির জলপীঠকে উপরে তুলে আনতে বেশ কার্য্যকরী। কোয়েম্বাটুর জেলার লাল মাটি অঞ্চলে এটা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। জলপীঠ উঠে আসায় এখানে জমির পৃষ্ঠ থেকে এবং নলকূপ ও পুকুর থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা খুব সহজ হয়েছে এবং এদ্বারা ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে।

সাধারণত ১০ শতাংশ পর্য্যন্ত ঢাল যুক্ত জমিতে কণ্টুর বাঁধগুলি তৈরী করা হয়। এই কণ্টুর বাঁধের খরচ এক এক রাজ্যে এক এক রকম, এবং হেক্টর প্রতি ৮৬—২৪৭ টাকার মত পড়ে (একর প্রতি ৩৫ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে)। যে সমস্ত বাঁধগুলি কার্য্যকরী হয়েছে তাদের প্রস্থচ্ছেদ সাধারণত ০.৭৪ থেকে ১.৫ বর্গমিটারের মত। প্রস্থচ্ছেদ কতটা হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, জমির

ঢাল ইত্যাদির উপর। গুজরাট রাজ্যের ব্রোচ ও পাঁচমহল জেলায় সমস্যাটি খুবই তীব্র। এই সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম হলেও এর প্রকৃতি আলাদা। এখানে সাধারণত মুসলধারে স্বল্প মেয়াদী বৃষ্টিপাত হয়। ফলে অনাচ্ছাদিত জমি থেকে বছরে ৫০ টন করে মাটি অপসারিত হয় এবং এমনকি এটা অনেক ক্ষেত্রে ১৫০ টন পর্যন্তও এসে দাঁড়ায়।

জমি অপব্যবহারের কি কুফল, মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল তার একটি দৃষ্টান্ত। আলু এখানকার প্রধান ফসলগুলির মধ্যে অন্যতম। গত দশ বৎসরে এখানে আলু উৎপাদনকারী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৫০ হেক্টর থেকে ৮১০০ হেক্টরে (১০,০০০ একর থেকে ২০,০০০ একর) এসে দাঁড়িয়েছে। অত্যধিক ঢালু জমি, এমনকি কোথাও কোথাও ৬০ শতাংশের অধিক ঢালু জমি-গুলিকেও চাষের আওতায় আনা হযেছে। ফলে, মাটিক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সত্ত্বেও আলুর ফলন প্রায় ৫০ শতাংশের মত কমে গেছে। জমির ঢাল যেখানে প্রতি চার ফুটে এক ফুট, সেখানে জমিকে চাষের জন্য ব্যবহার না করে ঘাস বা বৃক্ষাদি রোপনের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ। ঢালের অপেক্ষাকৃত নীচের দিকে কণ্টুর, বা একই সমতলে নালা এবং কণ্টুর, বা একই সমতলে বাঁধ তৈরী করা উচিৎ। অন্ধ্র-প্রদেশের অনন্তপুর জেলার ও মহিশূরের বেলারী জেলার অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলের কাল মাটিতে, মাটির উপরের আস্তরণ সমানভাবে অপসারিত হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। উন্নত ধরণের সেচবিহীন চাষ পদ্ধতিই এখানকার কৃষিভূমির মাটিক্ষয় রোধের প্রধান উপায়।

নর্মদা, তাপ্তি ও মহানদীর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচমেণ্ট অঞ্চলের উৎপত্তি হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। অতএব, এই সমস্ত ক্যাচমেণ্ট অঞ্চল-গুলিতে উপযুক্ত গাছপালার সংরক্ষণ ও ভূমির উপযুক্ত ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। বন উচ্ছেদ ও অতিমাত্রায় পশুচারণ হেতু কিরূপ মারাত্মকভাবে ভূমিক্ষয় হতে পারে, জব্বলপুরের অন্তর্গত

মদনমহলের ৪০৫০ হেক্টর (১০,০০০ একর) পরিমিত জমি তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই রাজ্যের তুলা ও গম চাষ অঞ্চলে কণ্টুর চাষ, ষ্ট্রিপ ক্রপিং (জমিতে ভূমিক্ষয় সহায়ক ও ভূমিক্ষয় রোধক ফসলের পরম্পরায় অবস্থান), কণ্টুর বাঁধ ইত্যাদি সাধারণ কতকগুলি পদ্ধতির প্রতি আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভুমি সংরক্ষণ

ভারতবর্ষে প্রায় ৮১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই এই ব্যবস্থাগুলি দেশের অত্যন্ত জরুরী কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ০.৮ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিভূমিকে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে বলে ধরা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিভূমিতে প্রধানতঃ বাঁধ তৈরী করে মাটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিভূমিতে এই ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

নষ্ট জমি

খাদ্য শস্য উৎপাদন, তৃণক্ষেত্র বা বন সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এরূপ নষ্ট জমির পরিমাণ মোট প্রায় ৪২.৬ মিলিয়ন হেক্টর। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রনালয়ের নষ্ট জমি সমীক্ষা ও সংস্কার কমিটি জানিয়েছেন যে এক এক প্লটে ১০০ হেক্টর বা তারও বেশী আয়তনের মোট ০.৮ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি উপযোগী নষ্ট জমি আছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রত্যেক রাজ্যের -গ্য এইগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত তথ্যাদিও পেশ করেছেন।

খাত ভুমির সৃষ্টি

ভূমির ব্যবহার ঠিক ঠিক মত না হলে মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ফলে জমিতে নালা এবং শেষ পর্য্যন্ত বড় বড় খাতের সৃষ্টি হয়।

যেখানে উপরের মাটি ও নীচের মাটি তুটোই ঝুর ঝুরে এবং অনায়াসেই জল মাটি কেটে বেরিয়ে যেতে পারে সেখানে খাড়া দেয়াল বিশিষ্ট নালার সৃষ্টি হয়। যেখানে ভারী গ্রথন বা শক্ত হওয়ার জন্য নীচের মাটি কাটা খুব অনায়াসসাধ্য নয়, বিশেষ করে যেখনে নীচের স্তরের মাটি উপরের স্তরের মাটি অপেক্ষা নরম নয়, সেখানে নালাগুলির ধার ঢালু হয় এবং 'U' র মত আকার ধারণ করে। যেখানে মাটির নীচে শক্ত এঁটেল মাটির স্তর থাকে সেখানেই সাধারণত এরকম হতে দেখা যায়। নালাদ্বারা মাটিক্ষয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট হল যে, যেখানে নীচের মাটিতে শক্ত এঁটেল মাটি বা কর্দমাধারের স্তর থাকে সেখানে নালার সামনে ও তুই পাশে প্রায় সমান গতিতে ভূমিক্ষয় হয়ে চড়ার সৃষ্টি করে। সাধারণত নালার তলদেশ হঠাৎ দ্রুত মাটি কেটে ৩ বা ৪ মিটার নীচে নেমে যায় এবং তারপর ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে খাতের সৃষ্টি করে। খাতের গভীরতা ৩০ মিটার বা তার বেশীও হতে পারে।

ভারতবর্ষে খাতযুক্ত ভূমির মোটামুটি অবস্থান ৪ নং, [১] মানচিত্রে দেখানো হল। মানচিত্র থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বেশ কিছু পরিমাণ জমি খাতযুক্ত ভূমির অন্তর্ভূক্ত।

চম্বল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আকাশ সমীক্ষায় (aerial survey) দেখা গেছে যে ৪.৬ থেকে ৬.১ মিটার (১৫ থেকে ২০ ফুট) পর্য্যন্ত গভীর খাতযুক্ত ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫০,৬০০ হেক্টর (১,২৫,০০০ একর)।

মধ্যপ্রদেশে খাতযুক্ত ভূমিগুলি প্রধানতঃ চম্বল ও কালীসিন্ধ নদী এবং তাদের শাখা প্রশাখার ধারে অবস্থিত। এই নদীগুলি পার্বত্য অঞ্চলের খুব ঢালু জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ভূমিক্ষয়ে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু জমি খাতভূমির অন্তর্ভূক্ত হয়। অনুমান ০'৪—০.৮ মিলিয়ন হেক্টর (প্রায় ১ থেকে ২ মিলিয়ন একর) জমি গভীর

নালা ও খাতযুক্ত ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ২.৪ লক্ষ হেক্টর (৬ লক্ষ একর) জমি গোয়ালিয়র, মোরেনা ও ভিন্দ এই তিনটি জেলায় অবস্থিত।

উত্তর প্রদেশের সিন্ধু গাঙ্গেয় পলল ভূমির মত গভীর মাটিযুক্ত অঞ্চলে যমুনা, চম্বল, গোমতী ও তাদের শাখা প্রশাখাগুলি অত্যন্ত গভীর খাতে প্রবাহিত। এখানে জল নিস্কাশনের স্বাভাবিক নালা-গুলির দুই ধারে যেখানে জল এসে খুব ঢালু জায়গায় পড়ে, সেখানেই মাটির ক্ষয় প্রথম আরম্ভ হয়। মাদ্রাজে দক্ষিণ আরকট, উত্তর আরকট, কণ্যাকুমারী, তিরুচি, চিংলেপাট, সালেম, কোয়েম্বাটুর প্রভৃতি কতকগুলি জেলার কিছু কিছু অংশে খাত ভূমির সমস্যা খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় কংসাবতী নদীর উপরের দিকে অববাহিকা (catchment) অঞ্চলের নালা ও খাতযুক্ত ভূমির জন্যও আশু মাটিক্ষয় প্রতিরোধ ও সংস্কার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

দেশের মোট খাতযুক্ত ভূমির একটা আনুমানিক পরিমাপ ৫ নং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

ভিতরের দিকে, যেখানে আক্রান্ত কৃষিভূমিতে নালাগুলি খুব ছোট আকারের, সেখানে প্রতিরোধক বাঁধ দিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঘাস বা মাটি ধরে রাখতে পারে এরূপ অন্য কোনও রকম গাছ পালা লাগিয়ে জমির সংস্কার সাধন সম্ভব। আরও উপরে যেখানে মাটির ক্ষয় কেবল শুরু হয়েছে, সেখানে এই ভূমি সংস্কারের খরচ খুবই কম। এই সমস্ত অঞ্চলে অতি সাধারণ কতকগুলি ব্যবস্থাদি দ্বারা, যেমন গোচারণ বন্ধ করে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা কেটে দিয়ে এবং মাটিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে ২—৩ বৎসরের মধ্যেই জমিকে সংস্কার করে কৃষির উপযোগী করে তোলা যায়।

খাতভূমিগুলি যদি যথেষ্ট চওড়া হয়, তবে সেখানেও সিড়ির মত একটির পর একটি ধাপ তৈরী করে কৃষিকার্য্য করা যেতে পারে,

যেমন উড়িষ্যার মাচকুন্দ অববাহিকা (catchment) অঞ্চলে করা হয়। যেখানে জমি অপেক্ষাকৃত কম চওড়া, সেখানেও এরকম পর পর ধাপ তৈরী করে কলমের আম, পেয়ারা ইত্যাদি ফলফলাদির গাছ লাগানো যায়। এটা অবশ্য অনেকটা কৃষকের আর্থিক সঙ্গতি, তার জমির পরিমাণ, সহরের সান্নিধ্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে। ফলফলাদির গাছ রোপণের জন্য খাতভূমিকে নির্দ্দিষ্ট করার আগে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে সেচের ব্যবস্থা আছে কি না। এরকম জমির কিছুটা অংশ অবশ্য সেচের জন্য জলাশয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুবিধে থাকলে এই খাতভূমিগুলিকে জ্বালানী ও কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বন সৃষ্টির জন্যও খুব ভালভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। অত্যন্ত খাড়াই খাতভূমিগুলিকে সংস্কার করে শুধু জ্বালানী কাঠের বন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মাঝামাঝি রকমের খাতভূমিগুলিকে সংস্কার করে বাগিচা ফসলের চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

খাতে জল আসার নালাগুলির ধারে বাঁধ দিয়ে জলের গতিপথ পরিবর্ত্তন করে; কিছুদূর অন্তর প্রতিরোধক বাঁধ দিয়ে নালাগুলিকে বন্ধ করে; অত্যধিক ঢালু নালার ধারগুলিকে কেটে স্বাভাবিক করে দিয়ে এবং মাটি আকড়ে ধরে রাখতে পারে এরূপ ঘাস বা লতানো গাছ লাগিয়ে; নদীর ধারে ও অন্যান্য কাজের অনুপযুক্ত খাতজমিতে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এরূপ গাছ লাগিয়ে; খাতের মধ্যে ঝাঁঝরির মত কূপ খনন করে ও উন্নততর কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করে এবং অববাহিকার (catchment area) অপেক্ষাকৃত উচু সমতল ভূমিতে মাটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাতভূমিগুলির নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার সম্ভব।

উত্তর প্রদেশ সরকার রাজ্য ভূমি সংরক্ষণ পরিকল্পনায় রেমানখেরাতে একটি বিরাট এলাকায় খাতভূমি সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের জুন মাসে লক্ষ্ণৌ জেলায় এই পরিকল্পনার কাজ প্রথম শুরু হয়। খামারের অধিকাংশ জমিই

মাটিক্ষয় ও খাতসৃষ্টির দরুন এত সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে, কোনও রকমের কৃষিকার্য্যই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এখানে সেখানে ছড়ানো যা কিছু চাষের জমি ছিল, তাতেও একমাত্র জোয়ার বা বাজরার মত মোটা দানার শস্যেরই অল্প বিস্তর চাষ হত। এখানকার মাটিও ছিল খুব নিম্ন মানের; বেলে দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ বেলে গ্রথন যুক্ত। নালাগুলি ছিল সাংঘাতিক ধরনের এবং খাতভূমির সৃষ্টি এতটা চরমে পৌঁছেছিল যে এই সমস্ত জমিতে সামান্য ঘাস পর্য্যন্তও জন্মাতো না। কেবল মাত্র, ইতঃস্তত ছড়ানো মুঁজ (Saccharum munja) ও কাঁশের (Saccharum spontaneum) ঝোপ এবং দু চারটে নিকৃষ্ট জাতের বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না। কিন্তু চাষের জমিগুলিতে ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও উন্নত চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করায় জমিগুলির পুরোপুরি সংস্কার সম্ভব হয়েছে। এখন এখানে যে কোনও রকমের ফসল ফলানো সম্ভব। ১৯৫০ সালে প্রথম যখন এই খামার চালু করা হয়, তখন সেচের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তারপর থেকে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, এবং বর্ত্তমানে প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ জমিতেই সেচের ব্যবস্থা আছে। সেচের পরিমাণ মাসে হেক্টর প্রতি প্রায় ১৮.৮ সেঃ মিঃ থেকে ২৫.১ সেঃ মিঃ (একর প্রতি ৩ ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চি)। প্রথম থেকেই এর অধিকাংশ অঞ্চলে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা হয়। গত চার বৎসরের গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১৪.৮ কুইনণ্টালের মত। বাঁধ, জমি সমতল করা, ঘাস উৎপাদন ও জল নিকাশের রাস্তাকে পাকা করে বাঁধানো এবং সব শেষে সময়মত চাষ ইত্যাদি নানারকম ভূমিসংরক্ষণ ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনের ফলেই এই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। রেমানখেরা খামারের সাফল্য থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে যে উপযুক্ত ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতিদ্বারা নালা ও খাতযুক্ত নষ্ট ভূমিগুলিকেও উর্বরা ভূমিতে পরিণত করা যায়। সঙ্গতি ও নিষ্ঠা থাকলে মারাত্মক-

ভাবে ক্ষয়ীভূত ভূমিকেও উন্নত করে তোলা সম্ভব। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিবস্তুর প্রয়োজন, তার শতকরা ৮৫ ভাগই স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে, অথবা যে জায়গা সংস্কার করতে হবে সেখানেই সবুজ সারের চাষ করে এগুলি বাড়ানো যেতে পারে।

যাযাবর চাষ পদ্ধতি

স্বল্প বসতিপূর্ণ নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চলগুলিতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জমি পড়ে আছে। এই সমস্ত অঞ্চলে কুমরী, ঝুমিং বা যাযাবর চাষ ইত্যাদি সেই প্রাচীন পদ্ধতিতেই কৃষিকার্য্য চলে। এই পদ্ধতিতে বন পরিষ্কার করে, আগাছা ও জঙ্গল পুরিয়ে এক এক জায়গায় মাত্র দুবৎসরের জন্য ছোট খাট যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং অতি সামান্য পরিশ্রমে শুধু নিজ নিজ প্রয়োজন মেটানোর জন্য ফসল উৎপাদন করা হয়। এই ভাবে গাছ কেটে ও পুড়িয়ে দিয়ে বন জঙ্গল উচ্ছেদ করায় ভূমি রোদ বৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং ফলে জমি থেকে, বিশেষ করে পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলগুলি থেকে, প্রচুর পরিমাণ মাটি ক্ষয়ে যায়। এই ভাবে শুধু যে উপরিতলের মাটিই সম্পূর্ণ ধুয়ে চলে যায় তা নয়, বন অঞ্চলে সঞ্চিত গাছের পুষ্টিবস্তুগুলিও প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া যে সমস্ত জৈব পদার্থ ও পুষ্টিবস্তুগুলি থেকে যায়, সেগুলিও খুব শীঘ্রই জারিত হয়ে বা অত্যধিক বৃষ্টিপাতে ধুয়ে নীচে চলে গিয়ে নষ্ট হয়। প্রায় ২-৪ বৎসর পর থেকেই যত বেশী দিন ধরে চাষ চলতে থাকে, পাতলা করে বোনা ফসলের ফলন ততই কমতে থাকে এবং ক্রমশঃ জমি জংলা ঘাস ও আগাছায় ঢেকে যায়। তখন অন্য একটি জায়গা বেছে নিয়ে এবং আগের মতই জায়গাটিকে পুড়িয়ে ও পরিষ্কার করে ফসল উৎপাদন করা হয়। পরিত্যক্ত জায়গাটি শীঘ্রই আবার ঝোপ জঙ্গলে ঢেকে যায়। দীর্ঘ শিকড়যুক্ত গাছগুলি তখন নীচের মাটি থেকে পুষ্টিবস্তুগুলি সংগ্রহ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই

এই পুনঃসংস্কার এমন একটা অবস্থায় পৌঁছায়, যখন জমিটিকে আবার পরিষ্কার করে চাষ করা চলে। এইভাবে আবর্ত্তটি চলতে থাকে। কিন্তু এই আবর্ত্তের প্রত্যেক পর্য্যায়েই মাটির পুষ্টিবস্তু-গুলির পরিমাণ কিছু কিছু করে কমে যায় এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতায় ক্রমশঃ অবনতি ঘটে।

আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নেফা, নাগাল্যাণ্ড ও উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে যাযাবর পদ্ধতিতে চাষ একটি বড় রকমের সমস্যা। বিবরণে প্রকাশ, আসামে প্রায় ২০৭,২৮৭ হেক্টর, ত্রিপুরায় ৪৬,৯৬৩ হেক্টর ও মণিপুরে ২১,৮৬২ হেক্টর জমি এই যাযাবর চাষ প্রথার অন্তর্ভূক্ত। অনুমান, উড়িষ্যায় প্রায় ৩৩,০৮,৫০২ হেক্টর জমিতে যাযাবর প্রথায় চাষ হয়। উড়িষ্যার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫২৪ মিলিমিটার। কিন্তু পূর্বভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে যাযাবর প্রথায় চাষ হয়, সেখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৯০৫ থেকে ২৫৪০ মিলিমিটার। এটা অরণ্যের পুনরোদ্গমের পক্ষে খুবই অনুকূল। আসামের যাযাবর চাষ অঞ্চলের লোক বসতির ঘনত্ব উ[illegible]ষ্যার অনুরূপ অঞ্চল অপেক্ষা কম। ৬ নম্বর তালিকায় বিভিন্ন যাযাবর চাষ অঞ্চলের লোক সংখ্যার ঘনত্ব দেখানো হ'ল।

জমির উপর অত্যধিক চাপের জন্য উড়িষ্যায় রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায়ই উপজাতীয় কৃষকদের পক্ষে জমিকে খুব বেশী দিনের জন্য বিরাম দেওয়া সম্ভব হয় না, এবং পর্য্যায়ক্রমের চক্রটি ৪ থেকে ১২ বৎসরের মধ্যেই শেষ করতে হয়। পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু জমিগুলিতে গাছপালার ধ্বংস ও "পতু" চাষের জন্য ভারী পলিগুলি নীচে নেমে এসে পার্শ্ববর্ত্তী উর্বরা জমিতে জমা হয় এবং সেগুলিকে অনুর্বর করে তোলে। এতে সেখানে মাটির স্বাভাবিক জলের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বর্ষাকালে প্রায়ই প্লাবন হয়।

তালিকা—৬

যাযাবর চাষ অঞ্চলের লোক সংখ্যার ঘনত্ব

অঞ্চল	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক সংখ্যার ঘনত্ব
আসাম		
যুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়	১৪৩৩০	২৫
নাগা পাহাড়	১০৮৮৫	১৮
লুসাই পাহাড়	২১১০৮	৯
গারো পাহাড়	৮১৩৫	২
উড়িষ্যা		
কোরাপুত	২৫৫৭৬	৪৯
কালাহান্দি	১৩১৭২	৬৫
ফুলবানি	১১০৫৯	৪১

যাযাবর চাষ নিয়ন্ত্রনের উপায় হিসেবে কতকগুলি ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

১। উপজাতীয়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাযাবর চাষ অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত করতে হবে। যেহেতু এই উপজাতীয়েরা অত্যন্ত গরীব, অতএব স্থায়ী কৃষিকার্য্যে আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে গবাদি পশু, কৃষির যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, উপযুক্ত জমি ও বসবাসের জন্য ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এটা অবশ্য খুব ব্যায়সাপেক্ষ পরিকল্পনা এবং এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে উপজাতীয়দের আদি বাসভূমি থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর।

২। দ্বিতীয়তঃ, স্থায়ী গাছপালা লাগিয়ে, প্রদর্শনী খামার খুলে এবং উপজাতীয়দের সমবায় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যাযাবর চাষ অঞ্চলের ফসল উৎপাদনের রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে।

প্রদর্শনী খামারগুলিতে জমির আয়তন কমপক্ষে ২০-৪০ হেক্টর হওয়া উচিত। খামারের আয়তন যতটা সম্ভব বড় এবং এমনকি প্রায় ৪০৪ হেক্টর পর্য্যন্ত হলেও ক্ষতি নেই। কণ্টুর বাঁধ ও টেরেসেস তৈরী করা, ঘাস, শুঁটী জাতীয় ফসল ও কফির মত অর্থ উপার্জ্জনকারী ফসলের চাষ এই প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে দেখানো হবে।

৩। তৃতীয় উপায় হল জমিকে কৃষি ও বনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার। এতে পার্বত্য অঞ্চলটি এমনভাবে ছকে নেওয়া হয়, যাতে কৃষি, বন ও বাগিচা এই তিনটির সমন্বয়ে জমির স্মুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে পর্য্যায়ক্রমে বন ও কৃষির জন্য জমিকে ব্যবহার করা হয় এবং পর্য্যায়ক্রমটি এমনভাবে ঠিক করা হয় যাতে জমির উর্বরা শক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটে। কার্য্যতঃ যেখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী ও প্রাকৃতিক গাছপালা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, সেই সমস্ত অঞ্চলে এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪। তাউঙ্গিয়া পদ্ধতিটি প্রথমে বর্মাতে চালু হয়। এতে জমিতে বৃক্ষ ও কৃষিজাত শস্য এক সঙ্গে লাগানো হয়। গাছগুলি যখন বড় হয়ে যায় তখন এই বনজ ফসলটি কেটে ফেলা হয়। এইভাবে গোটা অঞ্চলটির পুনঃসংস্কার সম্ভব হয় এবং উপযুক্ত পরিচালনায় সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করলে বনজ ফসলটি আর্থিক দিক থেকে বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে। বর্মাতে এই প্রথায় অতি স্থন্দর টিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

৫। ভূতপূর্ব বেলজিয়ান কঙ্গোর কোন কোনও অঞ্চলে বনজ ফসল ও সাধারণ মাঠের ফসলের দীর্ঘমেয়াদী পর্য্যায়ক্রমে চাষ হত। এই পদ্ধতিতে বনভূমিকে অন্তত ১০০ মিটার প্রস্থের লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয় (উপযুক্ত আলো পাওয়ার জন্য পূর্ব থেকে পশ্চিম বরাবর)। প্রতি বৎসরই একটি ফালি ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং একটি ফালি বন স্বষ্টির উদ্দেশ্যে পতিত

রাখা হয়। জমির সরু ফালিতে ঝোপ ঝাড় গুলিকে পুড়িয়ে এবং কাঠের টুকরোগুলিকে পচিয়ে পরিষ্কার করার পর এতে চার বৎসর ধরে মাঠের সাধারণ ফসলের চাষ করা হয়। এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয় যাতে একটা সময় আসে যখন প্রত্যেকটি চাষভূক্ত জমির ফালি বনজ গাছগুলি দ্বারা পরিবৃত হয়ে যায়। পতিত জমি-গুলির অপেক্ষাকৃত সরু ফালিতে বনের পুনরোগ্দম খুব তাড়াতাড়ি হয়। এই পুনরোগ্দমের জন্য প্রায় দশ বৎসর সময় লাগে।

উপজাতীয়দিগকে তাদের চিরাচরিত চাষ পদ্ধতি থেকে নিবৃত্ত করতে হলে এই সমস্ত অঞ্চলের বিরাট এলাকায় খুব সতর্কতার সহিত উন্নত চাষপদ্ধতি প্রদর্শণীর প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া উচিৎ।

দশম অধ্যায়

মাটির জল সংরক্ষণ

বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষার ও তুষারবৃষ্টি এই চারটি উপায়ে বায়ুমণ্ডল থেকে ভূ-পৃষ্ঠে জল আসে। আরও দুটি উপায় হল হিম ও শিশির। অবিরাম জলের তরল অবস্থা থেকে বাষ্পী ভবন ও আবার বাষ্প থেকে তরলী ভবনকে বলা হয় বারিচক্র।

পরপৃষ্ঠায় বারি চক্রের কতকগুলি পর্য্যায় দেখানো হল। এতে দেখানো হয়েছে যে কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে জল বাষ্পীভূত হয় এবং আবার বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। তারপর মেঘ থেকে জল বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নেমে আসে এবং নদী-নালা, হ্রদ ও সমুদ্রে এসে জমা হয়। এর কিছুটা প্রথমে চুঁইয়ে মাটির নীচে চলে যায় এবং তারপর হ্রদ বা সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। সূর্য্যলোক ও অভিকর্ষ এই দুটি বারি চক্রের জন্য শক্তি যোগায়। সূর্য্যলোক জলকে গরম করে এবং এইভাবে বাষ্পী ভবনের শক্তি যোগায়। অভিকর্ষ জলবিন্দুগুলিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে টেনে আনে।

সমুদ্র থেকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩২৮,০০০ ঘন কিলোমিটার জল বাষ্পীভূত হয়। স্থলভাগ থেকেও প্রতি বৎসর প্রায় ৬১,৫০০ ঘন কিলোমিটার জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। বৃষ্টিপাতের প্রামাণ্য নথিপত্র থেকে বলা যেতে পারে যে আমাদের অঞ্চলে বৎসরে বা এমনকি প্রতি মাসে কত মিলিমিটার বৃষ্টিপাত আশা করতে পারি। একটি মুসলধার বৃষ্টিতে হাজার হাজার লিটার জল পড়তে পারে। প্রয়োজনানুযায়ী, যেখানে ব্যবহার করা সম্ভব সেখানে এটাকে অবশ্যই জমিয়ে রাখা উচিৎ। এই জলের কিছুটা মাটিতে শুষে যায়, কিছুটা পুকুর বা হ্রদে জমা হয় এবং কিছুটা নদী-নালা দিয়ে বয়ে শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রে চলে যায়।

যে সমস্ত শস্যের মূল মাটির নীচে বেশী দূর পর্য্যন্ত যায় না তাদের

১৮নং চিত্র

বারি চক্র
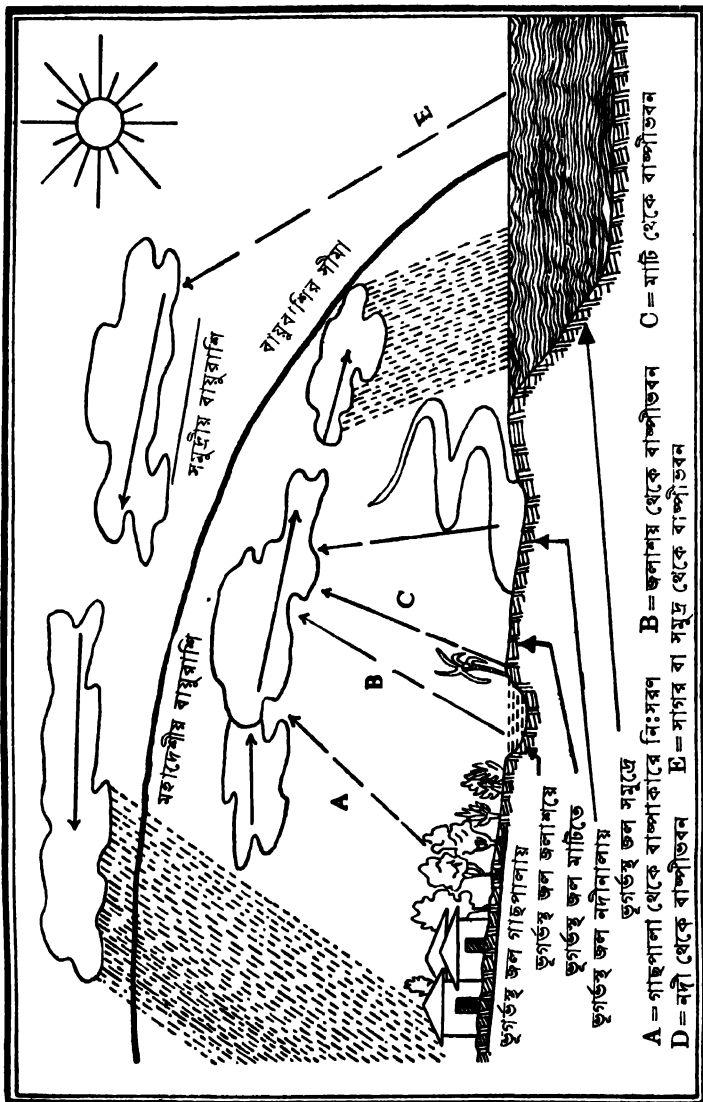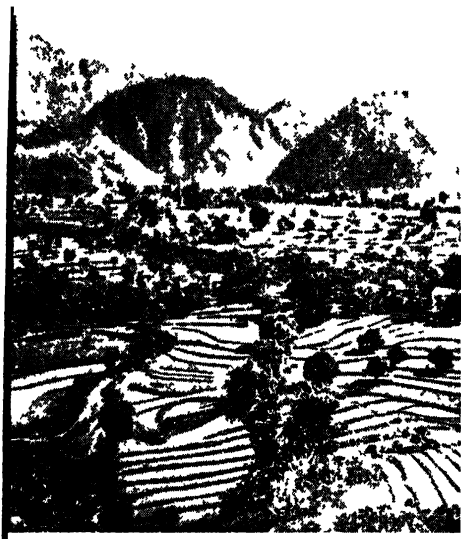
প্লেট ২৬
উপত্যকার কৃষিভূমিতে সিঁড়ির মত টেরেসিং
সিরখাদ অববাহিকা (১০০নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
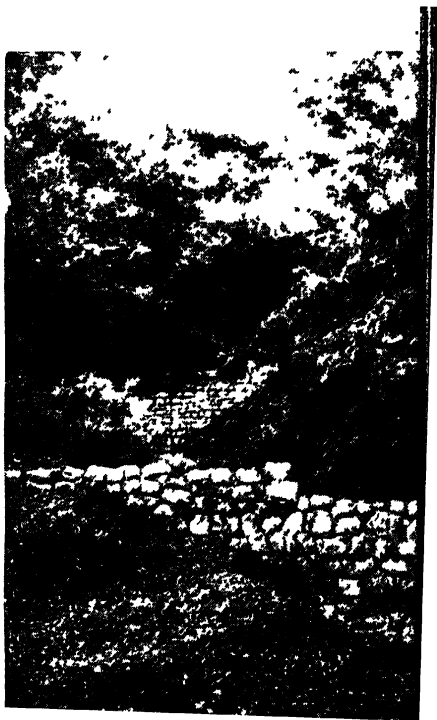
প্লেট ২৭
হিমাচল প্রদেশে আলিখাদ অববাহিকায় গাছপালা
পুনরোদ্গমের জন্য খাদ ও নালা প্রতিরোধকারী
বাঁধ সমূহ (১০৩নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ২৮ —ডুন ভ্যালিতে ভাইনখালা জলস্রোত, গাছপালা সমন্বিত সঞ্চিত প্রস্তর খণ্ডগুলি দ্বারা ক্ষয়িষ্ণু কূল কতকাংশে তার সহিত রক্ষিত হচ্ছে (১০৫নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ২৯—সুকেতি খাদে তারের জাল বসানো প্রাচীর—সুকেত বন বিভাগ

(১০৫নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৩০—পাহাড়ের খাড়াই ঢালে বিভিন্ন ফসলের “পডু” চাষের পরিমাণ দেখানোর জন্য আলোকচিত্র (১০৭নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৩১--উড়িষ্যার কোতাপুর জেলায় উপজাতিদের দ্বারা “পডু” চাষের ফলে নগ্ন একটি পাহাড়। কাজুবাদাম ও সিসাল গাছ লাগিয়ে বন সৃষ্টি করা হয়েছে (১০৭নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

অধিকাংশই উপরিতলের মাটি থেকে জল সংগ্রহ করে। জল চুঁইয়ে মূল অঞ্চলের নীচে চলে গেলে তা শস্যের পক্ষে অপচয় বিশেষ। অবশ্য এর কিছুটা জল মাটির কণাগুলিদ্বারা তৈরী সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়ে উপরে উঠে আসতে পারে।

উপরিতলের জল বলতে বুঝায় নদী ও হ্রদের জল, যা মানুষ খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারে। এই জলের জন্য মাটি খনন করার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি বড় বড় নদী জলের বেশ ভাল উৎস। আবার কতকগুলি নদীতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণ জল থাকে, কিন্তু খরার সময় জল প্রায় থাকে না বললেই চলে। এইরূপ নদীগুলিতে বাঁধ তৈরী করে নদীর উজানের দিকে জল ধরে রাখা যেতে পারে বা জমিয়ে রাখা যেতে পারে। নগ্ন ভূমির উপর দিয়ে জল খুব দ্রুত গড়িয়ে যায় এবং ভূমির ক্ষয় সাধন করে। কিন্তু গাছপালা বা ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমির উপর দিয়ে জল খুব আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে বনাঞ্চলের মাটি স্পঞ্জের মত জলকে শুষে নেয়। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে নীচের শিলাস্তরে বাঁধা না পাওয়া পর্য্যন্ত জল ক্রমাগত শুষে মাটিতে চলে যেতে থাকে। শিলার এই শক্ত স্তর জলকে আর বেশীদূর নীচে যেতে দেয় না। কোথাও কোথাও এই শিলাস্তর ভূ-পৃষ্ঠের নীচে কয়েক ফুটের মধ্যেই থাকে আবার কোথাও এর অবস্থান কয়েক শত ফুট নীচেও দেখা যায়। জল এসে এই শিলাস্তরে জমা হয়ে ভূগর্ভস্থ জলের (Ground water) সৃষ্টি করে। এই ভূগর্ভস্থ জল ছোট ছোট শিলাদ্বারা তৈরী শূণ্য স্থানগুলিকে পূর্ণ করে রাখে এবং কোনও কোনও জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলস্রোতের সৃষ্টি করে। এই ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের জন্য মাটির খনন প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের ঢালু দিকে এই জল প্রবাহিত হয়ে পুকুর, নদী, হ্রদ বা সাগরে গিয়ে পড়ে।

মাটির জলের অপচয় নির্ভর করে মাটির জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতার উপর। মাটির এই ক্ষমতা আবার রন্ধ্রপরিসরের আকার এবং খনিজ ও জৈব কলয়েডের প্রকৃতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

মাটির জল তিন প্রকারের, যথা—অভিকর্ষীয় জল (gravitational water) এই জল অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে বড় আকারের রন্ধ্র পরিসর দিয়ে নীচের দিকে চলে যায়; কৈশিক জল (capillary water), এই জল মাটির সূক্ষ্ম রন্ধ্রপরিসরের মধ্যে থাকে, এবং আকর্ষীয় জল (hygroscopic water), এই জল মাটির কণার চার দিকে খুব পাতলা আবরণের ন্যায় দৃঢ় ভাবে আটকে থাকে।

দ্রবণীয় লবণের স্থানান্তরণের জন্য প্রধানতঃ অভিকর্ষীয় জলই দায়ী এবং এই জল উদ্ভিদের পক্ষে সহজ লভ্য। অপ্রবেশ্য মাটিতে অভিকর্ষীয় জল উদ্ভিদ মূলের শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে উদ্ভিদের ক্ষতি করে। কৈশিক জল সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলি দিয়ে চলাচল করে মাটির প্রোফাইলে (profile) জলের সমতা বজায় রাখে। বায়ু থেকে জল মাটির কণার গায়ে এবং সূক্ষ্ম রন্ধ্রপরিসরে আটকে গিয়ে আকর্ষীয় জলের সৃষ্টি করে এবং মাটি ও আবহাওয়া মণ্ডলের মধ্যে স্থিতাবস্থা না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে অতিরিক্ত জল নীচে নেমে যাওয়ার পর যখন জলের নিম্ন-গতি যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়, তখন যে পরিমাণ জল মাটিতে থাকে তাকে বলা হয় মাটির ফিল্ড ক্যাপাসিটি (Field capacity), পর্য্যাপ্ত জলের অভাবে যখন গাছ ঢলে পড়ে তখন মাটিতে যে পরিমাণ জল থাকে তাকে বলা হয় মাটির জলের উইল্‌টিং কোয়্রফিসিয়েন্ট (wilting cofficient)। শস্য উৎপাদনে জলের এই সঙ্কট মাত্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ মাটির জলের পরিমাণকে কখনই এই সীমার নীচে চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

সেচ যুক্ত কৃষিকার্য্যে জলের পরিমিত ব্যবহারের জন্য মাটির জলের পরিমাণ ফিল্ড ক্যাপাসিটি ও উইলটিং কোয়ফিসিয়েন্ট এর মাঝামাঝি অবস্থায় রাখা উচিত।

মাটিকে একটা বিশেষ গভীরতা পর্য্যন্ত সিক্ত করতে হলে কতটা জল লাগবে, তার তুলনামূলক পরিমাণ ১৯নং চিত্রে দেখানো হল।

১৯ নং চিত্র

সাধারণ মাটিকে একটা বিশেষ গভীরতা পর্য্যন্ত সিক্ত করতে যতটা জল লাগবে তার তুলনামূলক পরিমাপ
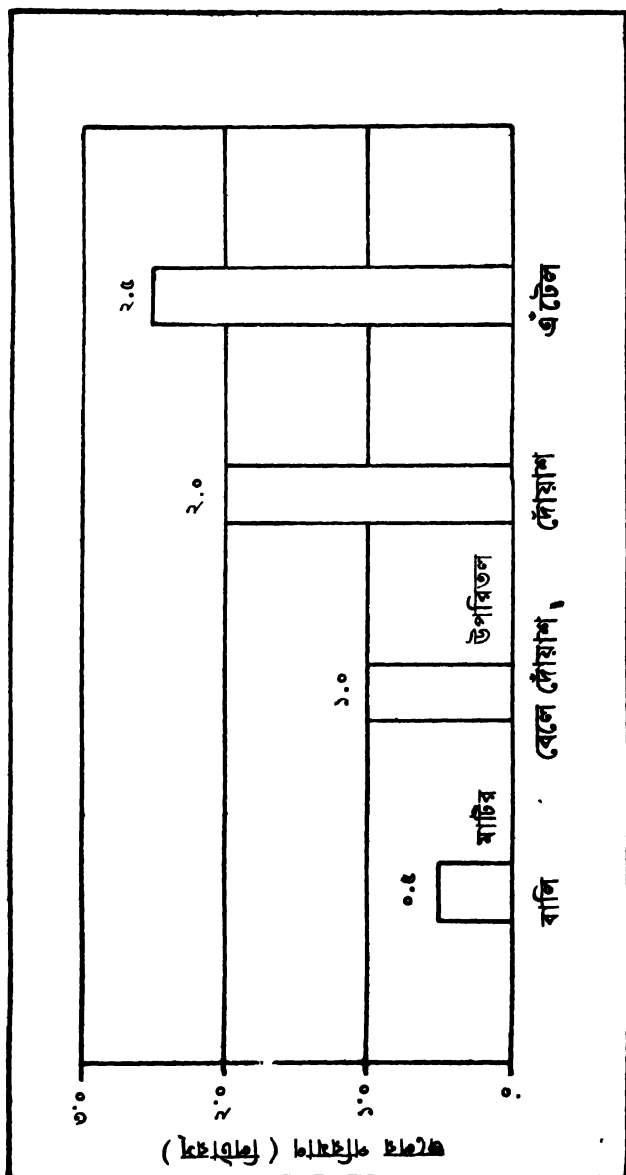
শুষ্ক অঞ্চলের চাষের মূল নীতি হল কণ্টুর বরাবর বাঁধ বা টেরেস্ তৈরী করে যতটা সম্ভব জল মাটিতে ধরে রাখা, যাতে পরে শস্য উৎপাদনে এই জল কাজে লাগে। কাদার কণাগুলি দৃঢ় ভাবে জলকে আটকে রাখে। কিন্তু উদ্ভিদ-মূলের শোষণ শক্তির জন্য এই জল উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হয়। তাছাড়া, সহজ প্রবেশ্য মাটিতে জল নীচে চলে গিয়ে জলপীঠকে উপরে উঠে আসতে সাহায্য করে।

একাদশ অধ্যায়

ভারতবর্ষের কৃষিভূমি-সম্পদ

কৃষির উপযোগী ভূমির পরিমাণ

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ৩২৬.৩ মিলিয়ন হেক্টরস্ এবং কৃষির উপযোগী ভূমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ (বনভূমি ছাড়া) নিম্নলিখিত-রূপ (১৯৬০— অঙ্ক, সাময়িক)।

তালিকা—৭

	হেক্টরস্ (মিলিয়ন)
চাষভূক্ত মোট জমি	১৩২.৮
বর্ত্তমান পতিত জমি	১১.৮
বর্ত্তমান পতিত জমি ছাড়া অন্যান্য পতিত জমি	১১.২
পতিত জমি ছাড়া চাষযোগ্য নষ্ট জমি	১৯.২
মোট	১৭৫.০

বর্ত্তমান পতিত জমি, বর্ত্তমান পতিত জমি ছাড়া অন্যান্য পতিত জমি, পতিত জমি ছাড়া চাষযোগ্য নষ্ট জমি এর কোনটাই আশু ব্যবহারোপযোগী নয়। উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে এই সমস্ত জমির উপযোগীতা নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে।

যদি এই সমস্ত জমিগুলিকেও কৃষির উপযোগী জমির মধ্যে ধরা হয়, তবে আমাদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ হয় ০.৪০ হেক্টরস্। মোট চাষভূক্ত ১৩২.৮ মিলিয়ন হেক্টরস্ জমির মধ্যে ১০ মিলিয়ন হেক্টরস্ জমিতে মেস্তা, পাট, তুলা, চা, কফি, রবার, তামাক ইত্যাদি বানিজ্যিক ফসলের চাষ হয়।

আমাদের বার্ষিক ২.১৫ শতাংশ হারে লোক সখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নততর স্বাস্থ্য-বিধি ও প্রতিষেধক ঔষধ পত্রাদির জন্য এই জন্মহার বৃদ্ধি আরও কিছুদিন ধরে চলবে; যদিও জনগণের মধ্যে উন্নততর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃদ্ধির হার হয়ত কমতেও পারে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহরাঞ্চল ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। মাথাপিছু চাষভূক্ত জমির উপর এর প্রতিফলন নিম্নে ৮ নম্বর তালিকায় দেখানো হল।

তালিকা—৮

আদমসুমারীর বৎসর	বর্ত্তমান ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধায় (মিলিয়ন হিসেবে)	মাথাপিছু চাষভূক্ত জমির পরিমাণ (হেক্টরস্)
১৯২১	২৪৮	০.৪৪ (১.০৯ একর)
১৯৩১	২৭৬	০.৪২ (১.০৪ একর)
১৯৪১	৩১৩	০.৩৮ (০.৯৪ একর)
১৯৫১	৩৫৭	০.৩৪ (০.৮৪ একর)

ভূমির ব্যবহার

ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারের মূল নীতি তিনটি : প্রথমতঃ, জাতীয় স্বার্থে যতদূর সম্ভব ভূমির পূর্ণ ব্যবহার; দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষে অনেক ক্ষেত্রেই ভূমির বহুবিধ ব্যবহার সম্ভব ও কাম্য ; তৃতীয়তঃ, নষ্ট ভূমির বিলোপ সাধন, কারণ জনবহুল দেশে কোনও না কোনও প্রকারে প্রত্যেক ভূমিখণ্ডেরই ব্যবহার সম্ভব।

আধুনিক সহর পরিকল্পনাগুলিতে সমতল ও উন্মুক্ত ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন কাজের জন্য ভূমির প্রতিযোগীতামূলক চাহিদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্দ্ধমান সহরগুলি গৃহ, রাস্তাঘাট ও আমোদ প্রমোদের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী মূল্যবান জমিগুলিকে গ্রাস করছে। সেচ পরিকল্পনা অঞ্চলগুলিতে দোফসলী চাষ ছাড়া

বর্ত্তমানে আর অতিরিক্ত জমিকে চাষের আওতায় আনার কোনও সুযোগ নেই। এই অবস্থায়, যে দেশে উৎপাদনশীল জমির পরিমাণ কম সেখানে উচ্চ ক্যালোরী সম্পন্ন ও উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য দরকার উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা, রাসায়নিক সার ও উন্নতমানের বীজের ব্যবহার, ফসল রক্ষা ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত ফসল উৎপাদন নীতি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাগুলির প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্যে পৌছানো না গেলেও ফল মোটামুটি ভালই হয়েছে। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০ এই দশ বৎসরে কৃষির উৎপাদন গড়ে বার্ষিক ৩.৫ শতাংশ করে বেড়েছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়েও (বার্ষিক ২.১৫ শতাংশ) বেশী হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উৎপাদন বৃদ্ধির অর্দ্ধেকেরও বেশী পড়ে থাকা প্রান্তিক মানের চাষযোগ্য জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য হয়েছিল।

ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের পুষ্টি উপদেষ্টা কমিটি (১৯৪৪) একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য নিম্নলিখিত খাদ্য তালিকা সুপারিস করেছিলেন:

তালিকা—৯

খাদ্য	ওজন (গ্রাম)
দানা শস্য	৩৯৭ (১৪ আউন্স)
ডাল	৮৫ (৩ ,,)
ঘি ও তেল	৫৭ (২ ,,)
দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	২৮৪ (১০ ,,)
মাছ, মাংস ও ডিম	১১৩ (৪ ,,)
চিনি ও গুড়	৫৭ (২ ,,)
শাক শব্জী	২৮৪ (১০ ,,)

গড়ে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের ২৭৫০ ক্যালোরি প্রয়োজন বলে ধরা যেতে পারে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ের জন্য প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দানাজাত খাদ্যের বরাদ্দ নিম্নে দেওয়া হল। এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের মোট খাদ্যের চাহিদা পরিমাপ করা হয়েছে।

তালিকা—১০

পরিকল্পনা	প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিব দানাজাত খাদ্যের চাহিদা (গ্রাম)
প্রথম পরিকল্পনা	৩৯৭ (১৪ আউন্স)
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৪৫৪ (১৬ আউন্স)
তৃতীয় পরিকল্পনা	৪৯৬ (১৭.৫ আউন্স)

জাতীয় চাহিদা

দৈনিক মাথাপিছু ৪৯৬ গ্রাম (১৭.৫ আউন্স) দানা-শস্যের খরচ ধরলে ১৯৫৯ সালের লোক সংখ্যার জন্য (৪৩৮ মিলিয়ন) শুধু খাদ্য বাবদই ৭২.১৭ মিলিয়ন টন দানা-শস্য ও ডালের প্রয়োজন ছিল। এর সঙ্গে বীজ, গবাদি পশুর খাদ্য ও অপচয়ের জন্য মোট উৎপাদনের আরও ১২½ শতাংশ ধরা যেতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া, দৈব-দুর্বিপাক ইত্যাদির বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক মজুদ হিসেবে আরও অতিরিক্ত ৯.৫৫ মিলিয়ন টন (৯.৪ মিলিয়ন টন) ধরে রাখা উচিৎ[১]। বার্ষিক ২.১৫[২] শতাংশ লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরে খাদ্য, বীজ, অপচয় ও সতর্কতামূলক মজুদ ইত্যাদির জন্য দানা-শস্য ও ডালের অনুমানিক চাহিদার পরিমাণ ৬ নম্বর পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে। এই পরিমাপে শিল্পে দানা-শস্যের চাহিদাকে ধরা হয়নি; আবার এর মধ্যে আলু

[১] ভারতবর্ষের খাদ্যাভাবের উপর ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ১৯৫৯ সালের কৃষি উৎপাদন দলের রিপোর্ট অনুযায়ী।

[২] পরিসংখ্যানবিদরা আরও অধিক জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি অনুমান করেন।

ও অন্যান্য খন্দ শস্যকেও ধরা হয়নি। অথচ, এইগুলি শর্করাজাতীয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামে এগুলিকে মজুদ করে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাতীয় ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা পরিষদ(১৯৫৫-৫৬)সালের মধ্যে মাথাপিছু দৈনিক দানাজাত খাদ্যের পরিমাণ ১৮ আউন্স পর্য্যন্ত বাড়াবার প্রস্তাব করেছেন। এর ফলে খাদ্যের চাহিদার চাপ ক্রমশঃ বেড়েই চলবে।

১৯৪৯-৫০ সালে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে (১৯৫৫-৫৬), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে এবং পরবর্ত্তী (১৯৫৫-৫৬) সাল পর্য্যন্ত বার্ষিক বিভিন্ন দানা-শস্য উৎপাদনের সর্ব্বভারতীয় অগ্রগতি ৮ নম্বর পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে। বর্ত্তমানে আমাদের দানাজাত খাদ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে যে ফারাক তা পূরণের জন্য খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দানাজাত খাদ্যের চাহিদা বাড়বে। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে(১৯৫৫-৫৬)সালে (চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে) দানাজাত খাদ্যের চাহিদা হবে ১২০ মিলিয়ন টন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বনভূমি—সম্পদ

প্ল্যানিং কমিশনের পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা বিভাগ প্রদত্ত সাময়িক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬০ সালে ভারতবর্ষের মোট বনভূমির আয়তন ৫৬.১ মিলিয়ন হেক্টরস্। এটা দেশের মোট ভৌগোলিক আয়তনের ১৭.২ শতাংশ। মোট ভৌগোলিক আয়তনের সঙ্গে বনভূমির আয়তনের অনুপাত সব রাজ্যে সমান নয়।

বনভূমির অবনতি

পশুচারণ হেতু বনভূমির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। গ্রামের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী পশুচারণ করা হয় এবং সাধারণত বনের কিনারাগুলি খুব বেশী রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পশুচারণ যে শুধু সমভূমিগুলিতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, হিমালয় আলপাইন পর্ব্বতের ২৪০০-২৭০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত তৃণক্ষেত্রগুলিতেও গ্রীষ্মকালে পশুচারণ করা হয়। যাযাবর প্রকৃতির ছাগল ও ভেড়ার পাল বনাঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। প্রকৃতপক্ষে, মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণ বনভূমিগুলিকে নিকৃষ্ট করে তোলে এবং তারপর সেটাও লোপ পায়। পশুচারণের প্রত্যক্ষ কুফল ছাড়াও গবাদি পশুর জন্য ঘাস ও গাছপালা কেটে নেওয়ায় বনভূমিগুলি পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, ছাগল, ভেড়া ও উট প্রভৃতি পশু যথেচ্ছভাবে কচি গাছপালাগুলি খেয়ে ফেলায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ভূমি নগ্ন হয়ে পড়ে এবং ফলে ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও পাঞ্জাবের কতকগুলি মরুভূমিপ্রায় অঞ্চলের সৃষ্টি এই সমস্ত গৃহপালিত পশুদ্বারা কচি গাছপালা ধ্বংশের কুফল বিশেষ। গৃহপালিত পশু ছাড়াও সম্বর, নীলগাই, হরিণ ইত্যাদি তৃণভোজী বন্য প্রাণীদ্বারাও বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যথেচ্ছভাবে বনের গাছপালা কেটে নিলে মাটি সৃষ্টির ক্রমবিকাশে

বিঘ্ন ঘটে এবং ফলে স্থানীয় প্রাকৃতিক গাছপালার মানের অবনতি ঘটে। যাযাবর চাষ পদ্ধতিতে আগুন দিয়ে বনের গাছপালা পুড়িয়ে ফেলায় মাটি পুড়ে শুকিয়ে যায় এবং অন্তত কয়েক বৎসর ধরে মাটিতে কোনও গাছপালা জন্মাতে পারে না।

বনভূমির পরিচর্য্যা

কার্য্যত এখন পর্য্যন্তও চাষভূক্ত জমির মত নিবিড় ভাবে বনভূমির পরিচর্য্যা সম্ভব হয়নি। এর প্রধান কারণ, কাঠের যে দাম তাতে একর প্রতি খুব বেশী টাকা বিনিয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সময় মত পর্যাপ্ত জলের সংস্থান বৃক্ষ উৎপাদকের প্রধান সমস্যা ; কারণ, বেশীর ভাগ জলই আসে যখন গাছ তা গ্রহণ করতে পারে না। অনেক সময় নীচু ভূমি ও শক্ত স্তর যুক্ত ভূমিতে জল নিষ্কাশনের সমস্যা দেখা দেয়। অবশ্য, কতকগুলি সীমাবদ্ধ স্থানেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে, জলের অভাবই জমিতে বৃক্ষের চারাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আগাছার বাষ্প নিঃসরণ কমানো চারাগাছগুলির জন্য মাটির জল বৃদ্ধির একটি কার্য্যকরী পন্থা। আগাছাগুলিকে একটি একটি করে তুলে ফেলা যেতে পারে বা 2-4-D ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে মেরে ফেলা যেতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় বনজাত উদ্ভিদের রোগ মাটির অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক জড়িত। জল নিষ্কাশন ব্যাহত হলে গাছে রোগ জন্মায়, এবং জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থায় গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। বনভূমির উর্ব্বরতা বজায় রাখার সবচেয়ে কার্য্যকরী পন্থা হল উপরিতলের মাটিতে হিউমাস গড়ে তোলা। হিউমাস মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং উপরের মাটিতে খনিজ মৌলগুলিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। হিউমাসের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী জীবাণুঘটিত জৈব প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং এই হিউমাস সঞ্চিত পুষ্টি-বস্তুর আধার হিসেব কাজ করে। রাসায়নিক সার সাধারণত মাটিতে দেওয়ার চেয়ে গাছের পাতায় ছিটিয়ে দেওয়া

অপেক্ষাকৃত ভাল। অনেক অপ্রধান পুষ্টিবস্তুগুলির খুব সামান্য পরিমাণ ব্যবহারেই গাছের বৃদ্ধিতে বেশ সুফল পাওয়া যায়। সময় সময় মাটি শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং এই ভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে। যে মাটিতে বা যে সময়ে মাটি শক্ত হয়ে জমাট বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে সেই মাটিতে বা সেই সময়ে ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

নগ্ন বনভূমির উর্বরতা গড়ে তোলার জন্য কোনও কোনও জায়গায় জ্বালানী কাঠ, কড়িকাঠ, ফলের গাছ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি লাগানো হয়েছে। এই ভাবে মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব উত্তর প্রদেশে সেগুন বৃক্ষের চাষ, মাদ্রাজে ক্যাজুরিনার চাষ, দক্ষিণ ভারতে ইউক্যালিপ্‌টাসের চাষ ইত্যাদি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তৃণভূমি

ভারতবর্ষে প্রায় ১৩.৫ মিলিয়ন হেক্টর (৩৪ মিলিয়ন একর) তৃণভূমি আছে। রাজ্যওয়ারী তৃণভূমির পরিমাণ পরবর্তী তালিকায় (তালিকা-১১) দেখানো হল।

তালিকা—১১[১]

ভারতবর্ষের রাজ্যওয়ারী তৃণভূমির পরিমাণ

		১৯৫৯—৬০ (হাজার হেক্টর)
(১)	অন্ধ্র প্রদেশ	১২২০
(২)	আসাম (নেফা সহ)	১৫২
(৩)	বিহার	২০৫
(৪)	মহারাষ্ট্র (গুজরাট সহ)	২৫১১
(৫)	জম্মু ও কাশ্মীর	১৪৪
(৬)	কেরালা	৪৫
(৭)	মধ্য প্রদেশ	৩৪৮৪
(৮)	মাদ্রাজ	৩৫৬
(৯)	মহীশূর	১৭৩২
(১০)	উড়িষ্যা	৭২৮
(১১)	পাঞ্জাব	১২৪
(১২)	রাজস্থান	১৬২২
(১৩)	উত্তর প্রদেশ	৪০

[১] প্রাপ্তিসূত্র: ৪২ তম এ্যানুয়াল ইসু অফ ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিকস্, ১ম খণ্ড (১৯৫৯-৬০ সালের কৃষি বিষয়ক খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর, পৃঃ ২২-২৬)

ভারতবর্ষের রাজ্যওয়ারী তৃণভূমির পরিমাণ

		১৯৫৯—৬০ (হাজার হেক্টর)
(১৪)	পশ্চিম বঙ্গ	৬৮৬[২]
(১৫)	দিল্লী	৫
(১৬)	হিমাচল প্রদেশ	১১১০
(১৭)	মনিপুর	২২[২]
(১৮)	ত্রিপুরা	৫৬
(১৯)	আন্দামান ও নিকোবর	৪
(২০)	লক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিদিভি দ্বীপপুঞ্জ	—
	মোট	১৩৫৩৮

গ্রাম থেকে সহজ .গম্য তৃণক্ষেত্রগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণ করা হয় এবং প্রতি একরে যতগুলি পশুপালন সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশী পশু পালিত হয়। এর ফলে যে জমিতে এক কালে খুব ভাল সুস্বাদু ঘাস জন্মাত সেখানে অনেক কম স্বাদু মোটা ঘাস ও গুল্ম জাতীয় গাছ জন্মায় এবং এগুলি পশুর পুষ্টির পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। অতিরিক্ত পশুচারণ ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি করে। তৃণক্ষেত্রের সামর্থ্য অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমে পশুচারণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই প্রথা অনুযায়ী গোটা তৃণক্ষেত্রটিকে চার বা তদোধিক ভাগে ভাগ করা হয়। তারপর প্রত্যেক ভাগে পর্য্যায়ক্রমে পশুচারণ করা হয়, যাতে যে অংশে পশুচারণ করা হবে না সে অংশ বিরাম পায় এবং ঘাস জন্মাতে পারে। এইভাবে বছরে সাত আট মাস পর্য্যায়ক্রমে পশুচারণ করে তৃণভূমির উর্বরতা গড়ে তোলা সম্ভব।

---

[২] তৃণভূমি—বিভিন্ন বৃক্ষশস্য ও ঝোপ জাতীয় গাছ গাছড়া সহ।

এ দেশে সংরক্ষিত তৃণক্ষেত্রগুলি সাধারণত বর্ষাকালে পশুচারণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু বর্ষার পর পরিণত ঘাসগুলিকে পশুর খাদ্যের জন্য কেটে নেওয়া হয় এবং তারপর ঐ জায়গায় পশু চরানো হয়। গ্রামবাসীরা কিন্তু একই তৃণক্ষেত্রে বরাবর অনেক-দিন ধরে পশু চরায় এবং এর ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ভীষণ ভাবে কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে, পরিমাপ করে দেখা গেছে যে এই ভাবে উৎপাদিত মোট পশুখাদ্যের পরিমাণ সংরক্ষিত তৃণক্ষেত্রে উৎপন্ন খাদ্যের পাঁচগুণেরও বেশী।

প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে পুষ্ট প্রচুর পরিমাণ পশুখাদ্য জন্মাতে হলে অনুর্বর তৃণক্ষেত্রগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

চতুর্দশ অধ্যায়

মাটির পরিচর্য্যা

যে সমস্ত উপায়ে মাটি থেকে, বিশেষ করে চাষের জমি থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি-বস্তুগুলি নষ্ট হয়ে যায় তার কতকগুলি এখানে আলোচনা করা হল।

ফসলের মাধ্যমে পুষ্টি-বস্তুর অপসারণ

জমি থেকে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ পুষ্টি-বস্তু অপসারিত হয় কেটে নেওয়া ফসলের মাধ্যমে। যেহেতু, কৃষির মূখ্য উদ্দেশ্যই হল ফসল উৎপাদন, অতএব পুষ্টি-বস্তুর এই ক্ষয় অপরিহার্য্য।

ধৌতক্রিয়ায় পুষ্টি-বস্তুর অপচয়

উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যমৌলগুলির জলে দ্রবণীয় অংশ সহজেই বৃষ্টি বা সেচের জলে ধুয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের মত অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত জলবায়ুতে এই ধরণের অপচয় অবশ্যম্ভাবী। তবে, জলে দ্রবণীয় পুষ্টি-বস্তুর পরিমাণ মাটিতে কখনোই খুব বেশী থাকে না বলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়। এঁটেল মাটি অপেক্ষা বেলে মাটিতে, এবং গাছপালায় ঢাকা মাটি অপেক্ষা অনাবৃত মাটিতে এই ধৌত ক্রিয়া বেশী হয়। দেখা গেছে যে গড়ে ধৌত ক্রিয়ায় অপসারিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ ফসলদ্বারা অপসারিত নাইট্রোজেনের এক দশমাংশের বেশী নয়। পটাসিয়ামের অপসারণ নাইট্রোজেন অপেক্ষা অনেক কম এবং ফস্‌ফরাসের অপসারণ অতি সামান্য।

ভূমিক্ষয়ে পুষ্টি-বস্তুর অপচয়

জল বা বায়ুদ্বারা মাটির অপসারণকে বলা হয় ভূমিক্ষয়। এই ভূমিক্ষয় মারাত্মক হলে জমির উপরিতলের প্রচুর পরিমাণ মাটি বা এমনকি প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই ভাবে মাটি নষ্ট

হলে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এর পুষ্টি-বস্তুগুলিও নষ্ট হয়ে যাবে। পুষ্টি-বস্তুর অপচয় আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি জমির উপরিতলের এক দশমাংশ মাটি ধুয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তবে উপরিতলের মাটির পুষ্টি-বস্তুর এক দশমাংশের অনেক বেশী পরিমাণ নষ্ট হবে। কারণ, এই পুষ্টি-বস্তুগুলি প্রধানতঃ মাটির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণাগুলির মধ্যে থাকে এবং এই ক্ষুদ্র কণাগুলিই আত সহজে প্রথমে ধুয়ে নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু ভূমিক্ষয়ে জমি থেকে সরাসরি মাটি অপসারিত হয়, অতএব নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাসিয়ামের অপচয়ও ঠিক ঐ একই অনুপাতে হয়ে থাকে।

ক্ষয় ক্রিয়ায় পুষ্টি-বস্তুর অপচয়ের পরিমাণ ও গুরুত্ব নির্ভর করে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণের উপর। ক্ষেত্র-বিশেষে এটা খুব বেশী, কম বা অতি সামান্য, সব রকমই হতে পারে। ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ নির্ভর করে জমির ঢাল, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ও তার স্থায়ীত্ব, বায়ুর গতিবেগ, জমির ফসল এবং সব শেষে মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর। এই সমস্ত কারণে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ প্রতি বৎসর এক সমান থাকে না। অতএব, এই প্রক্রিয়ায় অপসারিত পুষ্টি-বস্তুর সঠিক গড়পড়তা হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়।

মাটির পুষ্টি-বস্তুর অপসারণ

পরিমাপ করে দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৪.২ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন (N), ২.১ মিলিয়ন টন ফস্ফরিক এ্যাসিড (P_2O_5) ৭.৩ মিলিয়ন টন পটাস ও ৭.৮ মিলিয়ন টন লাইম ফসলের মাধ্যমে অপসারিত হয়। এর বেশ কিছুটা পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সারের মাধ্যমে পরিপূরণ করা প্রয়োজন।

মাটির উৎপাদন ক্ষমতা

মাটির ফসল জন্মানোর ক্ষমতাকে বলে এর উৎপাদন ক্ষমতা। এই উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে কতকগুলি উপাদানের উপর:

মাটির উর্বরতা, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, জমির ঢাল, ভূগর্ভস্থ স্তর বা শিকড় বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক শক্ত স্তরের অবস্থিতির দূরত্ব, চাষের পদ্ধতি ইত্যাদি।

এই উপাদানগুলির সবকটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে যে কোন একটির জন্য শস্যের উৎপাদন কমে যেতে পারে ; আবার সময় সময় হয়ত একাধিক উপাদান এর জন্য দায়ী হয়। যা হোক, জলবায়ু (জল সরবরাহ সমেত) অনুকূল থাকা সত্ত্বেও মাটির নিম্ন-মানের উর্বরতার জন্য ফসলের ফলন কমে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক অবস্থায় জমিতে যে উদ্ভিদ জন্মায় তার সবটাই পুনরায় মাটিতে যুক্ত হয়। ফলে মাটির উর্বরতার কোনও অবনতি ঘটে না। অকর্ষিত বন বা তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, যেখানে কোন দিনই মানুষের ছোঁয়া পড়ে নি, সেখানকার অবস্থা ঠিক এই রকম। এমনকি, প্রথম দিকে মাটি যদি খুব উর্বরা নাও হয়, এই রকম অবস্থায় থাকলে উর্বরতা ক্রমে বেড়েও যেতে পারে।

যখন কোনও জমিকে চাষের আওতায় আনা হয়, তখন ঐ জমিতে উৎপন্ন শস্যের একাংশ এবং সময় সময় প্রায় সবটাই মানুষের বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য কেটে নেওয়া হয়। এই ভাবে উৎপন্ন শস্যের অপসারণ যদি ক্রমাগত চলতে থাকে এবং ফসলদ্বারা অপসারিত পুষ্টি-বস্তুর ঘাটতি পূরণ করা না হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত মাটির উর্বরা শক্তি কমে যেতে বাধ্য। যত বেশী পরিমাণ এবং বেশী দিন ধরে জমিকে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহার করা হবে মাটির উর্বরা শক্তিও সেই অনুপাতে লোপ পাবে।

ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার অগ্রগতি

১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্য্যন্ত ধান ও গমের হেক্টর প্রতি ফলন ক্রমশ বেড়েছিল (পরিশিষ্ট ৮), কিন্তু ১৯৬০ থেকে এই ফলন প্রায় অপরিবর্ত্তিত রয়েছে। মনে হয় অনুকূল আবহাওয়া, উৎকৃষ্ট জাতের বীজ এবং কিছুটা জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের

জন্যই ঐ সময় ফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের সর্বত্র একর প্রতি ফলন সমান নয়। অবস্থান, জলের সংস্থান ও পরিচালন ব্যবস্থা অনুযায়ী ফলন কম বেশী হয়ে থাকে। আমাদের দেশের ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৭৩ কুইন্টাল (একর প্রতি ৪০০ পাউণ্ড) থেকে ৩৩.৬০ কুইন্টাল (একর প্রতি ৩০০০ পাউণ্ড)।

ভূমির উপযুক্ত ব্যবহার

মাটি থেকে পুষ্টি-বস্তুগুলির অপচয় কমানোর একটি উপায় হল অবস্থানুযায়ী জমিতে উপযুক্ত ফসলের চাষ করা। বিশেষ করে যেখানে ভূমিক্ষয় হেতু এই অপচয় হয়ে থাকে সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। অর্থাৎ, যেখানে জমির ঢাল অত্যধিক বা অন্য কোনও কারণে ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা খুব বেশী সেখানে জমিকে স্থায়ীভাবে গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্র বা অরণ্যের আওতায় রাখা উচিৎ। তাছাড়া, পশুচারণের মাত্রাও খুব সীমিত রাখা দরকার। ভারতবর্ষে ভূমির উপর অত্যধিক চাপের জন্য এই ধরনের ব্যবস্থাদি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি এবং সম্ভবত কখনই তা আশানুরূপ সম্ভব হবে না, তবুও যতটা সম্ভব এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। মধ্যপ্রদেশের চম্বল এলাকার মত জলস্রোতে বিশ্রীভাবে ক্ষত বিক্ষত অঞ্চলগুলির রক্ষার একমাত্র উপায় হল স্থায়ী অরণ্য বা তৃণক্ষেত্র গড়ে তোলা। তৃণক্ষেত্রগুলির ব্যবহার খুব সীমিত হওয়া দরকার। কারণ এই সমস্ত জমি ইতিমধ্যেই কৃষির অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষে আরও কতকগুলি অঞ্চল আছে যেখানে ভূমি চম্বল অঞ্চলের মত ততটা খারাপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, কিন্তু ক্রমশ ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। টেরেসিং (terracing), উদ্ভিজ আচ্ছাদন ও অন্যান্য নানাবিধ ভূমি-সংরক্ষণ ব্যবস্থাদির মাধ্যমে এই সমস্ত জমিগুলিকে রক্ষা করতে হবে। ভারতবর্ষে প্রচলিত পশুচারণ রীতিই খুব সম্ভবত ভূমিক্ষয়ের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এর ফলে ভূমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নগ্ন হয়ে পড়ে এবং ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

পর্য্যায় ক্রমে চাষ

অনেক দেশেই জমিতে বৎসরের পর বৎসর একই ফসল না লাগিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের ফসল একটির পর একটি পর্য্যায়ক্রমে লাগানো হয়। এই আবর্ত্তন পূর্ণ হতে তিন, চার বা পাঁচ বৎসর সময় লাগতে পারে এবং এর পর আবার সেই প্রথম ফসলটি নতুন করে লাগানো হয়। এই চাষ পদ্ধতি এক ফসলী চাষ অপেক্ষা অনেক কম নিবিড়। এমনিতে এর কতকগুলি সুবিধা আছে, কিন্তু আমাদের মত দেশে যেখানে খাদ্য শস্যের চাহিদা খুব বেশী, সেখানে কতকগুলি অসুবিধাও আছে। কারণ, এই চাষ পদ্ধতিতে কিছু সময়ের জন্য জমিকে খাদ্য শস্য উৎপাদন থেকে বিরাম দিতে হয়। অতএব, খুব সম্ভবত ভারতবর্ষে এর প্রচলনের সম্ভাবনা খুবই কম।

একটি ভাল পর্য্যায়ক্রমে চাষে বারসিম বা ক্লোভার জাতীয় শস্য অবশ্যই থাকবে। এই জাতীয় শস্যের বিশেষ গুণ এই যে এরা খুব ঘন হয়ে জন্মায় এবং পুষ্টি-বস্তুর ভূমিক্ষয় জনিত ক্ষয় রোধে এরা দানা শস্য অপেক্ষা অনেক বেশী কার্য্যকরী।

বিভিন্ন জাতের গাছের মধ্যে মূলের প্রকৃতিতে যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে। কতকগুলি গাছের মূল মাটির নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে যায়, আবার কতকগুলি আছে যাদের মূল উপরিতলের মাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কতকগুলি গাছের মূল চারিদিকে অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে, আবার কতকগুলির ঠিক তা হয় না। গম, যব বা ধান জাতীয় শস্য বছরের পর বছর একই জমিতে উৎপাদন করলে একই পরিমাণ অল্প মাটি থেকে পুষ্টি-বস্তুগুলি অপসারিত হয় এবং উপরিতলের মাটি ক্রমশ অনুর্বর হযে পড়ে। জমির উপরিতলের কয়েক ইঞ্চি মাটিকে বিরাম দিতে হলে মাটির গভীরে প্রবেশকারী ফসল পর্য্যায়ক্রমে চাষের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কারণ এই ফসলগুলি প্রধানত মাটির গভীরতর স্তর থেকে পুষ্টি-বস্তুগুলি সংগ্রহ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ভাবে উপরের কয়েক ইঞ্চি মাটিতে পুষ্টি-বস্তুগুলির পরিমাণ বেড়েও যেতে পারে। কারণ দীর্ঘ শিকড় যুক্ত

গাছগুলি মাটির নিম্নস্তর থেকে পুষ্টি-বস্তুগুলি শোষণ করে উপরের শিকড় ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে দেয়। তারপর গাছগুলি বড় হয়ে মরে যাওয়ার পর এদের শিকড় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ মাটিকে পুষ্ট করে তোলে।

শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদ (legumes)

পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডল মাটির নাইট্রোজেনের উৎস। এই বায়ুমণ্ডল কতকগুলি গ্যাসের মিশ্রণে তৈরী এবং এর শতকরা ৮০ ভাগ হল মৌলিক নাইট্রোজেন। নানা প্রক্রিয়ায় বায়ুর এই মৌলিক নাইট্রোজেন উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে জীবাণুদ্বারা মাটিতে নাইট্রোজেনের বন্ধন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত জীবাণুর এই ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, মীথোজীবি ও অমীথোজীবি। দুটিরই গুরুত্ব সমান, কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই আমাদের অলোচনার বিষয় বস্তু হবে। এই শ্রেণীর জীবানুগুলি কেবল শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদের সান্নিধ্যে থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। এই ভাবে নাইট্রোজেনের বন্ধন একটি সমবায় প্রক্রিয়া এবং এতে জীবা ু ও উদ্ভিদ দুই-ই অংশ গ্রহণ করে।

বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ সমেত ভারতবর্ষের বহু দেশীয় গাছ গাছড়া সিম জাতীয় এবং এদের ্যত্যেকেরই এই ক্ষমতা আছে। চাষ করা হয় এরূপ সিম জাতীয় ফসল সম্বন্ধে জানতেই আমাদের আগ্রহ বেশী। এই শ্রেণীর ফসলের মধ্যে ক্লোভারস্, ছোলা, মুগ, কলাই, সোয়াবিন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুকূল অবস্থায় এই ফসলগুলি হেক্টর প্রতি বৎসরে ৫৬ থেকে ১১২ কিলো-গ্রাম নাইট্রোজেন বায়ু থেকে সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে পারে। এই নাইট্রোজেনের প্রায় সবটাই গাছের মূল ও উপরিভাগে থাকে।

এই ফসলের সবটাই চাষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে গাছ যতটা নাইট্রোজেন বায়ু থেকে সংগ্রহ করে তার সবটাই মাটিতে যুক্ত হয়। তবে সাধারণতঃ মাটিতে নাইট্রোজেন ঠিক এই পরিমাণে

বৃদ্ধি পায় না। কারণ, ফসলের উপরিভাগের প্রায় সমস্তটাই গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে মাটিতে নাইট্রোজেন খুবই কম পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কারণ এতে গাছের শিকড়ের নাইট্রোজেন টুকুই শুধু মাটিতে থেকে যায়। গাছ যতটা নাইট্রোজেন বায়ু থেকে সংগ্রহ করে এর পরিমাণ তার ৫ থেকে ২৫ শতাংশ মাত্র। সর্ব্বাধিক নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য দুটি জিনিষের প্রয়োজন ঃ (১) ভাল জাতের ব্যাক্টেরিয়া ও উপযুক্ত প্রকারের জীবাণু মাটিতে অবশ্যই থাকতে হবে এবং (২) উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি-বস্তুগুলি মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে।

যদি সদ্য সদ্য জমিতে এই ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে তবে আশা করা যেতে পারে যে প্রয়োজনীয় জীবাণুগুলি মাটিতে থাকবে। তবে জীবাণুগুলি হয়ত অন্য সমস্ত জায়গা থেকে সংগৃহীত জীবাণু-গুলির মত কার্য্যক্ষম নাও হতে পারে। যদি অনেক দিন ধরে জমিতে ঐ বিশেষ ফসলটির চাষ করা না হয়ে থাকে, তবে বীজকে জীবাণুযুক্ত করে দিলে অর্থাৎ, বোনার পূর্বে উপযুক্ত রকমের জীবাণু বীজের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। বীজকে জীবাণুযুক্ত না করলে অনেক সময় সম্পূর্ণ শস্যহানি ঘটতে পারে। ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী না হলেও হয়ত ফসল জন্মাবে, কিন্তু নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ খুব কম হবে।

অন্যান্য পুষ্টি-বস্তুগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে শিম্বি জাতীয় গাছগুলি ভাল জন্মায় না। অধিকাংশ সিম জাতীয় উদ্ভিদেরই খনিজ মৌলগুলির, বিশেষ করে ফসফরাসের চাহিদা খুব বেশী। মাটিতে যদি এদের পরিমাণ কম থাকে তবে ভাল ফসল ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রযোজন হতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে সিম জাতীয় উদ্ভিদের প্রচুর পরিমাণ ফস্‌ফরাস ও পটাশের প্রয়োজন। অতএব, ফসলের উপরের অংশ কেটে নিলে এই পদার্থগুলি প্রচুর পরিমাণে মাটি থেকে অপসারিত হবে এবং হয়ত দেখা যাবে যে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধিজনিত

লাভের চেয়ে মাটি থেকে ফস্‌ফরাস ও পটাশ অপসারণ জনিত ক্ষতির পরিমাণই বেশী।

জমি পতিত রাখার প্রয়োজনীয়তা

কোন কোন দেশে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মাটির উর্বরা শক্তি পরিপূরণের জন্য একাধিক বৎসর জমিকে পতিত রেখে তাতে ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু চরানো হয়। ঘন বসতিপূর্ণ ভারতবর্ষে এই প্রথার প্রচলন সম্ভব নয়। নীচের তালিকা (তালিকা নং ১২) থেকেই এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে।

তালিকা—১২

দেশ	প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক সংখ্যা
পৃথিবী	১৬.৬
এশিয়া	৪৯.০
উত্তর আমেরিকা	৯.৫
অষ্ট্রেলিয়া	১.১
ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রাশিয়া	৯.০
চায়না	৪৭.৬
ইউরোপ (ইউরোপীয় সোভিয়েট রাশিয়া বাদে)	৪০.৯
আফ্রিকা	৬.৯
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌ অফ আমেরিকা	২০.৯
দক্ষিণ আমেরিকা	৬.৪
ভারতবর্ষ	১২০.৫

মিশ্র চাষ

একই জমিতে একাধিক ফসলের এক সঙ্গে চাষ করার পদ্ধতিকে

বলে মিশ্র চাষ। এদের মধ্যে একটি থাকে মুখ্য ফসল। কোন্ ফসলের অনুপাত কি হবে সেটা নির্ভর করে স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুর উপর। সেচ ও সেচবিহীন এই দু'রকম চাষেই মিশ্র চাষ প্রথা চালু আছে।

মাটির উর্বরা শক্তি রক্ষায় মিশ্র চাষের উপকারীতা পর্য্যায়ক্রমে চাষের মত। কারণ এতে মাটির পুষ্টি-বস্তুগুলির ব্যবহারে অনেকটা সমতা বজায় থাকে এবং কখনোই বিশেষ একটি পুষ্টি-বস্তুর অভাব ঘটে না। মিশ্র চাষ ভূমিক্ষয় রোধেও যথেষ্ট সাহায্য করে। মিশ্রচাষের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে এটা অনেকটা শস্যহানির সম্ভাবনার বিরুদ্ধে বীমার কাজ করে। যেমন, গম ও ছোলার মিশ্র চাষে যদি ছোলা উইল্ট (wilt) দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন গম চাষীকে এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। তেমনি আবার, গম যদি কাল ছত্রাক (black rust) রোগে আক্রান্ত হয় তখন চাষীর অন্তত মোটামুটি ভাল ছোলার ফসলটি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মিশ্র চাষের আরেকটি সুবিধা এই যে, চাষী তার প্রয়োজনীয় ধান বা গম জাতীয় দানা শস্য, ডাল, তৈলবীজ ও গবাদি পশুর খাদ্য একই সঙ্গে পেতে পারে।

মাটির উর্বরতা বজায় ও বৃদ্ধির জন্য স্থূল জৈব সারের ব্যবহার

পর্য্যাপ্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চল ও সেচ অঞ্চলে মাটির উর্বরতা বজায় ও বৃদ্ধির জন্য স্থূল জৈব সার ব্যবহারের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এইসব অঞ্চলে ফসল বোনার সময় বৎসরে হেক্টর প্রতি ১০ টন করে স্থূল জৈব সার ব্যবহার করা দরকার। দেখা গেছে যে, যে সব অঞ্চলে বিনা সেচে চাষ হয় সেখানে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সারের ব্যবহার মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর ভিত্তিতে দেখা গেছে যে গোটা দেশে প্রায় ১,১৫০ মিলিয়ন টন জৈব সারের প্রয়োজন। অনুমান, (১৯৫৫-৫৬) সালের মধ্যে দেশে

৪২৮·৪ মিলিয়ন টন স্থূল জৈব সার তৈরী হবে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

	মিলিয়ন টন
গোবর সার	২১৬·০
পল্লীর কম্পোষ্ট	১২২·০
টাউন কম্পোষ্ট	৪·৪
সবুজ সার	৮৬·০
মোট	৪২৮·৪

সার তৈরীর স্থানীয় উপাদানগুলির উপযুক্ত ব্যবহার ভারতবর্ষের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত নিশ্চিত এবং মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকে সেখানে সবুজ সারের ব্যবহার চলতে পারে। তবে দেখতে হবে, এটা যেন অন্যান্য স্বাভাবিক ফসল উৎপাদনে এবং বিশেষ করে ধান বা আখ, যেগুলিতে সবুজ সারের ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়, তাদের উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪·২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সবুজ সারের ব্যবহার হয়েছে এবং আশা করা যায় তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮·৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিকে সবুজ সারের আওতায় আনা সম্ভব হবে। সবুজ সার ব্যবহারের সব চেয়ে বড় বাধা হল বীজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা। অতএব, সারকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে চাষী যাতে স্বল্পমূল্যে ও প্রয়োজন মত সবুজ সারের বীজ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গোবর সার ও পল্লীর কম্পোষ্ট

গোবর সার ও পল্লীর কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য যে সমস্ত জৈব আবর্জনার প্রয়োজন তার মধ্যে গোবর অন্যতম। খৃষ্টাব্দের আদম স্নুমারীতে (পশুগণনা) দেখা গেছে যে এদেশে মোট উৎপাদিত

গোবরের পরিমাণ ১৩৫০ মিলিয়ন টন (কাঁচা)। এই গোবরের বেশ কিছুটা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়। হিসেব করে দেখা গেছে, যে পরিমাণ খামারের আবর্জ্জনা ও গোবর জ্বালানী হিসেবে পোড়ানো হয়, সার হিসেবে তা প্রায় ১২টা সিন্ধ্রি ফ্যাক্টরীতে উৎপাদিত এ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান। শিকড় ছাড়া উদ্ভিদের অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশগুলিও জৈব আবর্জ্জনা হিসেবে পল্লীর কম্পোষ্ট তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। তবে, এর পরিমাণ খুবই কম; কারণ এর অধিকাংশই গবাদি পশুর খাদ্য ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এ দেশে ২১৬ মিলিয়ন টন গোবর সার ছাড়াও আরও ৬৬ মিলিয়ন টন পল্লীর কম্পোষ্ট তৈরী হয়েছে। আশা করা যায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় ১১২ মিলিয়ন টন পল্লীর কম্পোষ্ট তৈরী হবে। চাষীদের যদি জ্বালানীর জন্য গোবরের উপর নির্ভরশীল হতে না হত তবে ১৩৫০ মিলিয়ন টন কাঁচা গোবরের সবটা এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এরূপ ১৫০ মিলিয়ন টন আবর্জ্জনা ব্যবহার করে বছরে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টন ভাল রকমের পল্লীর কম্পোষ্ট তৈরী করা সম্ভব হ'ত। তৈরীর সময় ফস্‌ফেট ঘটিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করে আরও উৎকৃষ্টতর কম্পোষ্ট পাওয়া যেতে পারে।

জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত গোবরের অপচয় কমাতে গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট বেশ কার্য্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে বায়ুহীন অবস্থায় গোবরকে পচিয়ে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস প্রস্তুত করা হয় এবং অবশিষ্ট যা থাকে তাকে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এর কতকগুলি অসুবিধেও আছে, যেমন—(১) অল্প তাপে গ্যাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, (২) প্রাথমিক অত্যধিক খরচ এবং (৩) প্ল্যাণ্ট অকেজো হয়ে গেলে কারিগরী সাহায্যের অভাব। এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করা প্রয়োজন।

সহরের আবর্জ্জনা [১]

সহরের আবর্জ্জনা সবই মানুষ ও উদ্ভিদ জাত। যে সব সবজী ও অল্প সময়ের ফসলের চাহিদা সহরে খুব বেশী তাদের চাষেই এই আবর্জ্জনার ব্যবহার বিশেষভাবে কার্য্যকরী। সহরের স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখার জন্য সহরের আবর্জ্জনাগুলির দ্রুত অপসারণ ও তাদের উপযুক্ত ব্যবহার অত্যাবশ্যক। সহরের আবর্জ্জনা সাধারণতঃ দু'রকম :

(ক) কঠিন আবর্জ্জনা—এর মধ্যে আছে সহর ঝাড়ু দেওয়া আবর্জ্জনা, মৃত জীবজন্তুর নাড়ীভূড়ী, রান্নাঘরের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি, কষাইখানার আবর্জ্জনা, মলমূত্র এবং শিল্প কারখানার জৈব আবর্জ্জনা, এবং

(খ) তরল আবর্জ্জনা—যেমন, নর্দ্দমার ময়লা। এতে আছে মলমূত্র মিশ্রিত নোংরা জল।

(ক) কঠিন আবর্জ্জনা

খাদ্য, কৃষি, কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্ট ও কো-অপারেশন মন্ত্রণালয়ের অধীনে টাউন কম্পোষ্ট তৈরী পরিকল্পনায় ঠিক করা হয়েছে যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি কমিটি ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলি লক্ষ্য রাখবে যে সহরের সমস্ত আবর্জ্জনা যেন সংগৃহীত হয়ে কম্পোষ্ট তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয় এবং সেই কম্পোষ্ট স্থানীয় চাষীদিগকে সরবরাহ করা হয়। যাতে সহরের আবর্জ্জনা অবশ্যই কম্পোষ্ট তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয় সে জন্য অনেক রাজ্যেই এটাকে মিউনিসিপ্যালিটি কমিটির অবশ্য করণীয় বলে আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কম্পোষ্ট যেমন একদিকে মূল্যবান সার, আবার অন্যদিকে মাটির ভৌত ধর্ম্ম উন্নত করতেও সক্ষম। সহরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্যও কম্পোষ্ট তৈরীর প্রয়োজনীয়তা

---

[১] প্রাপ্তিসূত্র :—ষ্টাডি অন ইউটিলিজেশন অফ আরবান ওয়েষ্টেজ, কমিটি অন ন্যাশনাল রিসোর্সেস, প্লানিং কমিশন,

রয়েছে। (১৯৫৫-৫৬)সালের মধ্যে প্রায় ৩·৫ মিলিয়ন টন টাউন কম্পোষ্ট তৈরী হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হল পরিকল্পনার শেষে ৪·৪ মিলিয়ন টন টাউন কম্পোষ্ট তৈরী করা। কিন্তু অনুমান করা হচ্ছে যে উৎপাদনের পরিমাণ খুব সম্ভবত ৩·৯ মিলিয়ন টনের মত হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের দেশে সহরের লোক সংখ্যার পরিমাণ হল ৭·৮৮ কোটি। এই জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে এদের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা থেকে ৭·৮৮ মিলিয়ন টন কম্পোষ্ট তৈরী হতে পারে। টাউন কম্পোষ্টে গড়ে ১·৩ শতাংশ নাইট্রোজেন, ১·১ শতাংশ ফস্‌ফরিক এ্যাসিড (P_2O_5) এবং ১·৫ শতাংশ পটাস (K_2O) থাকে। এর সবগুলিই হল কম্পোষ্টের শুকনো ওজনের ভিত্তিতে। আমাদের যে ৭·৮৮ মিলিয়ন টন টাউন কম্পোষ্ট তৈরীর সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে থাকবে ০·৬১৪ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ০·৫২০ লক্ষ টন ফস্‌ফরিক এ্যাসিড (P_2O_5) এবং ০·৭০৯ লক্ষ টন পটাশ (K_2O)। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় এই পুষ্টি-বস্তুগুলির আনুমানিক্ মূল্য হবে ২৫ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাউন কম্পোষ্ট ব্যবহার করে যে অতিরিক্ত খাদ্য শস্যের উৎপাদন আশা করা যেতে পারে তার পরিমাণ হবে প্রায় ২·৮ লক্ষ টন। যেহেতু সহরের লোক সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে, অতএব কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য আবর্জ্জনার পরিমাণও বছরের পর বছর বেড়েই চলবে।

(খ) তরল আবর্জ্জনা

ভারতবর্ষে প্রায় ৮০টি নগর ও সহরে পুরোপুরি বা আংশিক সিউয়েজ ব্যবস্থা আছে। আর বাকী ৬০০টি সহরে ময়লা জল নিষ্কাশনের জন্য রয়েছে খোলা নর্দ্দমার ব্যবস্থা। উপরোক্ত সহর ও নগরগুলি থেকে দৈনিক প্রাপ্ত ময়লা জলের পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ মিলিয়ন গ্যালন। এর মধ্যে ২৪০ মিলিয়ন গ্যালন ১৪৫টি বিভিন্ন সহর ও নগরে সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়। সিউয়েজ সেচের আওতায় মোট জমির পরিমাণ হবে ১৩,৩৬০ হেক্টর। সাধারণ

গৃহজাত সিউয়েজে প্রতি মিলিয়ন ভাগে (দশ লক্ষ ভাগে) ১৫ থেকে ৩৫ ভাগ নাইট্রোজেন (N), ৪ থেকে ৬ ভাগ ফস্‌ফরিক এ্যাসিড (P_2O_5), ১০ থেকে ২০ ভাগ পটাস (K_2O), এবং গড়ে ৪০০ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে। প্রতি মিলিয়নে গড়ে ২৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ৫ ভাগ ফস্‌ফরিক এ্যাসিড ও ১৫ ভাগ পটাস ধরলে প্রতিদিন যে ৭০০ মিলিয়ন গ্যালন সিউয়েজ পাওয়া যায় তার মোট সার উপাদানগুলির পরিমাণ হবে নিম্নলিখিতরূপ :

নাইট্রোজেন (N)	— দৈনিক ৮০ টন বা বাৎসরিক ২৯২০০ টন
ফস্‌ফরিক এ্যাসিড (P_2O_5)	— দৈনিক ৪৬ টন বা বাৎসরিক ৫৮৪০ টন
পটাস (K_2O)	— দৈনিক ৪৮ টন বা বাৎসরিক ১৭৫২০ টন
জৈব পদার্থ	— দৈনিক ১২৮০ টন বা বাৎসরিক ৪৬৭,২০০ টন।

দৈনিক যে ৭০০ মিলিয়ন গ্যালন সিউয়েজ নিষ্কাশিত হয় তা দিয়ে ২১০,০০০ একর জমির সেচ কার্য্য চলতে পারে। এতে জমি থেকে বাড়তি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হবে ৩ লক্ষ টন। ভালভাবে জারিত করে (oxidised) যদি তরল অংশ সেচের জন্য ব্যবহার করা হয় তবে স্বাস্থ্যের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সিউয়েজ সেচের উপযুক্ত শস্য হল পশুখাদ্যের উপযুক্ত ঘাস জাতীয় ফসল, যেমন—রোঢস্‌ ঘাস, গিনি ঘাস, জোয়ার ও নানাবিধ শিল্প শস্য, যথা—ইক্ষু, তামাক, তুলা ইত্যাদি। কারণ এগুলি ব্যবহারের পূর্ব্বে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোধিত হয়ে যায়। তাছাড়া পেঁপে, কলা প্রভৃতি যে সমস্ত গাছের ফল মাটি থেকে অনেক উঁচুতে জন্মায় সে সব ফসলেও সিউয়েজ নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিউয়েজ থেকে স্লাজ নামক এক প্রকার মূল্যবান সার প্রস্তুত হয়। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে আমাদের মোট উৎপাদিত

সিউয়েজ থেকে বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ টন স্লাজ পাওয়া যেতে পারে। অথচ এর তুলনায় বর্ত্তমানে আমাদের মাত্র ৫০,০০০ টন স্লাজ তৈরী হয়। স্লাজের মধ্যে মোটামুটি ৬·০ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২·০ শতাংশ ফস্‌ফরিক এ্যাসিড ও ০·৫ শতাংশ পটাস্ থাকে। যে সমস্ত সিউযেজ যুক্ত সহর বা নগরে কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য মলের অভাব, সেখানে স্লাজকে কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য ব্যবহার করা উচিৎ।

রাসায়নিক সার

ভারতবর্ষের বিরাট কৃষিভূমির উর্বরতা দ্রুত বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হ'ল রাসায়নিক সারের ব্যবহার। রাসায়নিক সারের মাধ্যমে পুষ্টি-বস্তুর প্রয়োগে যে শুধু তখনকার ফসলেরই ফলন বাড়ায় তা নয়; এ ছাড়া উবরতা বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে, ইহা কম বেশী স্থায়ীভাবে মাটির উবরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

যে সমস্ত পুষ্টি-বস্তুগুলি সার হিসেবে মাটিতে দেওয়া হয় তার সবটাই কখনো প্রথম ফসলের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। সব সময়ই কিছু অংশ মাটিতে থেকে যায় এবং আংশিকভাবে হলেও পরবর্ত্তী ফসলের কাজে লাগে। সার প্রয়োগের ফলে শুধু যে গাছের উপরের অংশই বেড়ে ওঠে তা নয়; ইহা মূলের বৃদ্ধিতেও যথেষ্ট সাহায্য করে। ফসলের দানা ও খড়ের সবটাই জমি থেকে তুলে নেওয়া হলেও মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ থেকে যায়; কারণ ফসল কেটে নেওয়ার পরেও গাছের ছড়ানো শিকড় মাটিতে পড়ে থাকে। তারপর, বিযোজন (decomposition) প্রক্রিয়ায় এই শিকড় থেকে গাছের খাদ্য-বস্তুগুলি পরের ফসলের ব্যবহারোপ-যোগী হয়ে বিমুক্ত হয়। অতএব, সার প্রয়োগের সুফল বেশ কয়েক বছর ধরেই পাওয়া যায়। এটা যে শুধু দীর্ঘমেয়াদী লাভজনক ব্যবস্থাপনা তা নয়, এ থেকে আশু ফলও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা

থাকলে মাটিতে প্রতি কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন প্রয়োগে ১০ কিলোগ্রামের মত ধান বা গমের ফলন বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে হেক্টরে প্রতি ৫ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেনে গড়ে ৫০০ কিলোগ্রাম দানা শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। এ থেকে সারের দাম মিটিয়েও চাষীর বেশ কিছুটা মুনাফা থাকে।

রাসায়নিক সার শুধু এক বৎসর ব্যবহার করলেই হবে না। বরাবর এর ব্যবহার করে যেতে হবে এবং এটাকে খামারের অন্যান্য কার্য্যাবলীর একটা অঙ্গ হিসেবে ধরে নিতে হবে। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য ; কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ কি নাতিশীতোষ্ণ দেশ, পৃথিবীর কোন দেশই যথেষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে দীর্ঘ দিন ধরে ক্রমাগত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফসল ফলাতে সক্ষম হয় নি। অধিক ফলনের জন্য অধিক পরিমাণ গাছের পুষ্টি-বস্তুগুলির প্রয়োজন এবং এটা একমাত্র রাসায়নিক সার থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

ধান জমির পরিচর্য্যা

সাধারণতঃ জল দাঁড়ানো জমিতেই ধান উৎপাদন করা হয়। ফলে ধান জমিতে যে বায়ুহীন অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে এর একটা আনুষঙ্গিক পরিণাম হিসেবে ধরা যেতে পারে। যে সমস্ত জমিতে ধান রোয়া হয় বা পর্য্যায়ক্রমে চাষে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে ধানও উৎপন্ন করা হয়, সে সমস্ত জমির পরিচর্য্যা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। ধান সাধারণতঃ সমতল জমিতে এবং পলি দোঁয়াশ, এটেল দোঁয়াশ, পলি এটেল বা এটেল মাটিতে ভাল জন্মে। এসব মাটিতে খুব ধীরে ধীরে জল অনুপ্রবেশ করে। ধানের একটা ফসলের জন্য ৩০ থেকে ৪০ একর ইঞ্চি জলের প্রয়োজন। ধান জমি পরিচর্য্যার প্রধান উপাদানগুলি হল—জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের মান বজায় রাখা, মাটির উপযুক্ত গঠন ঠিক রাখা, জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা যাতে ধানের সঙ্গে অন্যান্য ফসলও পর্য্যায়ক্রমে চাষ করা এবং আগাছা দমন করা যায়। অল্প অম্ল বা প্রশম (neutral)

মাটিতে ধান খুব ভাল জন্মে। ধানের জন্য এ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন ঘটিত সারই প্রশস্ত। এ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন মাটির কল্‌য়েডের গায়ে আটকে থাকে এবং এই অবস্থা থেকে সহজেই গাছের মূল নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। রোয়া ধানের চাষে জমিকে জল দ্বারা প্লাবিত করা হয় এবং এতে মাটির ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়ামের সহজ লভ্যতা বৃদ্ধি পায়।

সেচ যুক্ত জমি[১]

পরিমাপ করে দেখা গেছে যে সেচ দিতে পারলে প্রতি হেক্টরে ০·৫ টন অতিরিক্ত দানা শস্যের ফলন পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মোট চাষভুক্ত জমির প্রায় ২০ শতাংশ সেচের আওতায় আছে। ১৯৫৯-৬০ সালের বিভিন্ন প্রদেশের মোট সেচ-ভূমির পরিমাণ ৯ নম্বর পরিশিষ্টে দেখানো হ'ল।

দেখা গেছে যে দেশে মোট ৭৫ মিলিয়ন হেক্টর জমির জন্য সেচ ব্যবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে, ৪৫ মিলিয়ন হেক্টর বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে এবং ৩০ মিলিয়ন হেক্টর ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে। এর মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দিকে (১৯৫০-৫১) মাত্র ২২.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিলঃ ৯.৫ মিলিয়ন হেক্টর বৃহৎ ও মধ্যম পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে এবং ১২·৮ মিলিয়ন হেক্টর ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সবরকম সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে অতিরিক্ত মাত্র ১·২ মিলিয়ন হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল আরও ২.৫ মিলিয়ন হেক্টর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল আরও ৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা; কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ২·১ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচভুক্ত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩·১ মিলিয়ন হেক্টর, যদিও পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৫·১

[১] মেমোরাণ্ডাম্ অন্ ফোরথ্‌ ফাইভ ইয়ার প্লান্।

মিলিয়ন হেক্টর। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে অতিরিক্ত ৬.৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

১৯৫০-৫১ সাল থেকে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার অগ্রগতি নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১৯৫০-৫১ সাল থেকে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার অগ্রগতি

	প্রথম পবিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা (আনুমানিক)	মোট (আনুমানিক)
ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন সেচভূক্ত জমির পরিমাণ	১.৮	২.১	৩.৫	৭.৪
লক্ষ্য	৪.০	৩.৬	৫.১	—

১৯৫০-৫১ সাল থেকে ৭.৪ মিলিয়ন হেক্টর জমি নতুন করে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচভূক্ত হয়েছে। এর ভিত্তিতে আশা করা যায় সাল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচযুক্ত মোট জমির পরিমাণ হবে ২০ মিলিয়ন হেক্টর। (১৯৫৫-৫৬) সালের মধ্যে বৃহৎ ও মধ্যম সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে আনুমানিক মোট ১৫.৯ মিলিয়ন হক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে বলে আশা করা যায়। এই ভাবে বৃহৎ ও মধ্যম সেচ পরিকল্পনাগুলি দ্বারা যদি ১৫.৯ মিলিয়ন হেক্টর জমির ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলি দ্বারা ২০ মিলিয়ন হেক্টর জমির সেচ ব্যবস্থা সম্ভব হয়, তবে (১৯৫৫-৫৬) সালে মোট ৩৫.৯ মিলিযন হেক্টর জমিকে সেচভূক্ত করা যাবে বলে আশা করা য।

আমাদের মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ'ল ১৪০ মিলিয়ন হেক্টর। এর পরিমাণ আর বাড়ানোর সুযোগ খুবই কম। সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে আমাদেব মোট চাষভূক্ত

জমির পরিমাণ ১৩৩.৬ মিলিয়ন হেক্টর। অন্য দিকে বহুফসলীর সূচক (বিভিন্ন ফসলের অন্তর্ভূক্ত জমির পরিমাণ ও মোট চাষভূক্ত জমির পরিমাণের অনুপাত) খুবই কম। আমাদের দেশের এই সূচক সংখ্যা হল ১.১৫, যেখানে তাওয়াইতে এই সূচক সংখ্যা ২.০০। ভারতবর্ষে এই সূচক সংখ্যা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কৃষি জমিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে হলে দুটি জিনিষের দরকার, যথা—বহুফসলীর সূচক সংখ্যা বাড়ানো এবং একর প্রতি ফলন বাড়ানো। কৃষির প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজন এই বহুফসলীর সূচক সংখ্যা বাড়ানো এবং সেটা সম্ভব একমাত্র সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দ্বারা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মৃত্তিকা সংশোধন

অম্ল মাটি

মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাণ pH মানের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। pH স্কেলটিকে ১ থেকে ১৪ পর্য্যন্ত ১৪টি pH এককে ভাগ করা হয়েছে। মাটির pH মান ৭ হলে তাকে নিরপেক্ষ বা প্রশম মাটি বলে, ৭ এর কম হলে অম্ল মাটি এবং ৭ এর বেশী হলে ক্ষারীয় মাটি বলা হয়। pH মান ৫ pH মান ৬ অপেক্ষা ১০ গুণ বেশী অম্ল এবং pH মান ৪ এর অম্লতা pH মান ৫ এর অম্লতার ১০ গুণ। পশ্চিমঘাট, কেরালা, পূর্ব্ব উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং মনিপুরের অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলগুলিতে অম্ল মাটি দেখা যায়। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে প্রায় ২৫ মিলিয়ন হেক্টর জমির pH ৫'৫ এর নীচে এবং ২৩ মিলিয়ন হেক্টর জমির pH ৫.৬ এবং ৬.৫ এর মধ্যে[১]। ফসল উৎপাদন ও আর্দ্র এলাকায় ধৌত ক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম জমি থেকে নিঃসরিত হয় এবং এর ফলে জমি অম্ল হয়ে ওঠে এ্যামোনিয়াম সালফেটের মত অম্ল উৎপাদক সার ব্যবহারের ফলেও মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। অত্যধিক অম্লভাবাপন্ন মাটি অঞ্চলে ম টির অম্লতা সংশোধন না করলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পুরোপুরি ফল পাওযা যায় না। মাটির pH খুব কম হলে (অর্থাৎ মাটি খুব বেশী অম্ল হলে) অনেক পুষ্টি-বস্তুরই সহজলভ্যতা অত্যন্ত হ্রাস পায় এবং ফলে ফসলের উৎপাদন কমে যায়। মাটির অম্লতা ৬ থেকে ৬'৫ pH মানের কম হলে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও মলিবডেনামের সহজলভ্যতা অস্বাভাবিক রকম

২০ নং চিত্র

মাটির বিক্রিয়ার জন্য pH স্কেল
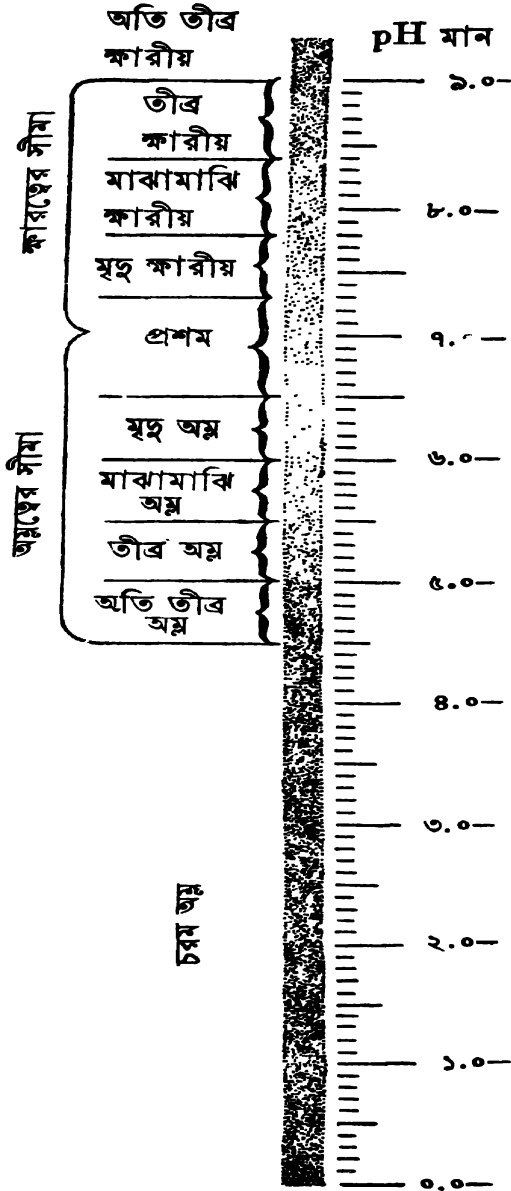
চিত্র ২১

কি ভাবে প্রশম মাটি অম্ল মাটিতে রূপান্তরিত হয়

প্রশম কলয়ডাল কণা + H^+ ⇌ অম্ল কলয়ডাল কণা + $4\,H^+$ $2\,Ca^{++}$ $1\,Mg^{++}$

২২নং চিত্র
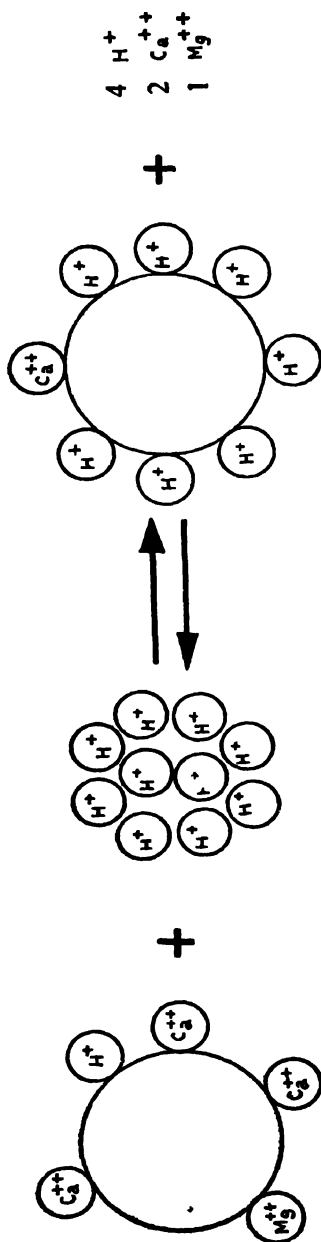
উদ্ভিদের পুষ্টি-বস্তুর সহজলভ্যতার উপর মাটির pHএর প্রভাব
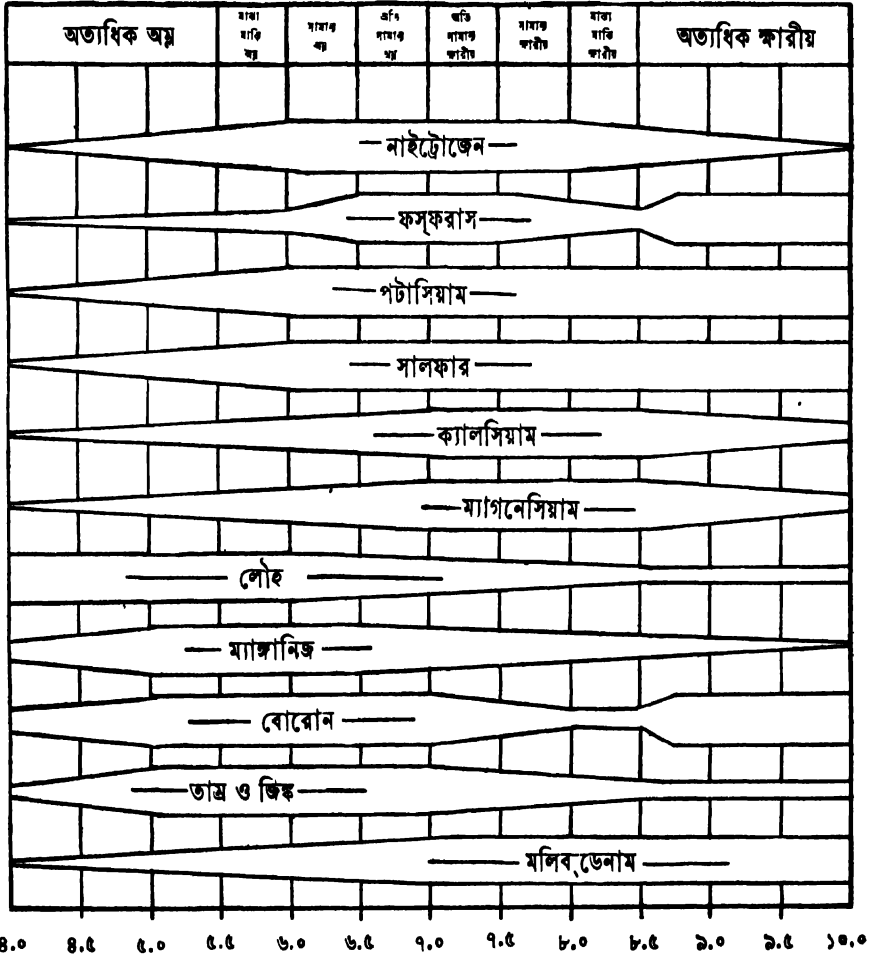
কমে গিয়ে গাছের সম্যক বৃদ্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য, pH মান ৫.০ থেকে ৬.৫ পর্য্যন্ত অম্ল মাটিতে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন, তাম্র এবং জিঙ্ক অতি সহজেই গাছের গ্রহণযোগ্য হয়।

অত্যধিক অম্লভাবাপন্ন মাটিতে খুব কম গাছই ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে। মাটির উর্বরতার জন্য অপরিহার্য্য জীবাণুগুলিও অম্ল মাটিতে সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পায় না। প্রত্যেকটি শস্যেরই অম্লতা সহ্যের একটা সীমা আছে। মাটির অম্লতা সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে গাছের মূলগুলির ক্ষতি হয়। কতকগুলি শস্যের মোটামুটি উপযুক্ত pH মানের সীমা নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

তালিকা—১৩[১]

শস্য	উপযুক্ত pH মানেব সীমা
বার্লি	৬.৫—৮.০
কলা	৬.০—৭.৫
নারকেল	৬.০—৮.০
তুলা	৫.০—৬.০
চীনা বাদাম	৫.৩—৬.৬
ভুট্টা	৫.৫—৭.৫
ধান	৫.০—৬.৫
সোয়াবিন	৬.০—৭.০
বিট	৬.৫—৮.০
আখ	৬.০—৮.০
সূর্য্যমুখী	৬.০—৭.৫
তামাক	৫.৫—৭.৫
গম	৫.৫—৭.৫

[১]প্রাপ্তি সূত্রঃ—V. Ignatieff (Ed.), 1958 Efficient use of Fertilizers; F. A. O., Rome.

ভারতবর্ষের ৭টি প্রধান শস্য দ্বারা মাটি থেকে প্রতি বৎসর মোট ৬,৭২০,০০০ মেট্রিক টন চুণ অপসারিত হয় (তালিকা-১৪)। ধান জমির পরিমাণ খুব বেশী বলে সব ফসলের মধ্যে ধানই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চুণ অপসারণ করে, অর্থাৎ, ২,৭৬০,০০০ মেট্রিক টন। তূলার স্থান দ্বিতীয়; অর্থাৎ, ১,০২০,০০০ মেট্রিক টন।

তালিকা—১৪

ভারতবর্ষে কয়েকটি বিশিষ্ট শস্য কর্ত্তৃক অপসারিত মোট চুণের পরিমাণ (ক্যালসিয়াম কার্বনেট সমতা)[১]

শস্য	চাসভুক্ত জমির পরিমাণ (মিলিয়ন একর)	মোট ক্যালসিয়াম কার্বনেট সমতা (মিলিয়ন মেট্রিক টন)
তূলা	২০.০	১.০২
চীনা বাদাম	১২.৫	১.০০
ভুট্টা	৯.০	০.৯০
ধান	৭৫.০	২.৭৬
আখ	৪.৪	০.১৮
গম	২৯.০	০.৭২
তামাক	০.৯	০.১৪
	মোট	৬.৭২

সংক্ষেপে চুণের কার্য্যকারিতাগুলি হল ঃ—

(১) নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্‌টেরিয়াগুলির কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(২) মাটির অম্লতা কমানো এবং তার সংশোধন করা।

(৩) রাসায়নিক সার সমূহের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২৩নং চিত্র

চূণ কিভাবে অম্ল মাটিকে প্রশম করে
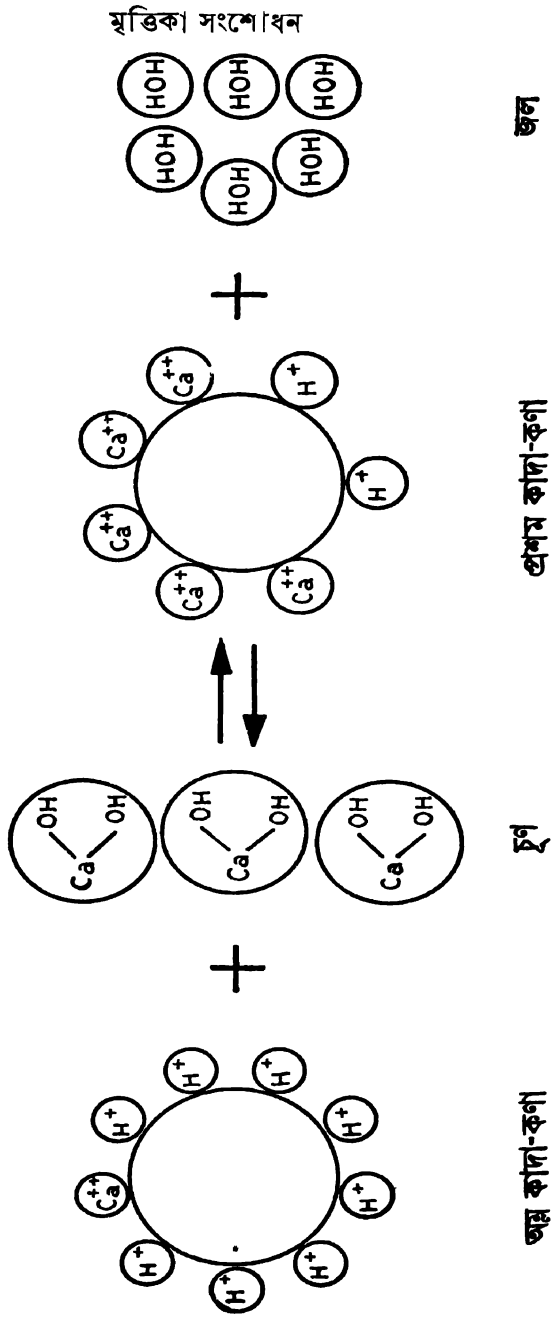
(৪) জৈব পদার্থের বিযোজন বৃদ্ধি করা এবং জৈব বন্ধনে আবদ্ধ গাছের পুষ্টি-বস্তুগুলির মুক্তি ঘটানো।

(৫) মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি সাধন।

(৬) গাছের পক্ষে ক্ষতিকর এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজকে নির্দোষ যৌগিকে রূপান্তরিত করা।

(৭) পুষ্টি-বস্তু হিসেবে গাছকে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করা। চুণের জন্য গুঁড়া চূণাপাথর বা ডলোমাইট বা পোড়া চুণ মাটিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বায়ুতাড়িত চুল্লীর ধাতুমলে (Blust furnace slag) বা বেসিক ধাতুমলে (Basic slag) প্রচুর পরিমাণে চুণ থাকে। অতএব চুণ হিসেবে এগুলিকেও গুঁড়া করে অম্ল মাটিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাটির অম্লতা শোধনের জন্য লাক্কাদিভ ফস্ফেটও প্রয়োগ করা চলে। নীচের তালিকায় (তালিকা-১৫) বেসিক ধাতুমল, বায়ুতাড়িত চুল্লীর ধাতুমল এবং লাক্কাদিভ ফস্ফেটের উপাদানগুলির শতকরা হিসেব দেওয়া হল।

তালিকা—১৫[১]

চুণ হিসেবে ব্যবহৃত বস্তুগুলির সংযুতি (composition)

উপাদান	বেসিক ধাতুমল (টাটা)	বায়ুতাড়িত চুল্লীর ধাতুমল (টাটা)	লাক্কাদিভ ফস্ফেট
ক্যালসিয়াম	২৬.১০	২৫.২০	৩৬.৯৭
ম্যাগনেসিয়াম	৮.৪০	৮.৩০	২.৭০
ম্যাঙ্গানিজ	৩.৫০	০.৫৩	০.০১৬
ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3)	২১.৩০	০.৮০	১.৭২
এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3)	১৭.৩৩	১৮.৮৬	১.৩০
মোট ফস্ফরাস (P_2O_5)	৭.০০	সামান্য	৬.৩১

চুণ প্রয়োগ দ্বারা মাটিকে প্রশম করতে হলে শুধুমাত্র মাটির দ্রবণে উপস্থিত মুক্ত হাইড্রোজেন আয়নগুলির বিক্রিয়া ঘটালেই হবে না, সেই সঙ্গে মাটির পরতে উপস্থিত সক্রিয় আয়নগুলিরও বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য পরিমাণ মত চুণ প্রয়োগ করতে হবে। মাটির দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়নগুলিই সক্রিয় অম্লতার জন্য দায়ী। মাটির pH নির্ণয়ের সময় এই হাইড্রোজেন্ আয়নগুলিকেই মাপা হয়।

মাটির দ্বিতীয় প্রকারের অম্লতাকে বলা হয় মজুদ বা গুপ্ত অম্লতা (potential acidity)। এর পরিমাণ সক্রিয় অম্লতার অনেক গুণ বেশী। বিভিন্ন রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং মাটির কাদা-কণা ও জৈব পদার্থের গায়ে আবদ্ধ হাইড্রোজেন আয়নগুলির দ্বারা এইরূপ অম্লতার সৃষ্টি হয়। যেহেতু মাটির কাদা-কণা ও জৈব পদার্থের গায়ে আবদ্ধ হাইড্রোজেন আয়নগুলি গুপ্ত অম্লতার জন্য দায়ী, অতএব, অধিক পরিমাণ-কাদা কণা ও জৈব পদার্থে পূর্ণ সূক্ষ্ম গ্রথন-যুক্ত মাটির মোট অম্লতা অপেক্ষাকৃত কম কাদা-কণা ও জৈব পদার্থ-যুক্ত বেলে মাটির অম্লতা অপেক্ষা অনেক বেশী।

জলাভূমির সংস্কার

আর্দ্র আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া দ্বারা বিতাড়িত জলের চেয়ে বেশী হওয়ায় মাটিতে জল জমে থাকে এবং এই জমা জল স্বাভাবিক শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত স্থানে উপযুক্ত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেচের যে কাজ, জল নিষ্কাশনের কাজ ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এদের মধ্যে সম্বন্ধও রয়েছে। একটির আধিক্যে অপরটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের জলসেচনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সর্ব্বত্রই জলসেচনের ফলে কোন না কোন প্রকারে জলপীঠ (water table) উপরে উঠে আসে। ফলস্বরূপ জলাকীর্ণতা (water logging) এবং

তৎ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। শস্যের মোট প্রয়োজনের তুলনায় বেশী জল প্রয়োগ করলে উদ্বৃত্ত জল অনুস্রবণে নীচে চলে গিয়ে জলপীঠের সঙ্গে মেশে। নোনা মাটিতে এবং সেচের জল নোনা হলে লবণকে ধুয়ে নীচে নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত জলসেচনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার জল নিষ্কাশনের সমস্যা দেখা দেয়। স্বাভাবিক জমিতে এবং সেচের জন্য ভালো জল পাওয়া গেলে প্রয়োজনাতিরিক্ত জলসেচন প্রযোজনও হয় না এবং কাম্যও নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উঁচু নীচু জমি এবং খারাপ ব্যবস্থাপনার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত জলসেচন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, কোন কোন ক্ষেত্রে জলসেচনের কার্য্যকারীতা মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ। মাটির গভীরে অনুস্রবণ ছাড়াও নদী-নালা প্রভৃতি থেকে উপচে পড়া ও চুইয়ে আসা জলও জলাকীর্ণতার জন্য দায়ী।

পাঞ্জাবের সেচ দপ্তর জলপীঠের উত্তোলনে সেচ ও মৌসুমী বৃষ্টিপাত এই দুইয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধানমূলক কাজ করেছেন। উচ্চ চেনাব খাল এলাকার কূপের জলপীঠের গভীরতা থেকে জানা গেছে যে জুন থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত জলপীঠের উপরে উঠে আসা এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত—এই দুইএর মধ্যে রৈখিক সম্বন্ধ বিদ্যমান।

উর্বর কিন্তু অধিক ভিজা জমি থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা উত্তম চাষ আবাদের একটি অঙ্গ। অনেক জমির ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উর্বর মাটির অংশটি থাকে নীচের দিকে। কিন্তু এই অংশটি বছরের কিছু সময় ভিজা থাকায় ফসলের সম্ভাব্য উৎপাদনের একটা অংশ মাত্র উৎপন্ন হয়। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলে এই সমস্ত জমিতে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা যেতে পারে। যে সমস্ত জমিতে জল নিষ্কাশন করা দরকার অথচ ব্যবস্থা নেই, সেখানে গাছ অনেক সময় জ্বলে যায়। যে সমস্ত জমি বসন্তকালে ও গ্রীষ্মের প্রথম ভাগে উপরিভাগ পর্য্যন্ত জলে সম্পৃক্ত থাকে সেখানে গাছের মূলগুলি

মাটির উপরিভাগেই বিস্তৃত হয়। পরে গ্রীষ্মের খরা দেখা দিলে জলপীঠ মূল-অঞ্চলের নীচে নেমে যায়, ফলে গাছ জল পায় না। এইরূপ জমিতে জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে মূলগুলি মাটির অনেক গভীরে যেতে পারে এবং গাছ গ্রীষ্মের খরা অনেকটা ভালভাবে সহ্য করতে পারে।

অতিরিক্ত জল জমির উপরিভাগের খোলা নালা দ্বারা বা জমির নীচে টালি নির্ম্মিত নালা দ্বারা নিষ্কাশন করা যেতে পারে। এই দুইটিরই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। খোলা নালাগুলি জমির অনেকটা অংশ নিয়ে নেয়, চাষ আবাদের যন্ত্রগুলি চালানোর অসুবিধা হয়, আগাছা ও তলানি পড়ে নালাগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, গভীর না হলে খোলা নালাগুলি শুধুমাত্র উপরের জলই নিষ্কাশন করে, মাটি থেকে জল নিষ্কাশন করে না। আর্দ্র এলাকায় ঘন কাদামাটির জমিতে সাধারণত খোলা নালার প্রয়োজন হয়।

টালির নালা জমি নষ্ট করে না এবং চাষের যন্ত্রপাতি চালানোরও অসুবিধা হয় না। একবার বসানোর পর খুব বেশী যত্নও নিতে হয় না। টালির নালা মাটির রন্ধ্র পরিসর থেকে জল নিষ্কাশন করে বলে গাছের মূল ভালভাবে মাটির নীচে বিস্তৃত হতে পারে। তবে একটা অসুবিধা হল, টালির নালা বসাতে অনেক বেশী খরচ হয় এবং কোন কোন মাটিতে খুব বেশী কার্য্যকরী হয় না।

প্রয়োজন হলে নিষ্কাশিত জল পাম্প করে সেচের জন্য ব্যবহার করার উপায় সম্বন্ধেও ভেবে দেখা উচিৎ। যা হোক, খামারের নীচু জমিগুলি বর্ষাকালে জলাকীর্ণ থাকে বলে সেখানে জলাকীর্ণতা সহনশীল শস্য, যেমন ধান প্রভৃতির চাষ করা উচিৎ।

বন্যা এবং নদীর দ্বারা অনুর্বরকৃত জমির সংস্কার

আমাদের দেশে কোন কোনও নদী উপত্যকার প্রচুর জমি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় বন্যা হয়, আবার অনেক সময় নদীর পাড় ক্ষয়ে গিয়ে নদীর জল উপচে পড়ে বা নদী নতুন খাতে বয়ে যায়। তখন ক্ষেত-খামার, বাড়ী-ঘর, সংবাদ আদান-প্রদানের

ব্যবস্থা সমস্তই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যটি উত্তর ভারতে প্রায়ই দেখা যায়। পাঞ্জাবে শাটলেজ ও যমুনা নদীর উপত্যকা প্রায়ই বন্যার কবলে পড়ে। যমুনা নদীর দক্ষিণ পাড়টি প্রায় ১০০ মাইল ধরে খুব নীচু। ফলে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় নদীর জল উপচে পড়ে প্রচণ্ড শস্যহানি ঘটায় এবং জমি নষ্ট করে দেয়। প্রতিবৎসর বিহারের উর্বর পলি ভূমিতে প্লাবন একটি নিয়মিত ব্যাপার। নদীর কূল ভাঙ্গা ছাড়াও ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় প্রতিবৎসর আসাম উপত্যকার প্রচুর ক্ষতি হয়। নদীর বন্যাজনিত ক্ষতির ফলে বর্তমানে দেশের বহু জমি পতিত পড়ে আছে। নদীর দুই ধারের ২.৫ থেকে ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত উপত্যকা অঞ্চলের জমিগুলি বেশ উর্বর। পাঞ্জাবে এই জমিগুলিকে বেট (Bet) জমি বলা হয়।

নোনা ও ক্ষার মাটির সংস্কার

শীতকালে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করলে মাইলের পর মাইল সাদা আস্তরণ পড়া নোনা জমি দেখা যায় (মানচিত্র-৫)[১]। ভারতবর্ষে এইরূপ প্রায় ৬ মিলিয়ন হেক্টর জমি আছে। পাঞ্জাবে এইরূপ জমির পরিমাণ ১.২ মিলিয়ন হেক্টর, উত্তর প্রদেশে ২ মিলিয়ন হেক্টর, পশ্চিমবঙ্গে ০.৯ মিলিয়ন হেক্টর। উড়িষ্যা, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যেও এইরূপ প্রচুর নোনা জমি আছে। এই সমস্ত জমি বহু বছর ধরে আবাদহীন অবস্থায় পড়ে আছে। সম্প্রতি সেচযুক্ত অঞ্চলের প্রচুর জমি লবণাক্ত হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পাঞ্জাবে এইভাবে প্রায় ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ হেক্টর উর্বর জমি প্রতি বছর লবণাক্ত হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবের খালের জলে সেচযুক্ত জমিগুলিকে জলপীঠের গভীরতা অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

---

(১) জলপীঠের গভীরতা ০ থেকে ১.৫ মিটার (ক শ্রেণী) ;
(২) জলপাঠের গভীরতা ১.৫ থেকে ৩.০ মিটার (খ শ্রেণী) ;
(৩) জলপীঠের গভীরতা ৩.০ থেকে ৪.৫ মিটার (গ শ্রেণী) ;
(৪) জলপীঠের গভীরতা ৪.৫ মিটার থেকে বেশী (ঘ শ্রেণী)।

জলপীঠ মাটির উপরিভাগ থেকে ১.৫ মিটারের মধ্যে উঠে আসলে শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। এই অবস্থায় মূল অঞ্চলের মাটির রন্ধ্রপরিসরগুলি জলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। ফলে মূলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বায়ুর অভাব দেখা দেয় এবং পরিমিত খাদ্যের অভাবে গাছ মরে যায়। অতএব, জলপীঠ যাতে ৩.০ মিটারের উপরে উঠে না আসে সেরূপ ব্যবস্থা করা দরকার।

ভারতবর্ষের চাষের মোট জমির এক দশমাংশেরও বেশী লবণাক্রান্ত। এই সমস্ত জমিতে লবণের পরিমাণ বা সোডিয়ামের পরিমাণ বা দু'টিরই পরিমাণ অত্যন্ত বেশী থাকায় ভালভাবে চাষ-আবাদ করা যায় না এবং ফসলও ভাল হয় না। মাটিতে জমে থাকা লবণ উদ্ভিদের বৃদ্ধির হানি ঘটায় এবং মাটির কণা দ্বারা আকৃষ্ট সোডিয়াম জমির চাষের অসুবিধা ঘটায় এবং মাটিতে জল প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।

ভূ-পৃষ্টস্থ খনিজ পদার্থই লবণের উৎস। খনিজ পদার্থগুলি ওয়েদারিং প্রক্রিয়া দ্বারা বিযোজিত হয়ে লবণের দ্রবণ তৈরী করে। আর্দ্র এলাকায় প্রভূত বৃষ্টিপাতের ফলে এই দ্রবীভূত লবণ ধৌত প্রক্রিয়ায় নীচে চলে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্গে মিলিত হয় এবং জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। অপরপক্ষে শুষ্ক ও মোটামুটি শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম হওয়ায় ধৌত প্রক্রিয়া দ্বারা লবণ মাটির নীচে চলে যেতে পারে না। তাছাড়া এইরূপ অঞ্চলে আর্দ্র অঞ্চল অপেক্ষা বাষ্পীভবন খুব বেশী এবং উদ্ভিদও খুব বেশী জল শোষণ করে। এই সমস্ত কারণে শুষ্ক ও মোটামুটি শুষ্ক অঞ্চলে লবণ সঞ্চিত হয়। তবে, এই সঞ্চিত লবণের পরিমাণ কখনই এত বেশী হয় না যাতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আসল সমস্যা দেখা দেয়

যখন জমিতে ভূপৃষ্টের ধারা থেকে বা ভূগর্ভস্থ জলপীঠ ও জল সেচনের দ্বারা ক্রমাগত লবণ সঞ্চিত হতে থাকে।

সেচযুক্ত অঞ্চলে কিরূপ দ্রুত হারে মূল অঞ্চলে লবণ সঞ্চিত হবে তা নির্ভর করে জলের গুণগত অবস্থা, সেচ পদ্ধতি, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। প্রতি হেক্টর। সেন্টিমিটার সেচের

২৪ নং চিত্র
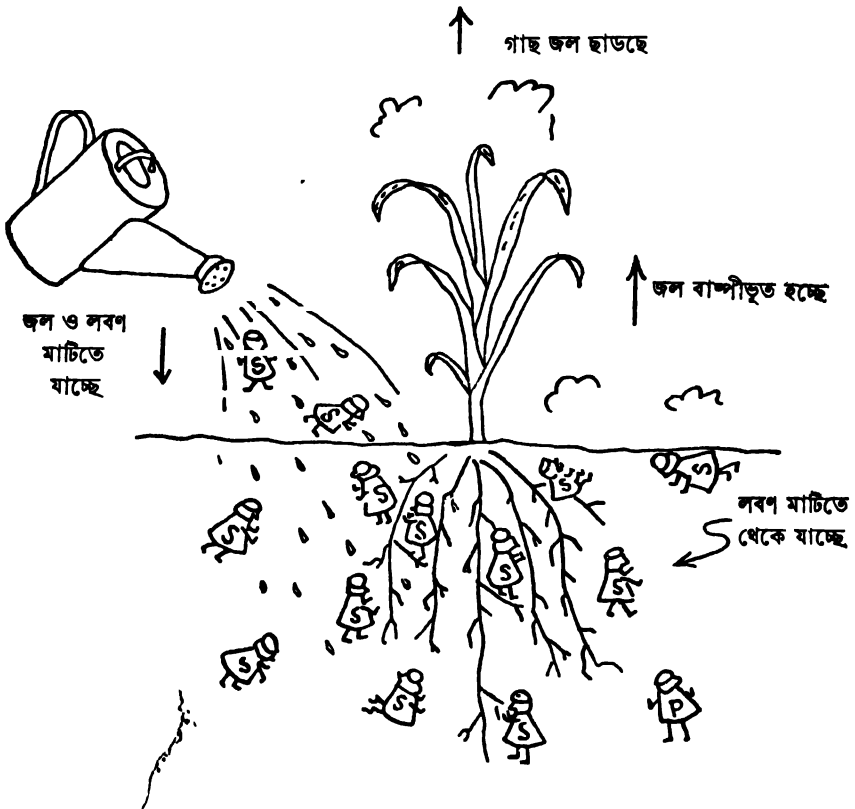
জলে সাধারণত ০'০০৪ থেকে ০'৪ টন বা তারও কিছু বেশী লবণ থাকে। সাধারণ একটি খন্দে ৬০ বা তার কিছু বেশী হেক্টর সেন্টিমিটার জল সেচন করা হয় ; সুতরাং একটি খন্দে প্রতি হেক্টর জমিতে জল সেচন দ্বারা ২৪ টন পয্যন্ত লবণ সঞ্চিত হতে পারে।

জল সেচনের জন্য অপর্য্যাপ্ত জল পাওয়া গেলে কৃষকেরা সাধারণত খুব বেশী পরিমাণ জল জমিতে প্রয়োগ করেন। এই অতিরিক্ত জল ভালোর চেয়ে খারাপই বেশী করে। কারণ ইহা জলপীঠকে উপরে তুলে আনে ; ফলে জল নিষ্কাশন সমস্যা দেখা দেয়। অপরপক্ষে খুব অল্প পরিমাণ জল সেচন করলে স্বাভাবিক ধৌত প্রক্রিয়া বাধা পায় ; ফলে দ্রবীভূত লবণ উদ্ভিদের মূল এলাকার বাইরে যেতে পারে না। সেচ দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল প্রয়োগ করতে হবে যাতে ঃ

(১) বাষ্পীভবন ও উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া দ্বারা বিতাড়িত জলের ক্ষতিপূরণ হয়।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী জলসেচনের ফলে সঞ্চিত লবণ ধৌত প্রক্রিয়ায় বিতাড়িত হয়।

তাছাড়া, উপযুক্ত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে লবণের পরিমাণ পরিমিত থাকে, জলপীঠ উপরে উঠে না আসে এবং জল উদ্ভিদের মূল এলাকায় পৌঁছাবার পূর্ব্বেই বেরিয়ে যেতে পারে।

অসমতল মাটিতে, বা মাটি সচ্ছিদ্র না হলে অনেক সময় লবণ সঞ্চিত হয়। অসমতল জমির সব চেয়ে নীচু অংশটিতে সমস্ত নিষ্কাশনের জল এসে জমা হয় এবং মাটিকে লবণাক্ত করে তোলে। কোন কোন জমির নীচে সিমেন্টের মত একরকম পদার্থ জমে থাকে এবং ইহা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করে।

জমিতে অতিরিক্ত লবণ থাকলে দুই প্রকারে উদ্ভিদের ক্ষতি হয়। প্রথমত জমিতে পর্য্যাপ্ত জল থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ জল গ্রহণ করতে পারে না। ফলত উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না—খর্ব্বাকৃতি দেখায়।

দ্বিতীয়ত সঞ্চিত সোডিয়াম ও ক্লোরিন ঘটিত লবণের প্রত্যক্ষ বিষক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদের মৃত্যু হতে পারে। বোরোন ও কার্বনেট কম বেশী সব গাছের পক্ষেই ক্ষতিকারক।

লবণাক্ত মাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ নোনা মাটি, ক্ষার মাটি এবং নোনা-ক্ষার মাটি। নোনা মাটিতে দ্রবণীয় লবণের পরিমাণ খুব বেশী। এরূপ মাটির কণাগুলি একত্রে দলা পাকানো থাকে। এই দলাগুলি ভঙ্গুর এবং এদের মধ্য দিয়ে বায়ু ও জল স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে। দ্রবনীয় লবণগুলি কিন্তু উদ্ভিদের জল শোষণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় না। জমিতে সঞ্চিত লবণের সাদা আস্তরণ যুক্ত ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত উদ্ভিদবিহীন অংশ দেখতে পাওয়া যায়। যে মাটির কণাগুলিতে আকর্ষিত সোডিয়ামের পরিমাণ খুব বেশী থাকে তাকে ক্ষার মাটি বলে। এই সোডিয়াম মাটির দলাগুলির মধ্যস্থিত ছিদ্র কমিয়ে দেয়। কোন কোন এলাকায় এরূপ মাটি ফুলে গিয়ে জিলেটিনের দলার মত হয় এবং এর মধ্যে জল ও বায়ুর প্রবেশের পথ থাকে না। এরূপ মাটির উপরিভাগে সময় সময় কালো আস্তরণ দেখা যায়; তখন তাকে কালো-ক্ষার মাটিও বলা হয়। কালো আস্তরণটি সোডিয়াম কর্তৃক দ্রবীভূত জৈব পদার্থের সঞ্চিত স্তর। দ্রবীভূত লবণ ও মাটির কণাগুলিদ্বারা আকষিত সোডিয়াম একই সঙ্গে মাটিতে থাকলে তখন তাকে নোনা-ক্ষার মাটি বলা হয়।

লবণাক্রান্ত মাটির উন্নয়ণ

নোনা মাটি ধৌত প্রক্রিয়া দ্বারা সংশোধন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জল মাটির উপরিভাগে প্রয়োগ করা হয়। এই জল মাটির মধ্য দিয়ে শোষিত হলে মাটির নীচ দিয়ে নিষ্কাশন করে দেওয়া হয়। জলপীঠ খুব বেশী উপরে থাকলে ধৌত প্রক্রিয়া বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। মাটির স্বাভাবিক নিষ্কাশন ক্ষমতা পর্য্যাপ্ত না হলে কৃত্রিম নিষ্কাশন প্রণালীর ব্যবস্থা করা উচিৎ। কোন কোন সময় পাম্পের সাহায্যেও অতিরিক্ত জল কূপ থেকে

২৫নং চিত্র

যেখানে স্বাভাবিক জল নিষ্কাশন পর্য্যাপ্ত নয়, সেখানে টালি নির্ম্মিত নালা ও খোলা নালা মূল অঞ্চল থেকে লবণ অপসারণে সাহায্য করে।
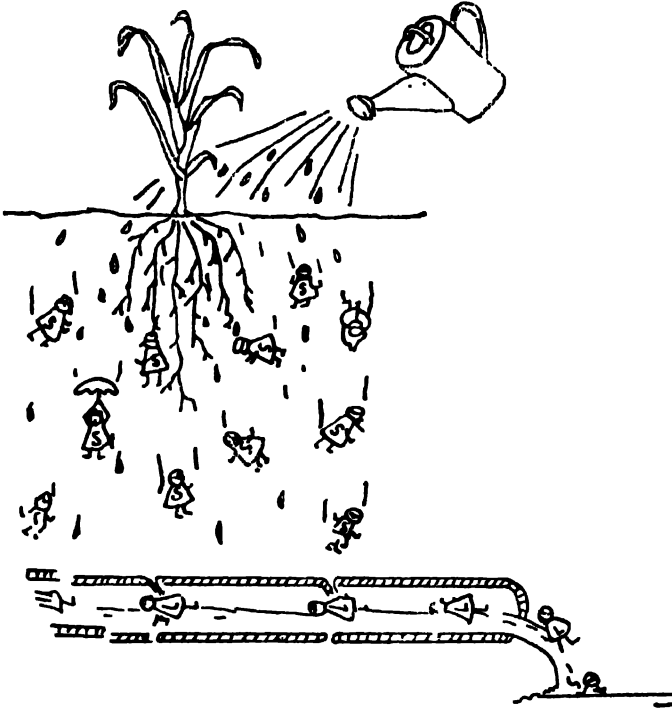
বের করে দেওয়া হয়। শস্যের চাষ-আবাদের বেশীর ভাগ সময় স্থায়ী জলপীঠ ১.৪ থেকে ১.৫ মিটার নীচে থাকা উচিত। প্রতি ৩০ সেন্টিমিটার উদ্ভিদ মূল অঞ্চলের জন্য ১৫ সেন্টিমিটার জল প্রয়োগ করলে শতকরা ৫০ ভাগ লবণ ধৌত প্রক্রিয়া দ্বারা বেরিয়ে যেতে পারে ; ৩০ সেন্টিমিটার জল সমপরিমাণ মূল এলাকা থেকে শতকরা ৮০ ভাগ লবণ বের করে দিতে পারে।

২৬নং চিত্র

বিভিন্ন শস্যের লবণ সহনশীলতা বিভিন্ন
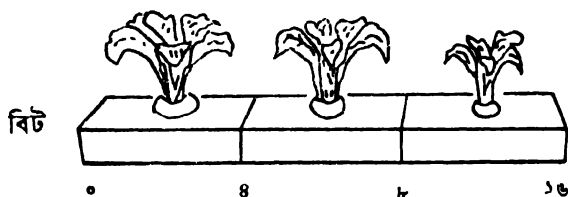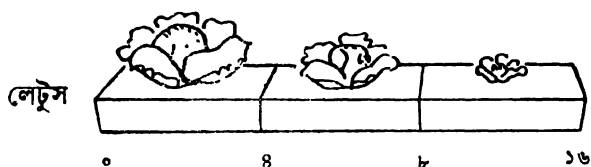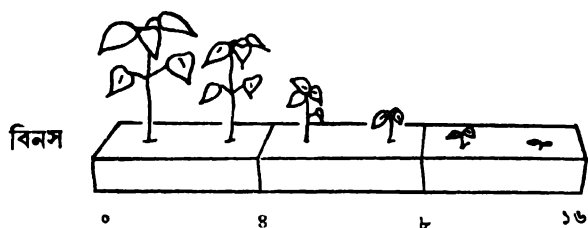
মাটির লবণাক্ততা (মিলিমোস্)

ক্ষার এবং নোনা-ক্ষার মাটির সংশোধন

নিম্নলিখিত উপায়ে ক্ষার ও নোনা-ক্ষার মাটির সংশোধন করা যেতে পারে ঃ

(১) রাসায়নিক সংশোধন, যথা—জিপ্‌সাম্ প্রয়োগ।

(২) ধৌত প্রক্রিয়ার পর মাটিতে সবুজ সার বা জৈব পদার্থ প্রয়োগ, যাতে মাটির গঠন উন্নত হয়।

বিভিন্ন শস্যের লবণ সহনশীলতা বিভিন্ন

ধান, বারসিম, তুলা, বার্লি, ইক্ষু ও সুগার বিট, শিম এবং ফল-ফলাদি গাছের চেয়ে ১০ গুণ বেশী লবণ সহ্য করতে পারে। যাহোক, লবণাক্ততার একটা নিরাপদ সীমা আছে। খুব কম পরিমাণ লবণ থাকলেও গাছ অনেক সময় খর্ব্বাকৃতি হয় এবং উৎপাদন কমে যায় ; যদিও গাছের কোনও ক্ষতির লক্ষণ চোখে দেখা যায় না। পরিশিষ্ট ১১ তে কতকগুলি শস্য, শাক-শব্জী ও ফল-ফলাদি গাছের লবণ সহনশীলতা দেখানো হল।

নোনা জমিতে চাষ আবাদ

নোনা জমির চাষ আবাদে দুইটি সমস্যা ঃ অতিরিক্ত দ্রবণীয় লবণ এবং ত্রুটিপূর্ণ নিষ্কাশন ব্যবস্থা।

আমরা জানি যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধন-তড়িতাবিষ্ট পরমাণু এবং সাল্‌ফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি ঋণ-তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বর্ত্তমান। কম পরিমাণে হলেও পটাসিয়াম, কার্বনেট এবং বাইকার্বনেটও মাটিতে থাকে।

নোনা মাটির pH মান সর্ব্বদাই বেশী, তবে কখনও ৮·৫ এর সীমা অতিক্রম করে না। এই মাটির সম্পৃক্ত নিষ্কর্ষের পরিবাহিতা ৪ মিলিমোস্‌/সেঃ মিঃ অপেক্ষা বেশী। এই মাটিতে সোডিয়ামও খুব বেশী ; তবে পরিবর্ত্তনীয় (exchangeable) সোডিয়ামের পরিমাণ ১৫%এর বেশী নয়।

সেচের জলে বেশী লবণ থাকা উচিৎ নয়। ইহাতে লবণের পরিমাণ ২.৫ গ্রাম/লিটার এর বেশী হবে না এবং এর পরিবাহিতা ৪ মিলিমোস্‌/সেঃ মিঃ এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। লবণ সহনশীলতার মান অনুযায়ী উৎপাদনের জন্য শস্য বাছাই করা প্রয়োজন। তড়িৎ-পরিবাহিতা এবং সোডিয়ামের পরিমাণ মেপে সেচের জলের উৎকৃষ্টতা স্থির করা হয়।

উৎকৃষ্ট সেচের জলের দ্বারা লবণাক্ত মাটিকে সহজেই উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে রূপান্তরিত করা যায়। অবশ্য এর জন্য নিকৃষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থা—যা এইরূপ মাটির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য—তারও প্রতিবিধান আবশ্যক, এর জন্য প্রথমেই মাটির সছিদ্রতা পরীক্ষা করা দরকার। মাটির বিভিন্ন গভীরতা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে মাটির গ্রথন, গঠন এবং সছিদ্রতা দেখে নেওয়া হয়।

মাটি উৎকৃষ্টরূপে সছিদ্র হলে দ্রবনীয় লবনগুলিকে ধীরে ধীরে ধৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেচের জলের দ্বারা বিতাড়িত করা সহজ হয়। যদি মাটিতে কার্বনেট কম থাকে, তবে ক্যালসিয়াম সালফেট (জিপসাম) প্রয়োগ করা উচিত, যাতে আকর্ষিত সোডিয়াম ক্যালসিয়াম দ্বারা স্থানান্তরিত হয। আর যদি কার্বনেট বেশী থাকে তবে ক্যালসিয়াম সালফেটের সঙ্গে সালফিউরিক এ্যাসিড বা সালফারও ব্যবহার করা যেতে পারে। সালফার জারিত হয়ে সালফিউরিক এ্যাসিডে পরিণত হয় এবং কার্বনেটের ক্ষতিকর কার্য্যাবলী নিবারণ করে।

অতিরিক্ত সছিদ্র মাটির ৯১ সেন্টিমিটার, এমনকি ১৩৭ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত গভীর প্রোফাইলের স্তরগুলি পরীক্ষা করা উচিত। এতে নালার গভীরতা ও দূরত্ব হিসাব করা সহজ হয়। উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলে মাটির লবণাক্ততা ক্রমশঃ কমে যাবে।

বিস্তীর্ণ এলাকায় লবণমুক্ত করার প্রকল্পে একটি বড় জলাধারের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এই জলধারে নালাগুলি নিষ্কাশিত জল এনে জমা করবে। নালাগুলি কাদামাটি, টালি অথবা জল শোষণে অক্ষম পদার্থ দ্বারা তৈরী করা যেতে পারে। এক একটি অংশের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩০ সেঃ মিঃ এর বেশী হয় না। এগুলিকে একটির পর একটি পাশাপাশি বসানো হয়, এবং উপরে ও নীচে বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। নালাগুলি সাধারণত প্রতি হাজারে ১ থেকে ২ ঢালু হয়।

একটি নালা থেকে অপরটির দূরত্ব মাটির গ্রথনের উপর নির্ভর করে। যেমন—

কাদামাটি— ৭.৯	থেকে	১০.১ মিটার
ঠাস বুনটের মাটি—১০.১	থেকে	১১.৯ মিটার
দোঁয়াশ মাটি—১১.৯	থেকে	২০.২ মিটার
বেলে মাটি—২০.২	থেকে	২৪.১ মিটার
অত্যন্ত বেলে মাটি—২৪.১	থেকে	৩০.০ মিটার

প্রয়োজন অনুযায়ী নালাগুলি ৭৬ সেঃ মিঃ থেকে ১৫২ সেঃ মিঃ গভীরে বসানো হয় এবং উপরের তালিকা অনুযায়ী একটি নালা থেকে অপরটির দূরত্ব স্থির করা হয়। নিষ্কাশিত জলের পরিমাণ ও নালার দৈর্ঘ্যের উপর তার ব্যাস নির্ভর করে। এই সংগ্রহকারী নালাগুলি থেকে একটি বড় নালার সাহায্যে জল বের করে দেওয়া হয়।

স্পেনের দক্ষিণ অংশে কৃষকেরা নোনা জমির উপরিভাগ ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার গভীর বালি দিয়ে ঢেকে দেয়। তার উপর টমাটো, শিম প্রভৃতি ফসলের চাষ করে। এই আয়াসসাধ্য পদ্ধতিতে কেবল বাড়ীর চাহিদা মেটানোর জন্য এবং ছোট খামারে চাষ করা হয়. প্রতি বছর চাষের জন্য এবং সার প্রয়োগের জন্য বালির স্তরটি সরিয়ে নিতে হয়। এই পদ্ধতি সাধারণত "কাল্টিভোস্ এরোনরাডোস্" (বালুকা প্রয়োগে চাষ) নামে পরিচিত। হাঙ্গেরীতে নোনা মাটি "ডিগোজাস্" পদ্ধতিতে সংস্কার করা হয়। এতে তলাকার উৎকৃষ্ট মাটি উপরে এনে তারপর চাষ করা হয়। হেক্টর প্রতি খরচ পড়ে প্রায় ১২,৫০০ ফরিণ্ট বা ৫০০ ডলার।

মরুভূমির সংস্কার

রাজস্থানের শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চল প্রায় ২০৭,২০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। সৌরাষ্ট্রের কিছু অংশ, উত্তর গুজরাট, পাঞ্জাব, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম রাজস্থান নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। চরম

উত্তাপ এখানকার জলবায়ুর বিশেষত্ব—শীতকালে হিমাঙ্কের নীচে থেকে গ্রীষ্মে ৫২° সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম এবং অনিয়মিত—পশ্চিম অংশে ১২৭ মিঃ মিটার থেকে পূর্ব্ব অংশে ৫০৮ মিঃ মিটার পর্য্যন্ত। গ্রীষ্মে বায়ুর গতিবেগ কখনও কখনও ঘণ্টায় ১২৯ কিলোমিটার পর্য্যন্ত হয়। জল প্রায় নেই বললেই চলে এবং মাটির নীচে প্রায় ১২২ মিটার থেকে ১৫২ মিটার গভীরতা থেকে উপরে তুলতে হয়। এই জল সাধারণত লবণাক্ত এবং কোথাও কোথাও অতিরিক্ত লবণের জন্য বিষাক্ত। মাটি প্রধাণত বেলে—মোটা এ্যালুভিয়াম এবং অধিকাংশ জায়গাই নোনা। রাজস্থান মরুভূমির অনেকটাই মানুষের তৈরী। প্রায়ই আশংকা করা হচ্ছে, এবং এটা খুবই সত্যিকথা যে এই মরুভূমি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে এবং মধ্যেকার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হচ্ছে। খুব সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ এই স্থানের বিচারণ ক্ষেত্ররূপে অপর্য্যপ্ত ব্যবহার, বন-ভূমি কেটে ফেলা, নিকৃষ্ট ধরণের চাষ-আবাদ —এইগুলি এই স্থানের বায়ুজনিত ক্ষয়ের প্রধান কারণ। যদি রাজস্থানের এই মরুভূমি অঞ্চলের স্থায়ী সংস্কার করে সীমিত ব্যবহার করা হয়, তবে এখানে একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনাপূর্ণ পশু শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে।

স্থানপরিবর্ত্তনশীল অর্ন্তদেশীয় বালুকাস্তূপ পশ্চিম রাজস্থান এলাকায় প্রায়ই দেখা যায়। এই স্তূপগুলি প্রায় ৭৩,৬৫০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এবং এটা রাজস্থানের মোট জমির প্রায় ৩৬ শতাংশ। স্থানপরিবর্ত্তনশীল এই বালুকা-স্তূপগুলি মানুষের বসতির পক্ষে প্রচণ্ড অন্তরায়। কারণ এইগুলির জন্য কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এবং প্রাকৃতিক গাছপালার পুনরুজ্জীবন খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ইহারা জলীয় অবস্থার এবং স্থানীয় জলবায়ুর প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধন করে। ফলে, জমি ক্রমশঃই আরও শুকিয়ে যায় এবং উৎপাদনশক্তি হ্রাস পায়। 'সেণ্ট্রাল এরিড জোন গবেষণা কেন্দ্র' এই স্থানের উন্নতি সাধনের জন্য বালুকা-স্তুপগুলির স্থায়ী-

প্লেট ৩১ —খোদ পরিকল্পনার বাধ ও গিরিপথের দক্ষিণ দিকের একটি দৃশ্য এবং বেশ কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণীর জঙ্গল (১২০নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৩৩ জলের উৎস, আসুর অঞ্চল, গ্রাম জাতিপাত (নেতারহাট)
(১৪৪নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৩৪ সুতলেজ নদীর দুই কূল বরাবর আদি নষ্ট-ভূমি
(১৫৮নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৩৫ নষ্ট ভূমি, "কা'ল ক্ষারীয় মাটি এটোয়া জেলা
—উত্তর প্রদেশ (১৬২নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লে ৩৬—উত্তর প্রদেশের রহিমাবাদে রাজ্য উষর জমি সংশোধনী খামারে
সংশোধিত উষর জমিতে গম বোনা হয়েছে (১৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্লেট ৩৭—লক্ষ্ণৌতে উষর জমিতে এক বৎসর ধান চাষের পরে জমিতে
ধানের পরিমাণ (১৬৫নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
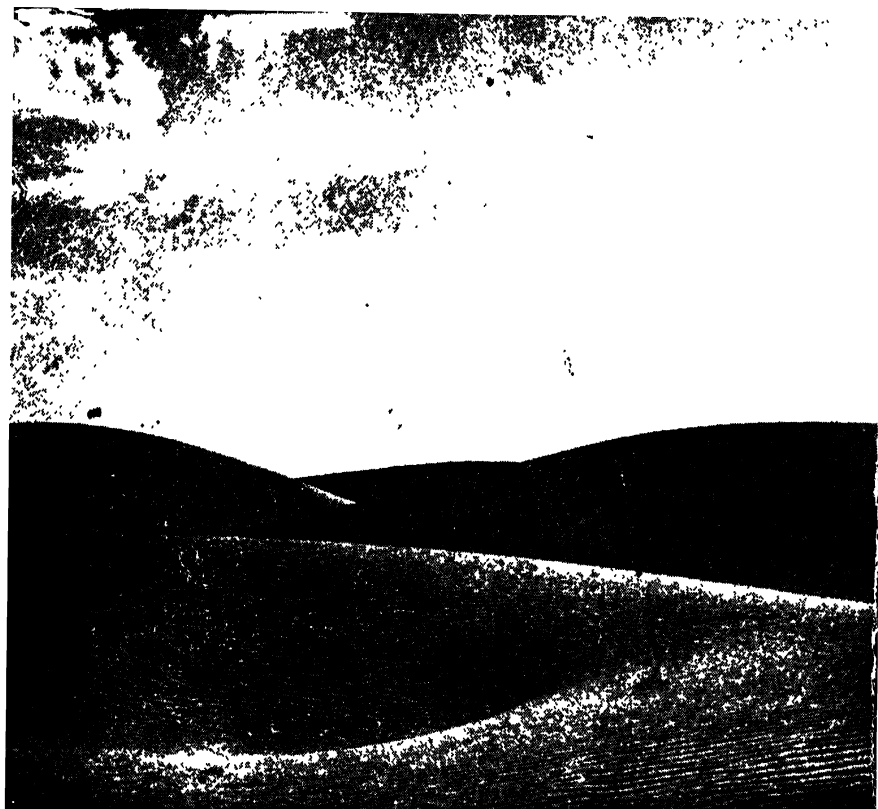
প্লেট ৩৮—বালুকাস্তূপ—রাজস্থান (১৭০নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

করণের চেষ্টা করছে। এর জন্য ছোট ছোট বর্গাকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া দ্বারা বালুকা-স্তূপগুলির উপরিভাগে আচ্ছাদন তৈরী করা হয়। পরিত্যক্ত এই গাছ-গাছড়ার অংশগুলি ভূমিতল থেকে ৩০-৪০ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত উঠে থাকে। এই আচ্ছাদনগুলি বালির স্থানান্তরণে বাধা দেয়। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আচ্ছাদিত স্থানে ঘাস এবং অন্যান্য বৃক্ষাদির চারা রোপন করা হয। এর ফলে বায়ুজনিত ভূমি-ক্ষয় অনেক কমে যায়।

কেন্দ্রিয় এরিড জোন গবেষণাগার অনেকগুলি দেশীয় ও বিদেশীয় বৃক্ষ, ঘাস ও লবণ সহিষ্ণু ঝোপ জাতীয় গাছের প্রচলন করছে। এগুলি শুষ্ক স্থানেও বেশ ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। গুল্ম জাতীয় গাছের আচ্ছাদন তৈরী করে, বৃক্ষ রোপন করে এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রাক্‌কালে ঘাস লাগিযে বালুকাস্তূপ স্থায়ীকরণের এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। গুল্ম জাতীয গাছগুলি স্থানীয় বলে ওখানেই পাওযা যায। কতকগুলি গাছ-গাছড়ার ল্যাটিন নাম দেওয়া হোল: ক্রোটোলারিযা বারহিযা, ক্যালিগোনাম পলিগোনয়ডিস, লেপ্টাডিনিযা পাইরোটেকনিকা, জিজিফাস—এইগুলি গুল্ম জাতীয়। লেসিযারাস সিণ্ডিকাস, এরযান্‌থাস মুঞ্জা, প্যানিকাম টার্জিডাম, প্যানিকাম এ্যান্টিডোটেল, সেনক্রাস সিলিযারিস—এইগুলি ঘাস জাতীয়। রেন্‌কোসিযা মিনিমা, সাইট্রালাস কোলোসিন্‌থিস—এইগুলি গুল্ম ও বৃক্ষের মাঝামাঝি। প্রোসোপিস জুলিফ্লোরা, প্রোসোপিস স্পেসিজেরা, এ্যাকাসিযা সেনিগ্যাল, টেকোমেল্লা আনডিউলেটা, এ্যালবিজিয়া লেবেক, ডালবেরজিয়া শিসো, ইউ-ক্যালিপটাস ক্যামালডুলেন্‌সিস—এইগুলি বৃক্ষ জাতীয। তাছাড়া এই গবেষণাগারে শুষ্ক অঞ্চলের উপযোগী বহু দেশীয় ও বিদেশীয় পুষ্টিকর ঘাস উৎপাদন করা হচ্ছে। এগুলি হল: ল্যাসিয়ারাস সিণ্ডিকাস, সেন্‌ক্রাম ক্লিয়ারিশ, সেন্‌ক্রাস সেটিজেরাস, প্যানিকাম এ্যান্টিডোটেল, প্যানিকাম কোলোরেটাস, সেহিমা নার্ভোসাম। সেচ দিতে পারলে সোরঘাম এ্যালমাম ও সোরঘাম সুদানিজ ঘাস মরু অঞ্চলেও বেশ

ভাল জন্মায়। শিম্বি জাতীয় গাছগুলির মধ্যে ডলিকস্ ল্যাব্ল্যাব ও এ্যান্টিলোসিয়া স্ক্যারালয়ড্স্ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপকারী। শুষ্ক আবহাওয়ায় সহনশীল, উপকারী ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের প্রচলন রাজস্থানের এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

মরুভূমি এলাকায় জলসেচনের ব্যবস্থা করলে উৎপাদন যে অনেক বেড়ে য'বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীগঙ্গানগর এবং সুরাটগড়ের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত খামারের অভিজ্ঞতা এর প্রমাণ। রাজস্থানের খাল পরিকল্পনা দ্বারা ১·৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সারা বৎসর স্থায়ীভাবে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে ভারতবর্ষের এই মরু-অঞ্চলে যে সমৃদ্ধিশালী নবজীবনের সূচনা হতে চলেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বালুকা-স্তূপগুলির স্থায়ীকরণ

রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে বিকানীর, বারমার, চুরু, জয়শালমীর এবং ঝুনঝুনু জেলায় প্রায় ৭৩,৯৮৪ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বালুকা-স্তূপগুলি বিস্তৃত রয়েছে। এই অঞ্চল রাজস্থানের মোট জমির প্রায় ২২ শতাংশ। স্থানান্তরশীল বালুকা দ্বারা এই বালুকা-স্তূপগুলি তৈরী হয়। মাটি আচ্ছাদনকারী গাছপালাগুলি ধ্বংশ করার ফলে বালুকা স্থানান্তরিত হয়। এই বালুকা-স্তূপগুলি কখনও কখনও বাড়ী ঢেকে ফেলে ধ্বংশ করার উপক্রম করে। মাটির মূল্যবান উপরের স্তরটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। এই স্তূপগুলির কোন সংগঠিত 'প্রোফাইল' থাকে না। জল খুব সহজেই বালুকার মধ্য দিয়ে অনুস্রবিত হয়। জৈব পদার্থের অভাবে বালুকা জল ধরে রাখতে পারে না। বালুকা-স্তূপের উর্বরা-শক্তি প্রায় নেই বললেই হয়; বালুকা-কণাগুলি সূক্ষ্ম ও আলগা এবং সহজেই বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়। স্থায়ী উদ্ভিদ আবরণ তৈরী করে স্তূপগুলির স্থায়ীকরণ সম্ভব। উৎপত্তিস্থলের কাছেই এই স্তূপগুলির স্থায়ীকরণ সুবিধাজনক।

বৃহৎ ভারতীয় মরুভূমিটিতে অনেক বালির পাহাড় আছে। এগুলির উচ্চতা অনেক সময় ৬০—১০০ মিটার পর্য্যন্ত হয়। এগুলি বাতাসের গতির দিকে মুখ করে থাকে। এখানে বাতাসের গতি সময় সময় প্রতি ঘণ্টায় ২৮.৭ কিলোমিটার পর্য্যন্ত হয়।

বালুকা বিতাড়ন বন্ধ করতে হলে এবং বালুকা-স্তূপগুলিকে স্থায়ী করতে হলে উৎপত্তি স্থলের কাছেই বায়ুর বালুকা বিতাড়ন বন্ধ করতে হবে। শুধু গাছ-পালা লাগিয়ে ঘন ঘন পরিবর্ত্তনশীল অঞ্চলের সংস্কার করা খুব শক্ত। কারণ গাছগুলি গতিশীল বালুকাকণার ঘসায় ঘসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বায়ুর গতিবেগ যখন প্রবল তখনই বায়ুর স্থানান্তরণ বন্ধ করতে হবে, যাতে এরা লাগানো গাছগুলিকে গ্রাস করতে না পারে। এর জন্য স্তূপের কাছাকাছি অঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ স্তিমিত করা প্রয়োজন। কাঠের তক্তা, ঘাস বা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে এটা করা যেতে পারে। এই সময় প্রথম থেকেই মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর কবল থেকে স্তূপগুলিকে রক্ষা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বালুকা-স্তূপগুলির উপর কাঁটাজাতীয় গাছ উৎপন্ন করা যেতে পারে। এইগুলি বেড়ে কাঁটা ঝোপে পরিণত হয়ে স্তূপগুলিকে পশুর হাত থেকে রক্ষা করবে এবং স্তূপগুলির স্থানান্তরণ বন্ধ করবে।

বালুকা-স্তূপগুলি সংস্কারের পর এগুলিকে রক্ষার জন্য যত্ন নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য এই সমস্ত এলাকায় বিশেষ করে সহরের কাছে, স্থায়ীভাবে পশুর বিচরণ বন্ধ করতে হবে। এজন্য স্যাকারাম মুঞ্জা দ্বারা পরিবেষ্টনী রচনা করা যেতে পারে। পশুরা এই গাছ খায় না, অথচ এগুলি কুটীর শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাজাতীয় বৃক্ষ ও গুল্ম রোপণ করে এলাকাটি ঢেকে দেওয়া উচিৎ। এর দ্বারা কড়িকাঠ ও জ্বালানী কাঠ সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে এবং পাতাগুলি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ষোড়শ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নির্দ্দেশ

আজ আমরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি যে ভারতবর্ষকে যদি বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত হতে হয় তবে তাকে খাদ্য-বিষয়ে স্বয়ম্ভর হতে হবে ; এবং এর জন্য তার বিশাল বিস্তৃত অনুর্বর জমিগুলির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতের কৃষককে যদি সমৃদ্ধ হতে হয়, যদি তাঁকে অর্থোপার্জনের সাহায্যে জীবন-ধারণের মান উন্নত করতে হয়, তবে তাঁকে তাঁর জমি থেকে আরও বেশী ফসল উৎপাদন করতে হবে। এবং এর একমাত্র উপায় হ'ল জমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করা। আশার কথা, ভারতবর্ষের পক্ষে, ভারতের কৃষকগণের পক্ষে এটা করা সম্ভব।

উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে ভারতের জমির একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা খুব কঠিন কিছু নয়। উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমণের প্রতিশেধক ব্যবস্থা, কৃষকের প্রচেষ্টাকে জোরদার করা—এগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত ভূমি-ব্যবস্থাপনাগুলি গ্রহণ আবশ্যক :—

(১) আরও অধিক পরিমাণে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা ;
(২) সবুজ সার এবং অন্যান্য উপায়ে জমিতে জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করা ;
(৩) উপযুক্ত শস্য-পর্য্যায় গ্রহণ ;
(৪) উপযুক্ত জল নিষ্কাশন ও বাঁধের ব্যবস্থা ;
(৫) নোনা, অম্ল এবং ক্ষার মাটিতে উপযুক্ত প্রতিশেধক প্রয়োগ।

সেচের জন্য জল

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ, হিসাব অনুযায়ী ৩৬.৪ মিলিয়ন হেক্টর (৯০ মিলিয়ন একর)। ইহা ১৯৫৯-৬০ সালের সেচযুক্ত জমির চেয়ে ১২.৭ মিলিয়ন হেক্টর

(৩২ মিলিয়ন একর) বেশী। ইতিমধ্যেই জল-সেচনের যে সমস্ত সম্ভাব্য প্রকল্প তৈরী হয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও যেগুলি হবে—সে সমস্ত প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত জলের উপযুক্ত ব্যবহারের কথাটি অতি যত্ন সহকারে বিবেচনা করে দেখা দরকার। নালা তৈরী করা, জমি সমতল করা, কৃষককে জমি ও শস্য অনুসারে জলের উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ, প্রভৃতি উপযুক্ত জল-সেচন ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পর্য্যাপ্ত জৈব পদার্থের প্রয়োগ

ভারতবর্ষের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত কম। এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিতভাবে স্থূল জৈব সার ও সবুজ সার প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। স্থূল জৈব সার প্রয়োগ করে জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি দ্বারা বর্ত্তমান উৎপাদন বৃদ্ধির হার আরও বাড়ানো যেতে পারে এবং এর ফলে কৃষি নির্ভর অন্যান্য শিল্পগুলিরও কার্য্যকারীতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ জমি এখনও মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল : এবং এটা জানা কথা যে জৈব পদার্থ মাটির জল-সংরক্ষণ-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। কাজেই এদিক থেকে বিবেচনা করলেও জৈব পদার্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের জমির হেক্টর প্রতি উৎপন্নের হার যে ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে তার অন্যতম কারণ হ'ল, অতীতের চেয়ে জৈব পদার্থের ব্যবহার ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বন এলাকাতেও চাষের প্রসার হয়েছে এবং এর ফলে চাষের কাজে ব্যবহারযোগ্য খামার, উৎপন্ন সার, সবুজ সার এবং কম্পোষ্টের পরিমাণ কমে গেছে। মাদ্রাজের চাষ-আবাদের রীতি প্রমাণ করেছে যে চাষের জমিতে স্বাভাবিক ফসলের চাষ অক্ষুন্ন রেখে জমিতে উৎপাদিত উপযুক্ত গাছ ও গুল্ম থেকে প্রয়োজনীয় জৈব সার পাওয়া যেতে পারে। জমিতে উৎপন্ন উদ্ভিজ পদার্থগুলিকে সবুজ সার রূপে প্রয়োগ করে

প্রতি হেক্টরে অতিরিক্ত ০'২৫ টন খাদ্যশস্য পাওয়া গেছে। সার হিসেবে কম্পোষ্টের উপকারীতার কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১২ টন কম্পোষ্ট প্রয়োগ করে অতিরিক্ত ১৮৫ থেকে ২৭৭ কিলো/হেক্টর খাদ্যশস্য পাওয়া যায়।

উপযুক্ত শস্য-পর্য্যায় অনুসরণ

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং খামারের উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শস্য-পর্য্যায় ও শস্য উৎপাদন পরিকল্পনা একটি বাস্তবানুগ পন্থা। এর সঙ্গে রাসায়নিক ও জৈব সারের ব্যবহার উপযুক্তরূপে অনুসরিত হলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। শিম্বি জাতীয় ফসল ও গোখাদ্য ফসল শস্যপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলে জমির উর্বরতা সংরক্ষণ ও ভূমিক্ষয় নিবারণ ছাড়াও পশুপালন শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

রাসায়নিক সার ব্যবহার

মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য জৈব সার অত্যাবশ্যক। কারণ, হিউমাস প্রস্তুত করণ, মাটির জীবাণু সমূহের কার্য্যকারীতা বৃদ্ধি, মাটির গঠন, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য জৈব পদার্থের প্রয়োজন। কিন্তু, উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্তুর সমস্তটাই জৈব পদার্থ সরবরাহ করতে পারে না। এর জন্য জমি ও শস্য অনুযায়ী রাসায়নিক সার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। হিসেব অনুসারে এক টন এ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে খাদ্যশস্য উৎপন্নের পরিমাণ ২ টন বেড়ে যায়। কৃষকের জমিতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ রাজ্যে প্রধান প্রধান শস্যগুলির জন্য সার ব্যবহারের সুপারিশ-সূত্র তৈরী করেছেন।

সার প্রয়োগের ব্যাপারে মাটি পরীক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার। এ্যাগ্রোনমিষ্ট ও মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীগণ এর সাহায্যে কোন্ জমিতে কোন্ শস্যের জন্য কী জাতীয় সার কতখানি আবশ্যক তা মোটামুটি হিসেব করে বলে দিতে পারেন। জমির উর্বরতা ও সার

ব্যবহার সম্বন্ধে একটি ইন্দো-আমেরিকান প্রকল্পের মাধ্যমে ইতি-মধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৪টি মাটি পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, বিহার সরকার নিজেই রাঁচী, পাটনা ও পুসাতে তিনটি পরীক্ষাগার স্থাপন করেছেন। পাঞ্জাব সরকারও পালামপুর ও হিসার রাষ্ট্রীয় কৃষি-মহাবিদ্যালয়ে দু'টি পরীক্ষাগার স্থাপন করেছেন। এই সমস্ত পরীক্ষাগারে প্রতি বছর ১০,০০০ মাটির নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারে। নিবিড় কৃষি প্রকল্প এলাকাগুলিতে আরও মাটি পরীক্ষাগার স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এই সমস্ত পরীক্ষা-গারগুলি থেকে কৃষকদিগকে বিনাখরচায় মাটির পরীক্ষা ও সার প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করা হয়। তাছাড়া, মাটির এই পরীক্ষা থেকে অন্যান্য আরও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই পরীক্ষাগারগুলি থেকে প্রাপ্ত জমির উর্ব্বরতা সূচক মানচিত্র এবং মাটি পরীক্ষার সারাংশ পরিকল্পনাবিদ, সারশিল্প ও কৃষি সম্প্র-সারণ বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সার কারখানা স্থাপন ও সার উৎপাদন, সার সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরী করতে সাহায্য করছে। ১৯৬৪ সাল পর্য্যন্ত তৈরী সর্ব্বভারতীয় মাটি পরীক্ষার সারাংশ থেকে জানা যায় যে আমাদের দেশে ৫২% মাটিতে সহজলভ্য ফসফরাসের পরিমাণ কম, ৩০% জমিতে মাঝামাঝি ও ১৮% জমিতে বেশী ; সহজলভ্য পটাসিয়ামের পরিমাণ ৩১% জমিতে কম, ৩৯% জমিতে মাঝামাঝি, ৩০% জমিতে বেশী ; সহজলভ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৫২% জমিতে কম, ৩২% জমিতে মাঝামাঝি ও ১৬% জমিতে বেশী।

নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বজনবিদিত। সেইরূপ, অম্ল বা ক্ষার মাটিতে যথাক্রমে চুণ বা জিপ্‌সামের ব্যবহার আবশ্যক। পূর্ব্বে আমাদের দেশে মাটিতে চুণের ব্যবহার বিষয়ে খুব একটা দৃষ্টি দেওয়া হ'ত না। কিন্তু শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এই সব সমস্যার আশু সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। পরিমিত ও সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মাটি

পরীক্ষার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কারণ মাটি পরীক্ষার তথ্যের সঙ্গে ফসল উৎপাদন তথ্যের সমন্বয় করে বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন ফসলের জন্য সারের অনুপাত ঠিক করে কৃষকদের কাছে সুপারিশ পাঠানো যেতে পারে। মাটির স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য থেকে ভূমি-সমীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বেই মাটির মোট সংরক্ষিত পুষ্টি-বস্তুগুলির পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য পুষ্টি-বস্তুগুলির পরিমাণ একই রকম মাটিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৃথক হতে পারে। এই পার্থক্য মাটির পরীক্ষা দারা নির্ণয় করা সম্ভব। ভূমি-সমীক্ষা ও মাটি পরীক্ষা পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত এবং জমি থেকে সবচেয়ে বেশী ফসল পেতে হলে এই দুই-এরই একান্ত প্রয়োজন।

অপ্রধান পুষ্টি-বস্তু

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পুষ্টি ও জৈবিক কার্য্যকলাপের জন্য কতকগুলি পুষ্টি-বস্তু তুলনামূলকভাবে খুব কম পরিমাণে লাগে ; যথা ঃ—বোরন, কোবাল্ট, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, মলিব্‌ডেনাম ও জিঙ্ক। দেখা গেছে যে আমাদের অনেক জমি ও শস্যেই এই সব পুষ্টি-বস্তুগুলির অভাব। এই অভাবগুলি নির্ণয় করে উপযুক্ত সার প্রয়োগ দ্বারা দূরীভূত করতে পারলে উৎপাদন যে বাড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাটির গঠন

ভূমির ব্যবস্থাপনা, এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য মাটির কার্য্যক্ষমতা যেমন মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে তেমনই নির্ভর করে মাটির গঠনের উপর, মাটির শ্রেণীবিন্যাসে ও মাটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রভাবিত করতে মাটির গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সব মাটির দলাগুলি গোলাকৃতি সেখানে দলাগুলির মধ্যের রন্ধ্র-পরিসর খুব বেশী এবং মাটির প্রবেশ্যতাও খুব বেশী—ফলে উৎপাদন ক্ষমতাও বেশী। একই রকম উর্বরতা বিশিষ্ট মাটির দলাগুলি যদি ঠাস-বুনটের বা প্রিস্‌ম্যাটিক বা মোটা ও বাক্স আকৃতির হয় তবে তাদের উৎপাদন শক্তি এই মাটির তুলনায় অনেক কম হবে। মধ্য ভারতের কালো

মাটির (রেগার) উৎপাদন শক্তি অত্যন্ত কম। জলাকীর্ণতা ও ক্রটীপূর্ণ জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলে এই মাটির গঠন অত্যন্ত নিম্ন-মানের—এবং এটাই এর কম উৎপাদন শক্তির কারণ।

জল-নিষ্কাশন ও বাঁধের ব্যবস্থা

মাটির, বিশেষত সেচযুক্ত এলাকার মাটির জল-নিষ্কাশন বিষয়ে অধিকতর যত্ন নেওয়া আবশ্যক। অনেক জলাকীর্ণ ও জলা স্থানকে উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা দ্বারা চাষযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। অবশ্য তার পূর্ব্বে এসব স্থান মাছ চাষের বা প্রমোদ স্থানরূপে ব্যবহারের বা বন্য পশু সংরক্ষণের উপযুক্ত কিনা তা বিবেচনা করে দেখা দরকার।

যে সমস্ত এলাকায় বছরে একবার মাত্র ধান চাষ করা হয়, সেখানকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও পুংখানুপুংখরূপে বিবেচনা করে দেখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে অনেক এলাকা আছে, যেখানে ভূমির উপরিভাগ ভূ-সংস্থান ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা দ্বারাই নির্ণীত হয় জমিটি এক ফসলি, না দো ফসলি, না তিন ফসলি হবে। কিন্তু নীচু জমিগুলি, যেখানে বর্ত্তমানে বছরে একবার মাত্র শস্য উৎপন্ন করা হচ্ছে, সেখানে উপযুক্ত নিষ্কাশন-ব্যবস্থা অবলম্বন করে অনায়াসেই দ্বিতীয় আরেকটি ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম বা উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা নেই, সেখানে 'কন্টুর' বাঁধ দিয়ে জল-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সব এলাকায় মৌসুমী বৃষ্টিপাত মোটামুটি, সেখানেও বাঁধের দ্বারা জল-সংরক্ষণ মৌসুমী—পরবর্ত্তী চাষের সহায়ক। প্রকৃতির খামখেয়ালির কথা চিন্তা করে জল-সংরক্ষণ বিষয়ে আমাদের আরও যত্নবান হওয়া উচিৎ। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যে এ সম্বন্ধে কতকগুলি বড় বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত ধরা হয়, 'কন্টুর' বাঁধের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

'কণ্টুর' বাঁধ ও অন্যপ্রকার বাঁধের উপযুক্ত ৪৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি ভারতবর্ষে আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় এক মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও চার মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বাঁধ দেওয়া হবে।

নোনা, ক্ষার ও অম্ল মাটিতে প্রতিশেধক প্রয়োগ

ক্ষারীয় ও অম্ল মাটির সমস্যা সমাধানের জন্য যথাক্রমে চুণ ও জিপসাম প্রয়োগ করা দরকার। পূর্ব্বে জমিতে চুণের ব্যবহারের প্রতি খুব একটা মনযোগ দেওয়া হতো না। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত সমস্যাজড়িত মাটির সংশোধন ও উপযুক্ত ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের জরুরী কর্ম্মসূচীতে স্থান পাওয়া উচিৎ।

পতিত জমি উদ্ধার করে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা

আমাদের দেশে মোট ৪২.৬ মিলিয়ন হেক্টর পতিত জমি আছে। এই জমিগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ফেলা যায়ঃ

(১) আবাদযোগ্য পতিত জমি	১৯.৮ মিলিয়ন হেক্টর
(২) পুরানো পতিত জমি	১১.৪ ,, ,,
(৩) বর্ত্তমানের পতিত জমি	১১.৪ ,, ,,

এই পতিত জমির একটি বিরাট অংশকে উপযুক্ত ভূমি-সংরক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা চাষ-আবাদের যোগ্য করে তোলা যায়। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে একটি সমীক্ষা চলছে।

এই পতিত জমি উদ্ধারের পর যে অংশ কৃষিকার্যের উপযুক্ত মনে হবে সেখানে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হবে। অন্যথায় বনভূমি তৈরীর জন্য তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য দ্রুত বর্দ্ধনশীল জ্বালানী কাঠের উপযুক্ত গাছের রোপনই হবে জমিগুলির ব্যবহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, যদি উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তবে আমাদের প্রতি হেক্টর পতিত জমিই কোন না কোন অর্থকরী কাজে ব্যবহৃত হতে পারে ; ফলে দেশে পতিত জমি বলে

আর কিছু থাকবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভূমি ও জল এই দুইটিই হল কৃষির মূল এবং এই প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারাই মানুষের প্রধান শত্রু ক্ষুধাকে পরাজিত করে শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি সম্ভব।

ভূমি ও জলের উপযুক্ত ব্যবহারের পরিকল্পনাকালে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে—

(১) শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য জমির ব্যবহারে প্রাথমিক প্রয়োজন হল জলের ব্যবস্থা করা। সুতরাং সঞ্চিত জল—তা যেখানেই থাক না কেন—অনাবৃষ্টি ও খরার সময় যাতে ব্যবহার করা যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) যদি জমিতে ক্রমাগত একই শস্যের চাষ করা হয়, তাহলে একই প্রকারের পুষ্টি-বস্তুগুলি জমি থেকে ক্রমাগত প্রচুর পরিমাণে অপসারিত হতে থাকে এবং এর ফলে উৎপাদন কমে যায়। অথচ, যদি, অশিম্বিজাতীয় শস্যের মাঝে মাঝে শিম্বিজাতীয় গাছ যা মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে জন্মানো হয়, তাহলে নিঃশেষিত উৎপাদন শক্তির অনেকখানি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সুতরাং মাটির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য উপযু[illegible] শস্য পর্য্যায় অনুসরণ করা উচিৎ।

(৩) শস্যের দ্বারা অপসারিত হওয়ার ফলে মাটিতে পুষ্টি-বস্তুগুলির পরিমাণ ক্রমশ কমে যেতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ফসল উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। অতএব, লক্ষ্য রাখতে হবে যে মাটি থেকে খাদ্য বস্তুগুলির সরবরাহ যেন ঠিক থাকে। মাটিতে সঞ্চিত মোট খাদ্য বস্তুগুলির পরিমাণ পর্য্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু সেগুলি উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য কি না তা নির্ভর করে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা এবং জীবা[illegible]সমূহের কার্য্যকারীতার উপর। আমরা জানি যে জৈব পদার্থ মাটির উপরোক্ত অবস্থাগুলিকে সন্তোষজনকভাবে বজায় রাখে। সুতরাং, মাটির উন্নয়ণ কর্ম্মসূচীতে জৈব-পদার্থের প্রয়োগ সর্ব্বপ্রথম স্থান পাওয়া উচিৎ। যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ পাওয়া না যায় বা সবুজ সার ব্যবহার

বাস্তবানুগ না হয় তাহলে শস্যের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করাই হল দ্বিতীয় পন্থা।

সঠিকভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়। কারণ, এগুলি হয়ত অপরিমিত পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু রাসায়নিক সার ও জৈব সারের উপযুক্ত মিশ্রণ ব্যবহার করাই হ'ল শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

চাষীদের জমিতেই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় দেখা গেছে যে কম্পোষ্ট, এ্যামোনিয়াম সালফেট ও হাড়ের গুড়ার সংমিশ্রণ ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই সংমিশ্রণ সস্তা, সুষম এবং উর্বরতা সংরক্ষণের পক্ষেও উপযুক্ত।

জৈব সারের অভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও বেশ লাভজনক ফলন পাওয়া গেছে। মৃত্তিকা রসায়নবিদের পরামর্শ অনুযায়ী ঘাট্তি উপাদানগুলি জমিতে প্রয়োগ করা উচিৎ। কতকগুলি জমিতে হয়ত পটাস বা ফসফরাসের অভাব না থাকতে পারে, তবে কোন জমিতে যদি দুটোরই অভাব থাকে, তবে সেখানে সঠিক পরিমাণে এই উপাদানগুলি ব্যবহার করে প্রচুর ফলন বাড়ানো যেতে পারে। বিভিন্ন স্থানে শস্য উৎপাদন প্রতিযোগীতায় দেখা গেছে যে, উপযুক্তভাবে চাষ, জলসেচন ও সার প্রয়োগ করে হেক্টর প্রতি ফলন বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া সম্ভব। শস্য প্রতিযোগীতায় যা সম্ভব হয়েছে, যে কোন চাষীর পক্ষে তা অর্জ্জন করা সম্ভব হবে, যদি সে উপরে আলোচিত বিষয়গুলি যত্ন সহকারে অনুসরণ করে।

হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের মত অধিক জন-অধ্যুষিত দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ক্রমে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হবে। কারণ, দেশে ভালোভাবে শিল্পের প্রসার না হলে কর্ম্মসংস্থানের অন্য কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা থাকবে না। কৃষি সংস্থার বিষয়ে দুটি বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য

প্রথমত, কৃষি ব্যবস্থায় উৎপন্ন সামগ্রী বেশীর ভাগই খাদ্যোপযোগী। সেজন্য কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তি বাইরের কিছুর উপর নির্ভর না করেও জীবনধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কৃষি-সংস্থার মূল হল জমি। সেই জমিকে ছোট ছোট আকারে ভাগ করে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কর্ম্মসংস্থান ও পোষন সম্ভব হতে পারে। অবশ্য হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং পতিত জমি উদ্ধার করেও জমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমানো যেতে পারে। যেহেতু, চাষযোগ্য জমির আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ খুবই সীমিত, অতএব আমাদের হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির প্রতিই বিশেষ জোর দিতে হবে। পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ যত কম হবে, নিবিড় চাষের পরিমাণও তত বাড়বে। এইভাবে পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি দেশে—যেখানে পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ খুব কম—সেখানেই হেক্টর প্রতি ফলনের গড় সব থেকে বেশী। এই সমস্ত দেশে চাষীরা খামারের উন্নতমানের চাষ-পদ্ধতি এবং সংগঠনের উপর নির্ভর করে, জমির পরিমাণের উপর নয়।

অতএব, ভারতবর্ষের ্ল সমস্যা হ'ল হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করা। এর জন্য প্রতিটি জমিখণ্ডের মাটি সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। সব আকারের খ:ারের জন্যই একথা সত্য এবং ছোট আকারের চাষের জমির পক্ষে এটা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। চাষের জমির আকারের একক অনুযায়ী ১ঃ ৩৯৬০ বা ১ঃ ১৯৮০ বা এর চেয়েও বড় স্কেলে মাটির মানচিত্র আঁকা প্রয়োজন। এইরূপ মানচিত্রে জমির উপরিভাগের ও তলাকার মাটির বৈশিষ্ট সন্নিবিষ্ট থাকবে এবং খামারের ব্যবহার প৷তিরও একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। খামার ব্যবহারের এই পরিকল্পনা করা হবে কৃষকের সঙ্গে পরামর্শ করে। এই পরিকল্পনায় 'প্যাকেজ' প্রকল্পের সকল বৈশিষ্ঠ্যগুলিই থাকবে; যথা—অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার, রাসায়নিক ও জৈবসারের ব্যবহার, জলসেচের

ব্যবস্থা, ক্ষার মাটিতে জিপসাম প্রয়োগ, অম্ল মাটিতে চুণ প্রয়োগ, ভূমি ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে চাষ করে যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জমির উর্বরতার উচ্চমান বজায় রাখার জন্য স্থূল জৈব সার ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

ভুমির ব্যবহার পরিকল্পনা

ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরীতে তিনটি প্রধান নীতি অনুসরণ করা উচিৎ:—প্রথমত, জাতীয় স্বার্থে যে কোন জমির যথাযোগ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়ত, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জমিতে বহু ফসলের চাষ কাম্য ও সম্ভব। তৃতীয়ত, পতিত জমির উচ্ছেদ, কারণ জনবহুল দেশে প্রতিটি জমি খণ্ডেরই কোনও না কোন প্রকারে ব্যবহার সম্ভব।

ছোট ছোট চাষের জমিতেও উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলি একত্রিত করে কৃষকের পক্ষে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু এই উপাদানগুলি, যেমন অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার, সার ব্যবহার, মাটিতে প্রতিশেধক ব্যবহার, শস্য রক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি ছাড়াও জমির উপযুক্ত ব্যবহারের প্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বহু স্থানেই অতি প্রাচীনকাল থেকে কেবল একটি শস্যই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাষ করা হয়। কিন্তু জমির গুণ ও জলবায়ু, ফলন ও লাভের কথা বিবেচনা করে কোন কোন স্থানে এইরূপ চাষের রীতির পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উঁচু-জমির ধান ও সেই সঙ্গে কিছু জোয়ার, বাজরা জাতীয় শস্যের চাষ করা হয়। ফলন খুবই কম কিন্তু এখানে উন্নতমানের উঁচু-জমির ধানের বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও শস্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে দ্বিগুণ বা তিনগুণ ফলন খুবই সহজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে ধান বা জোয়ার, বাজরার পরিবর্তে অন্য

একটি অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ করলে চাষীদের লাভ যে অনেক বেশী হবে তাতে সন্দেহ নেই। এজন্য যত্নসহকারে মাটি, জলের ব্যবস্থাপনা এবং শস্য পর্য্যায়—এইগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিষয়গুলি চিন্তা করে দেখতে হবে। এই বিষয়গুলির অনুসন্ধান কার্য্য লাভজনকভাবে সরকারী বীজ-খামারে, বিশেষ করে নতুন খামারগুলিতে করা যেতে পারে। অবশ্য বীজ-খামারে বীজ উৎপাদনের কাজটি যেন ব্যহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইভাবে জ্ঞাত বিষয়গুলি ছোট ছোট চাষের জমিতে কার্য্যসূচী প্রনয়ণে যথেষ্ট উপকারে আসবে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শস্যক্রম (cropping pattern) নির্ভর করে দুইটি উপাদানের উপর ঃ—

(১) শস্য পর্য্যায়—ইহা দ্বারা যে শুধু অধিক ফলন পাওয়া যাবে তা নয়, জমির উচ্চমানের উর্বরতাও বজায় থাকবে। এই উপাদানটি সম্পূর্ণরূপে মাটির উপর নির্ভরশাল।

(২) চাষীর পর্য্যাপ্ত আয়—ইহা চাষীর চাষের জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

পরিশিষ্ট ১

ভূমির ব্যবহার

মোট ভৌগলিক আয়তন = ৩২৬.৩ মিলিয়ন হেক্টরস
সমীক্ষিত ভূমির মোট আয়তন = ২৯৯.০ মিলিয়ন হেক্টরস

		মিলিয়ন হেক্টরস হিসেবে আয়তন	মোট ভৌগলিক আয়তনের শতকরা ভাগ
(১)	বন	৫৬.১	১৭.২
(২)	চাষের অলভ্য জমি	৪৮.৬	১৫.০
(৩)	পতিত জমি ছাড়া চাষ বহির্ভূত অন্যান্য জমি—	৩৮.৮	—
	(ক) চাষযোগ্য নষ্ট জমি	১৯.১	৫.৮
	(খ) স্থায়ী তৃণক্ষেত্র ও অন্যান্য পশুচারণ ক্ষেত্র	১৪.৪	৪.৪
	(গ) অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষ, ফসল ও বাগিচাব অন্তর্ভুর্ক্ত জমি	৫.৩	১.৬
(৪)	বর্ত্তমান পতিত জমি	১১.৪	৩.৫
(৫)	বর্ত্তমান পতিত জমি ছাড়া অন্যান্য পতিত জমি	১১.৪	৩.৫
(৬)	চাষভুক্ত মোট জমি	১৩২.৭	৪০.৬
	অসমীক্ষিত জমির আয়তন	২৭.৩	৮.৪
(৭)	একাধিক শস্যের অন্তর্ভূর্ক্ত জমি	১৯.৫	—
(৮)	বিভিন্ন শস্যের অন্তর্ভুর্ক্ত জমিব মোট আয়তন	১৫২.২	—
	মোট সেচ-যুক্ত জমি	২৪.৪	—
	একাধিকবার সেচ দেওয়া জমির পরিমাণ	৩.৫	—
	সেচ-যুক্ত জমির সর্ব্বসাকুল্য আয়তন	২৭.৯	—

১ পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা বিভাগ, প্ল্যানিং কমিশন, ডিসেম্বর

পরিশিষ্ট ২

ভূ-পৃষ্ঠের জলভাগের অবস্থান

জলের নমুনা	পরিমাণ, হাজার ঘন মাইল	মোট পরিমাণের শতকরা ভাগ
সমুদ্র	৩১৭,০০০	৯৭.১৩
স্থলভাগের জল		
মেরু অঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ	৭.৩০০	২.২৪
মিষ্টি জলের হ্রদ	৩০	০.০০৯
নোনা জলের হ্রদ	২৫	০.০০৮
নদী-নালা	০.২৮	০.০০০১
ভূ-পৃষ্ঠতলের নীচের জল		
মাটি (মূল অঞ্চল)	৬	০.০০১৮
ভূগর্ভস্থ জল	২.০০০	০.৬১২
বায়ুমণ্ডল	৩.১	০.০০১
মোট	৩২৬.৩৬৪	১০০

পরিশিষ্ট ৩

নতুন দিল্লী ও রাজ্যের রাজধানীগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ[১]

রাজ্য	রাজধানী	বৃষ্টির দিনগুলির বাৎসরিক গড় সংখ্যা	ক্ষুদ্রতম বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি,মি,)	বৃহত্তম বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি,মি,)	বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি,মি,)
অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দ্রাবাদ	৫০	৪৫৭	১৪২২	৭৩৭
আসাম	শিলং	১২২	১৫২৪	৩২০০	২১০৯
বিহার	পাটনা	৫৬	৬৩৫	১৯৫৬	১১৯৪
গুজরাট	আমেদাবাদ	৩৬	১২৭	২০০৭	৭৩৭
কেরালা	ত্রিবান্দ্রম	৯৭	১০১৬	৩০৪৮	১৭০২
মধ্যপ্রদেশ	ভুপাল	৫৯	৯৯১	১৫২৪	১৩২১
মাদ্রাজ	মাদ্রাজ	৫৭	৫৫৯	২০০৭	১২৭০
মহারাষ্ট্র	বোম্বে	৭৪	৮৩৮	২৫৬৫	১৮০৩
মহীশূর	বাঙ্গালোর	৫৭	৫৩৩	১৩৪৬	৮৬৪
উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	৭৪	৯১৪	২৩১১	১৫২৪
পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়[২] (আম্বালা)	৪২	৩৫৬	২০৫৭	৮৩৮
রাজস্থান	জয়পুর	৩৬	১২৭	১৩৯৭	৬১০
উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	৪৯	৪৩২	১৮৮০	১০১৬
পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা	৮৪	৯১৪	২৪৮৯	১৬০০
জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর	৫৬	৪০৬	১২৯৫	৬৬০
	নতুন দিল্লী	৩৬	২৫৪	১৫২৪	৬৬০

· পরিশিষ্ট ৪

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী শস্যে অপ্রধান মৌলের ঘাট্‌তি।[১]

মৌল	শস্য	স্থান
ম্যাঙ্গানীজ	আখ	বিহার
	সোয়াবিন	এলাহাবাদ
	কমলা লেবু	মাদ্রাজ
	লেবু	পাঞ্জাব
	লেবু	কুর্গ
	ছোলা	দিল্লী
	ধান	রাঁচি (বিহার)
তামা	কমলা লেবু	মাদ্রাজ
	ধান	রাঁচি (বিহার)
জিঙ্ক	সুপারী	মহারাষ্ট্র
	উরিদ	সেপায়া, জেঃ সারান (বিহার)
	লেবু	মাদ্রাজ
	লেবু	পাঞ্জাব
	লেবু	কুর্গ
	লেবু	আজমীর
	ধান	পালামপুর (পাঞ্জাব)
	গম	জলন্ধর (পাঞ্জাব)
	গম	মেহসানা (গুজরাট)
	গম	আমেদাবাদ (গুজরাট)
	গম	বাস্যি (রাজস্থান)
বোরন	ফুল কপি	বরোদা
	ফুল কপি	দিল্লী
	ফুল কপি	পশ্চিমবঙ্গ
	ভার্জিনিয়া তামাক	বরোদা
	ভুট্টা, গম	বিহার

	মটর, যব, ভুট্টা, চীনা বাদাম	ইসলামপুর (বিহার)
	বারসীম	দিল্লী
	গম	আমেদাবাদ (গুজরাট)
	গম	বাস্থি (রাজস্থান)
মলিবডেনাম	বারসীম	পাঞ্জাব
	বারসীম	দিল্লী
	বারসীম	নাগপুর
লৌহ	আখ	পাঞ্জাব
	আখ	বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)
	আখ	নদীয়া (ঐ)
সালফার	চীনা বাদাম	সামবালা (পাঞ্জাব)
	আখ	বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)
	পাট	বর্দ্ধমান (ঐ)

পরিশিষ্ট ৫

ভারতবর্ষের রাজ্যওয়ারী খাত ও নালাযুক্ত ভূমির পরিমাণ

রাজ্য	নদী ও তার শাখা প্রশাখা	মোট খাত ও নালাযুক্ত জমির পরিমাণ (আনুমানিক)
(১)	(২)	(৩)
উত্তর প্রদেশ	যমুনা, চম্বল, গোমতী, বেত্বা এবং গঙ্গার খোলাস	১.২৩ লক্ষ হেক্টর (৩.০৪ লক্ষ একর)
মধ্যপ্রদেশ	চম্বল ও আসান	রাজ্যের মোরেনা, ভিন্দ ও গোয়ালিয়র এই তিনটি জেলায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির পরিমাণ প্রায় ২.৪৩ লক্ষ হেক্টর (৬ লক্ষ একর)
রাজস্থান		২.৮ থেকে ৩.২ লক্ষ হেক্টর (৭ থেকে ৮ লক্ষ একর)
গুজরাট	সবরমতী, মাহি, ওয়াত্রাক. মেশন, বনস ও নর্মদা	৪.০০,০০০ হেক্টর (৯৮৮,০০০ একর)
মহারাষ্ট্র		প্রায় ২০,০০০ হেক্টর (৪৯,৪০০ একর)
পাঞ্জাব		প্রায় ১,২০,০০০ হেক্টর (২,৯৬,৪০০ একর)
বিহার		প্রায় ০.৬ মিলিয়ন হেক্টর (১৪,০০,০০০ একর),

		দামোদর অববাহিকা অঞ্চলের উপরের দিকে এবং অধিকাংশই পালামৌ, রাঁচি, হাজারিবাগ, ধানবাদ ও সাঁওতাল পরগনার কোন কোনও অংশে
মাদ্রাজ		৬০,০০০ হেক্টর (১.৪ লক্ষ একর)
পশ্চিমবঙ্গ		১,০৩,৯৩৫ হেক্টর (২,৪৯৬ একর)
	মোট	৩.১৩ থেকে ৩.১৭ মিলিয়ন হেক্টর (৭.৪৫ থেকে ৭.৫১ মিলিয়ন একর)

পরিশিষ্ট ৬

দানা শস্য ও ডালের চাহিদার হিসাব

জনসংখ্যা	জনপ্রতি আউন্স	জনপ্রতি গ্রাম	কেবল খাদ্যের জন্য দানা শস্য ও ডালের চাহিদার পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	দানা শস্য ও ডালের মোট চাহিদার পরিমাণ বীজ, খাদ্য, অপচয়, প্রয়োজনীয় মজুদ এবং সতর্কতা মূলক মজুদ সহ (মিলিয়ন টন)
৪৩৮	১৭.৫০	৪৯৭.৯০	৭১.৭৪	৯১.৬৬
৪৪৭	,,	..	৭৩.২৭	৯৩.২৯
৪৫৭	,,	,,	৭৫.১৮	৯৫.৪৮
৪৬৭	,,	..	৭৬.৬০	৯৭.০৮
৪৭৭	,,	,,	৭৮.১৯	৯৮.৯২
৪৮৭	১৮.০০	৫.১.২০	৮২.১৭	১০৩.৪৬
৪৯৮	..	,,	৮৩.৯৩	১০৫.৪৮
৫০৮	,,	..	৮৫.৭৩	১০৭.৫৩
৫১৯	,,	,,	৮৭.৫৮	১০৯.৬৪
৫৩০	..	,,	৮৯.৪৭	১১১.৭৯
৫৪২	..	,	৯১.৩৯	১২০.০০

পরিশিষ্ট ৭

খাদ্য শস্যের উৎপাদন

(হাজার টন)

(ক)	**খরিফ দানা শস্য**								
১।	ধান	২৪১১৬	২৭৫৪১	৩৪১৯৮	৩৪৮০৬	৩১৯১৪	৩৬৪৮৯	৩৮৭৩২.৩	৩২৩০০[1]
২।	যোয়ার	৬৯৫৭	৬৭২৮	৯৩৬২	৭৭৪১	৯৬২০	৯২২৬	৯৮১০.৫	
৩।	বাজরা	৩১৮৯	৩৪৫৩	৯২২৭	৩৫৫৪	৩৮৯২	৩৭৩৬	৪৪৬৫.২	
৪।	ভুট্টা	২৩১৫	২৬০১	৪০১৫	৪২৬৯	৪৫৭৮	৪৫২৭	৪৫৫৮.১	
৫।	র‍্যাগি	১৫৪৩	১৮৪৭	১৬৮০	১৮৭৩	১৮৯০	১৮৫২	১৯২০ ৬	
৬।	ছোট দানা শস্য	১৯৬৮	২০৬৭	১০৬০	১৯৭০	১৮৬০	২০৩১	১৯৭৬.৭	
(খ)	**রবি দানা শস্য**								
৭।	গম	৬৭৫৯	৪৭৬৮	১০৯৯১	১২০৩৯	১০৮২৯	৯৭০৮	১২০৭৮.৩	১১১০০[1]
৮।	যব	২৩৭৫	১৮৬০	২৮৬৬	৩৪৫৬	২৪২৩	১৯৮৫	২৪৭৮.১	
৯।	মোট দানা শস্য	৪৯২২২	৫৪৮৬৫	৬৭৩৯৯	৬৯৭০৮	৬৭০০৬	৬৯৫৫৪	৭৬০১৯.৮	
১০।	ছোলা	৩৯০১	১৮৭১	৬৩২৩	৫৮২৭	৫৩৪৩	৪৪৭৭	৫৭৬৩.১	
১১।	টুর	১৮৭১	১৮৬০	২০৮০	১৩৩৯	১৫৯২	১২৯২	১৮৯৩ ৯	
১২।	অন্যান্য ডাল	৩৬২৮	৩৭৬৯	৪২৪৭	৪৪৬৪	৪৫০৬	৪১০৪	৪৭২০.৯	
১৩।	মোট ডাল শস্য	৯৪০০	৭৫০০	১২৬৫০	১১৬৩০	১১৪৪০	৯৮৭৩	১২৩৭৭.৯	
১৪।	মোট খাদ্য শস্য	৫৮৬২২	৬২৩৬৫	৮০০৪৯	৮১৩৩৮	৭৮৪৪৬	৭৯৪২৭	৮৮৩৯৭.৭	৭৬১০০[1]

[1] হিসাব অনুযায়ী।

পরিশিষ্ট ৮

ধান ও গমের গড় উৎপাদন

ধান		গম	
একর প্রতি পাউণ্ড	হেক্টর প্রতি কুইন্টাল	একর প্রতি পাউণ্ড	হেক্টর প্রতি কুইন্টাল
৬৮৮	৭.৭০	৫৮৪	৬.৫৪
৫৯৬	৬.৬৭	৫৯২	৬.৬৩
৬৩৭	৭.১৩	৫৮২	৬.৫২
৬৮২	৭.৬৩	৬৮১	৭.৬৩
৮০৫	৯.০১	৬৭০	৭.৫০
৭৩১	৮.১৯	৭১৭	৮.০৩
৭৮০	৮.৭৪	৬৩২	৭.০৮
৮০৩	৮.৯৯	৬২০	৬.৯৪
৭০২	৭.৮৬	৫৯২	৬.৬৩
৮৩৫	৯.৩৫	৭০৩	৭.৮৭
৮৩৭	৯.৩৭	৬৯৪	৭.৭৭
৯০৯	১০.১৮	৭৫৬	৮.৫৭
৯০৬	১০.১৬	৭৯৪	৮.৯০
৮১৫	৯.১৪	৭০৭	৭.৯৩
৯১৮	১০.২৯	৬৫১	৭.৩০
৯৫৮	১০.৭৪	৮১০	৯.০৯
৮০০[১]	৮.৯৬[১]	৭৪৩[১]	৮.৩৩[১]

পরিশিষ্ট ৯

সেচভুক্ত জমির পরিমাণ

(১৯৫৯-৬০)

	রাজ্য		আয়তন (হাজার হেক্টর)
১।	অন্ধ্র প্রদেশ	...	২৯১৫
২।	আসাম	...	৬১৩
৩।	বিহার	...	১৭৮৬
৪।	মহারাষ্ট্র ও গুজরাট	...	১৬২৬
৫।	জম্মু ও কাশ্মীর	...	২৯৮
৬।	কেরালা	...	৩৫২
৭।	মধ্য প্রদেশ	...	৯১৬
৮।	মাদ্রাজ	...	২২৫২
৯।	মহীশূর	...	৭৯৬
১০।	উড়িষ্যা[১]	...	৯৬৬
১১।	পাঞ্জাব	...	২৯৬৪
১২।	রাজস্থান[২]	...	১৪২৮
১৩।	উত্তর প্রদেশ	...	৫০৯৪
১৪।	পশ্চিমবঙ্গ	...	১৩৩৬
১৫।	দিল্লী	...	৩৭
১৬।	হিমাচল প্রদেশ	...	৩৯
১৭।	মনিপুর	...	৬৭
১৮।	ত্রিপুরা	...	৮
	মোট	...	২৩.৪৯৩

পরিশিষ্ট ১০

উপরিতলের ১৮ সেণ্টিমিটার পর্য্যন্ত গভীর মাটির pH বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম গুঁড়া চুণাপাথরের মোটামুটি পরিমাণ। সমস্ত মাটিটাকেই ২ মিলিমিটার ছাকনী দিয়ে ছেকে নেওয়া হয়।[১]

মাটির অঞ্চল ও গ্রথন	প্রয়োজনীয় চুণাপাথরের পরিমাণ		
	pH ৩.৫ থেকে pH ৪.৫	pH ৪.৫ থেকে pH ৫.৫	pH ৫.৫ থেকে ৬.৫
		হেক্টর প্রতি কে,জি, (এ)	
গরম-নাতিশীতোষ্ণ ও বিষুব অঞ্চলের মাটি—			
বেলে ও দোঁয়াশ বেলে	৭৫৩	৫১৩	১০০৪
বেলে দোঁয়াশ	(বি)	১২৫৫	১৭৫৭
দোঁয়াশ	(বি)	২০০৮	২৫১০
পলি দোঁয়াশ	(বি)	৩০১২	৩৫১৪
এটেল দোঁয়াশ	(বি)	৩৭৬৫	৫০২০
মাক (Muck)	৬২৭৫	৮২৮৩	৯৫৩৮

(এ) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকমের কম হলে চুণাপাথরের উল্লিখিত পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়ে দিতে হবে, আবার জৈব পদার্থ অস্বাভাবিক রকমের বেশী হলে এই পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়ে দিতে হবে।

(বি) কোনও সুপারিশ দেওয়া হয়নি।

---

১ Soils, U. S. D. A. Year Book, 1957, p. 68,

পরিশিষ্ট ১১

মাঠের কতকগুলি সাধারণ ফসল, শাকসব্জী ও ফল গাছের লবণ সহিষ্ণুতা

অসহিষ্ণু	মোটামুটি সহিষ্ণু	সহিষ্ণু
মাঠের ফসল		
মাঠের শুঁটীজাতীয় ফসল (বিন)	গম	বার্লি
	ওট (Oats)	ধইঞ্চা
	ধান	সুগারবিট
	যোয়ার	তামাক
	ভুট্টা	সালগম
	অড়হর	তুলা
	ভেরেণ্ডা (Castor)	আখ
পশু-খাদ্য		
গুয়ারা	বারসীম	দুর্বা ঘাস
	কাউপি (Cowpea)	
	লুসার্ন (Lucerne)	
শাকসব্জী		
	টমাটো	সালগম
	বাঁধাকপি	বিট
	ফুলকপি	মূলা
	লেটুস	
	আলু	
	গাজর	
	পেঁয়াজ	
	মটর	
	শসা	
	কুমড়া	
	করেলা	

ফল-গাছ	ডালিম	খেজুর
	আঙ্গুর	
	পেয়ারা	
	আম	
	কলা	
	পিযাব	
	আপেল	
	কমলালেবু	
	গ্রেপ ফ্রুট	
	অ লমণ্ড, এ্যাপ্রিকট	

গ্রন্থ বিবরণী

১। এগ্রি ডাইজেষ্ট নং ৩, সেণ্টার ইণ্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন এট ডা ডকুমেণ্টশ্‌ন ডেস্‌ প্রডাকসন ডে ফসফেট টমাস ব্রাসেলস্‌, বেলজিয়াম।

২। আরাখেরি. এইচ. আর, চালাম্‌. জি. ভি, সত্যনারায়ণ, পি, এ্যাণ্ড ডন্যাহু, রায় এল, ১৯৫৯. সয়েল ম্যানেজমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বম্বে।

৩। ভৌমিক এইচ, ডি, এ্যাণ্ড ডন্যাহু, রায় এল, সয়েল এসিডিটি এণ্ড দি ইউস অফ লাইম ইন ইণ্ডিয়া, ফার্ম ইনফরমেশন ইউনিট, ডাইরেক্টরেট অফ এস্কটেনশন, মিনিষ্ট্রি অফ ফুড এণ্ড এগ্রিকালচার।

৪। ভিমায়া, সি, পি ; কাউল, আর. এন. এ্যাণ্ড গাঙ্গুলী, বি, এন, স্যাণ্ড ডিউন রিহেবিলিটেশন ইন ওয়েষ্টার্ণ রাজস্থান, সায়েন্স এ্যাণ্ড কালচার. ২৭, ২২৪-২২৯।

৫। ব্লুম, এম, জেমস এ্যাণ্ড রায়চৌধুরী, এস, পি, ১৯৫৭, সয়েল ফারটিলিটি, ফার্ম বুলেটিন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, নং ৩০।

৬। চক্রবর্ত্তী, এম; চক্রবর্ত্তী, বি, এ্যাণ্ড মুখার্জ্জী, এস, কে, লাইমিং ইন ক্রপ প্রডাকসন্‌ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া সোসাইটি অফ সয়েল সায়েন্স, বুলেটিন নং ৭।

৭। ডন্যাহু, রয় এল, আওয়ার সয়েলস্‌ এণ্ড দেয়ার ম্যানেজমেণ্ট। ফার্ষ্ট ইণ্ডিয়া এডিশন, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, বম্বে।

৮। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, হ্যাণ্ডবুক অফ এগ্রিকালচার।

৯। কাউল, আর, এন, ১৯৫৭, র‍্যাভাইনস্‌ এ্যাণ্ড দেয়ার এফোরেশটেশন্‌, সায়েন্স এ্যাণ্ড কালচার, ২১, ২৯০-২৯৩।

১০। মিশ্র, আর এ্যাণ্ড পুরি জি, এস, ১৯৫৪. ইণ্ডিয়ান ম্যানুয়াল অফ প্লাণ্ট ইকোলজি, দি ইংলিশ বুক ডিপো, দেরাদুন।

১১। ন্যাশনাল আটলাস অফ ইণ্ডিয়া, প্লেট ৪১, ইণ্ডিয়া, ফিজিয়-গ্রাফিক রিজিয়নস্‌ ১ : ৬,০০০,০০০।

১২। পুরি, জি, এস, ১৯৬০, ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট ইকোলজি, ভলিউম্‌স ওয়ান এ্যাণ্ড টু, অক্সফোর্ড বুক কোম্পানী।

১৩। রানধাওয়া, এম, এস, ১৯৫৮, এগ্রিকালচারাল এ্যাণ্ড এনিম্যাল হাজ-ব্যানড্রি ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ।
১৪। রায়চৌধুরী, এস, পি, ল্যাণ্ড রিসোর্সেস অফ ইণ্ডিয়া, ভলিউম্ ওয়ান, কমিটি অন ন্যাচারাল রিসোর্সেস্। প্লানিং কমিশন।
১৫। রায়চৌধুরী এস, পি; আগরওয়াল, আর, আর; দত্ত বিশ্বাস, এন, আর; গুপ্ত, এস, পি ; এ্যাণ্ড টমাস, পি, কে, সয়েলস্ অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, নিউ দিল্লী।
১৬। শিফ্‌টিং কালটিভেশন্ ইন উড়িষ্যা, সয়েল কনসারভেশন অরগানাইজেসন, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট, উড়িষ্যা।
১৭। সয়েল-ইয়ার বুক, ১৯৫৭, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার।
১৮। ওয়াদিয়া, পি, এ, ১৯৫৯, ন্যাচারাল রিসোর্সেস এ্যাণ্ড পপুলেশন অফ ইণ্ডিয়া, পপুলার বুক ডিপো, বম্বে।

ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী সিরিজের পুস্তকাবলী

প্রকাশের পথে

১।	খাদ্য শস্য	...	ডঃ এম, এস, স্বামিনাথন
২।	জলসেচ	...	শ্রী বালেশ্বর নাথ
৩।	ভারতের প্রত্নতত্ত্ব কাহিনী	...	শ্রী ও, পি, ট্যানডন
৪।	সাধারণ ভারতীয় ফার্ণ	...	ডঃ এস, সি, ভার্ম্মা
৫।	ভারতীয় লতা ও গুল্ম	...	প্রফেসর এম, বি, রাইজাদা
৬।	দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির	...	শ্রী কে, আর, শ্রীনিবাশন
৭।	সঙ্গীত	...	ঠাকুর জয়দেব সিং
৮।	পাঞ্জাব	...	সরদার খুসওয়ান সিং
৯।	অন্ধ্রপ্রদেশ	...	শ্রী নারলা ভেঙ্কাটেশ্বওরা রাও
১০।	ভারতীয় হস্তলিপি কাহিনী	...	প্রফেসর এ, কে, নারায়ণ
১১।	ভারতীয় মানচিত্র	...	ডঃ এস, পি, চ্যাটার্জ্জী
১২।	অন্ধ্রপ্রদেশের ভূগোল	...	ডঃ সাহ মনজুর আলম
১৩।	বিহারেব ভূগোল	...	ডঃ পি, দয়াল
১৪।	দিল্লীর ভূগোল	...	ডঃ এম, পি, ঠাকুর
১৫।	মধ্যপ্রদেশের ভূগোল	...	ডঃ কে, এন, ভার্ম্মা
১৬।	মহারাষ্ট্রেব ভূগোল	...	ডঃ সি, ডি, দেশপাণ্ডে
১৭।	মহিশূরের ভূগোল	...	ডঃ এল, এস, ভাট
১৮।	উড়িষ্যার ভূগোল	...	ডঃ বি, এন, সিন্হা
১৯।	পাঞ্জাবের ভূগোল	...	ডঃ ও, পি, ভরদ্বয়াজ
২০।	হরিয়ানার ভূগোল	...	ডঃ ও, পি, ভরদ্বয়াজ
২১।	উত্তর প্রদেশের ভূগোল	...	ডঃ এ, আর, তেওয়ারী
২২।	জম্মু ও কাশ্মীরের ভূগোল	...	ডঃ এ, এন, রায়না
২৩।	ভারতবর্ষের ভূগোল	...	ডঃ আর, পি, মিশ্র
২৪।	ভারতের নদনদী	...	ডঃ এস, ডি, মিশ্র
২৫।	ভারত সরকার ও তার শাসন পদ্ধতি	...	প্রফেসর ভি, কে, এন, মেনন
২৬।	ভারতীয় ভাষার কাহিনী	...	ডঃ এস, এম, কাটরে

ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী সিরিজের পুস্তকাবলী

২৭। ভারতের জনসাধারণ … ডঃ এস, সি, সিনহা
২৮। ভারতীয় আইন … ডঃ জি, এস, শর্ম্মা
২৯। ভারতীয় রেলপথ … শ্রী এম, এ, রাও
৩০। ভারতের কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ডঃ এ, বি, মিশ্র
৩১। প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্র … ডঃ লালান্‌জী গোপাল
৩২। প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্য ও
বাণিজ্য পথ … ডঃ বি, আর, শ্রীবাস্তব
৩৩। কীট-পতঙ্গ … ডঃ এ, পি, কাপুর
৩৪। মাছ … ডঃ (মিস্) এম, চণ্ডি
৩৫। কুটির শিল্প … মিসেস্ জাসলিন ধামিজা

ভারত—দেশ এবং দেশবাসী
প্রকাশিত পুস্তকাবলী

		বাঁধানো সংস্করণ টাকা	সাধারণ সংস্করণ টাকা
১।	ফুলের গাছ —ডঃ এম, এস রণধাওয়া	৯·৫০	৬·৫০
২।	অসমীয়া সাহিত্য —প্রফেসর হেম বড়ুয়া	৭·৫০	৫·০০
৩।	সাধারণ বৃক্ষ —ডঃ পি. জে. দেওরাজ	৮·২৫	৫·২৫
৪।	ভারতের সর্পকুল —ডঃ পি, জে, দেওরাশ	৯·৫০	৬·৫০
৫।	দেশ ও মাটি —ডঃ এস, পি, রায়চৌধুরী	৮·২৫	৪·৭৫
৬।	ভারতের খনিজ সম্পদ —মিসেস্ মেহের ডি, এন, ওয়াদিয়া	৮·২৫	৫·২৫
৭।	গৃহপালিত পশু —শ্রী হারবানস্ সিং	৮.০০	৪·২৫
৮।	বন ও বনরক্ষণ বিদ্যা —শ্রী কে, পি, সাগ্রেইয়া	৮·৫০	৫·২৫
৯।	রাজস্থানের ভুগোল —ডঃ ভি, সি, মিশ্র	৮·২৫	৬·০০
১০।	ফুল ও বাগান —ডঃ বিষ্ণু স্বরূপ	৯·৫০	৬·০০
১১।	জনসংখ্যা —ডঃ এস, এন, আগরওয়ালা	৭·০০	৩·৭৫
১২।	নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ —শ্রী কে, কে, মাথুর	৯·০০	৫·৫০
১৩।	সাধারণ পাখী —ডঃ সালিম আলি ও মিসেস লায়েক ফুতেআলি	১৫·০০	—

ভারত—দেশ এবং দেশবাসী

		বাঁধানো সংস্করণ টাকা	সাধারণ সংস্করণ টাকা
১৪।	শাকসব্জী —ডঃ বি, চৌধুরী	৮·২৫	৫·২৫
১৫।	ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল —প্রফেসর ভি, এস, গণনাথন	৮·২৫	৫·২৫
১৬।	ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ভূগোল —প্রফেসর সি, এস, পিচামুথু	৮·২৫	৫·২৫
১৭।	ঔষধ সম্বন্ধীয় গাছগাছড়া —ডঃ এস, কে, জৈন	৯·০০	৫·৭৫
১৮।	পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল —প্রফেসর এস, সি, বোস	৯·০০	৬·০০
১৯।	ভারতের ভূতত্ত্ব —ডঃ এ, কে, দে	৮·৫০	৫·২৫
২০।	মৌসুমী বায়ু —ডঃ পি, কে, দাস	৭·৫০	৪·২৫
২১।	রাজস্থান —ডঃ ধরম্ পাল	৭·৭৫	৪·৫০
২২।	ভারতবর্ষ—সাধারণ সমীক্ষা —ডঃ জর্জ কুরিয়ান	৯·৫০	৬·০০
২৩।	আসামের পার্বত্য উপজাতি —এস, বরকতকী	৮·০০	৪·৭৫
২৪।	আসাম —এস, বরকতকী	৮·০০	৪.৭৫
২৫।	উত্তর ভারতীয় মন্দির —শ্রী কৃষ্ণ দেব	৭·৫০	৪·০০
২৬।	উদ্ভিদ রোগ —ডঃ আর, এস, মাথুর	৮·০০	৪·৭৫
২৭।	ফল —প্রফেসর রঞ্জিত সিং	৯·২৫	৫·৭৫
২৮।	ফসল অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ —ডঃ এস, প্রধান	১১.০০	৭·৫০
২৯।	মুদ্রা —শ্রী পি, এল, গুপ্তা	৯·৫০	৬·৭৫

রাষ্ট্রীয় জীবন-চরিতমালা
সিরিজের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

			মূল্য
১।	গুরু গোবিন্দ সিং (৩য় সংস্করণ)—ডঃ গোপাল সিং	...	২·০০
২।	গুরু নানক (২য় সংস্করণ)—ডঃ গোপাল সিং	...	২·২৫
৩।	কবির—ডঃ পারসনাথ তিবারী	...	১·৭৫
৪।	রহিম—ডঃ সমর বাহাদুর সিং	...	২·০০
৫।	মহারাণা প্রতাপ (হিন্দী)—শ্রী আর, এস, ভাট	...	১·৭৫
৬।	অহল্যাবাঈ (হিন্দী)—শ্রী হিরালাল শর্ম্মা	..	১·৭৫
৭।	ত্যাগরাজ—প্রফেসর পি, শ্যামবোমূর্তি	...	২·০০
৮।	পণ্ডিত ভাতখাণ্ডে—ডঃ এস, এন, রতনজনকার	...	১·২৫
৯।	পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর—শ্রী ভি, আর, আথাভালে	...	১·২৫
১০।	শঙ্করদেব—ডঃ মহেশ্বর নিওগ	...	২·০০
১১।	রাণী লক্ষীবাঈ (হিন্দী)—শ্রী বৃন্দাবন লাল ভর্ম্মা	...	১·৭৫
১২।	সুব্রহ্মানীয়া ভারতী—ডঃ (মিসেস) প্রেমা নন্দকুমার	...	২·২৫
১৩।	হর্ষ—শ্রী ভি, ডি, গঙ্গাল	...	১·৭৫
১৪।	সমুদ্রগুপ্ত (হিন্দী)—ডঃ লালনজী গোপাল	...	১.২৫
১৫।	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (হিন্দী)—ডঃ লালনজী গোপাল	...	১·৫০
১৬।	কাজী নজরুল ইসলাম—শ্রী বসুধা চক্রবর্ত্তী	...	২·০০
১৭।	শঙ্করাচার্য্য—প্রফেসর টি, এম, পি, মহাদেবন	...	২·০০
১৮।	আমীর খসরু—শ্রী সৈয়দ গোলাম শ্যামনানী	...	১·৭৫
১৯।	নানা ফড়নবীশ—ডঃ ওয়াই, এন, দেওধর	...	১·৭৫
২০।	রঞ্জিত সিং—শ্রী ডি, আর, সুদ	...	২·০০
২১।	হরি নারায়ণ আপ্তে—ডঃ এম, এ, করণধিকর	...	১·৭৫
২২।	আর, জি, বান্দারকার—ডঃ এইচ, এ, ফাদকে	...	১·৭৫
২৩।	মুথুস্বামী দিক্ষীতার—জাষ্টিস্ টি, এল ভেঙ্কটারামা আয়ার		২·০০
২৪।	মির্জ্জা গালিব—শ্রী মালিক রাম	...	২·০০
২৫।	সুরদাস (হিন্দী)—শ্রীব্রজেশ্বর ভার্মা	...	২·০০
২৬।	রামানুজাচার্য্য—শ্রী পার্থসারথি	...	১·৭৫
২৭।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রী এস, কে, বোস	...	২·০০

এই রচনাবলীর উদ্দেশ্য হল দেশের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞাতব্য বস্তুগুলিকে উপযুক্ত চিত্র সহকারে এবং পঠনযোগ্য আকারে বিশেষজ্ঞ নন এরূপ সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে সহজলভ্য করে দেওয়া। এর পরিধি হবে বহু বিস্তৃত ; কৃষি, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, সংস্কৃতি, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞান, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এতে থাকবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটা হবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একপ্রকারের বিদ্যাকোষ। বিভিন্ন বিষয়ের স্বীকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা বা তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রকৃত তথ্য সম্বলিত এই বইগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত হচ্ছে। এর ভাষা হবে খুব সরল ও সহজবোধ্য।